মহাচীন

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় এম্.এ.,
অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
মান্দালয় (ব্রহ্মদেশ)

বীণা লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য চারি টাকা মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীদিগেন্দ্রলাল সরকার, এম্. এ, বি. এল,
বীণা লাইব্রেরী, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

মুদ্রাকর—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেন
সবিতা প্রেস
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

আমার পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

—যাঁহার মধ্যে আমি দেখিয়াছি সবল মনুষ্যত্বের
একটি সুস্থ এবং সুন্দর প্রকাশ—

এবং

আমার মাতৃদেবী

শ্রীযুক্তা শিশুবালা দেবী

—যাঁহার মধ্যে আমি দেখিয়াছি ভারতীয়
নারী-মহিমার একটি অনবদ্য প্রকাশ—

তাঁহাদের শ্রীচরণে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

মুখবন্ধ

প্রাচ্য ভূখণ্ডের দুইটি পরম বিস্ময় মহাচীন এবং ভারতবর্ষ। ইহারা পরস্পরের প্রতিবেশী। উভয়ের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক যোগ বিদ্যমান। উভয়ের ইতিহাস এবং তাহার গতি ও প্রকৃতির মধ্যেও নিকট সাদৃশ্য রহিয়াছে। উনবিংশ এবং বিংশ শতকের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণের দুইটি প্রধান ক্ষেত্র এই দুইটি উপ-মহাদেশ। আত্মঘাতী গৃহ-যুদ্ধ আজ মহাচীনকে সর্ব্বনাশের অতল তলে তলাইয়া দিতেছে। যে যে কারণে চীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিটিতেছে না আন্তর্জ্জাতিক শক্তি-প্রতিযোগিতা তাহাদের মধ্যে অন্যতম এবং হয়ত প্রধান কারণ। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুযোগ-সন্ধানী তৃতীয় পক্ষ ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছে।

বুদ্ধিমান্ দেখিয়া শিখে। চীনের ইতিহাস আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিয়া লব্ধ তথ্য এবং তত্ত্বের আলোকে আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার পথের সন্ধান করিতে হইবে। ভারতবর্ষে যাহাতে চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অনুবৃত্তি না ঘটে সে সম্বন্ধে আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। সুতরাং চীনের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনীয়তাকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিচার করিলে 'মহাচীনের' অনেক অসম্পূর্ণতা হয়ত ধরা পড়িবে। বর্ত্তমান গ্রন্থ বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত নহে। সাধারণ পাঠকের চীন-ইতিহাসের সহিত একটা মোটামুটি পরিচয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুযায়ী চীন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের এবং সংগৃহীত তথ্যের

নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কোন বিশেষ দল বা মতবাদের মহিমা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে নিজের জ্ঞাতসারে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি যে ঘটাই নাই এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি।

কলিকাতা বীণা লাইব্রেরী এবং সবিতা প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রলাল সরকার, এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের যত্ন ও উৎসাহ এবং সবিতা প্রেসের কর্ম্মীবৃন্দের সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থের মুদ্রণ এবং প্রকাশ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মদীয় পিতৃপ্রতিম শিক্ষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী, এম, এ, মহাশয়ের সহায়তা ব্যতীত গ্রন্থের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিতে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। তাঁহাকে জানাই শ্রদ্ধার প্রণাম।

এই গ্রন্থপাঠে যদি কোন পাঠকের চীন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় এবং কোন শক্তিমান্ লেখক যদি মহাচীনের নিরপেক্ষ এবং প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন, আমার গ্রন্থ প্রণয়নের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। ইতি—

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
মান্দালয় (ব্রহ্মদেশ),
১লা আশ্বিন, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়।
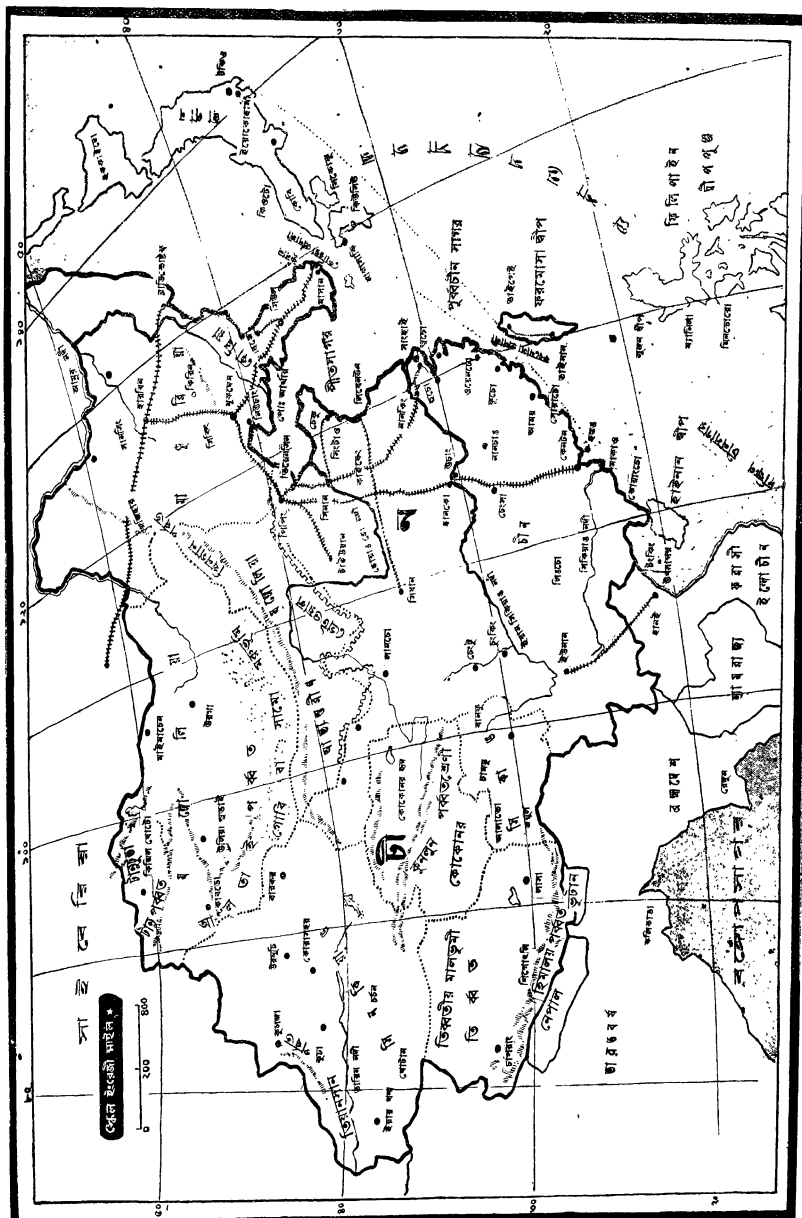
মহাচীন

ভৌগোলিক সংস্থান

চীনের প্রাচীন অধিবাসিগণের বিশ্বাস ছিল যে চীন দেশ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সেই যুগে অঙ্কিত চীনদেশের মানচিত্রসমূহে চীনকে চারিটি বিশাল সাগরে পরিবেষ্টিত দেখা যায়। চীন ভাষায় চীনের নাম ছিল "চুং কো" অর্থাৎ ভূমধ্য দেশ। অন্যান্য দেশ "ওয়াই কো" অর্থাৎ বাহিরের দেশ আখ্যায় অভিহিত হইত।

আয়তনে মহাচীন ইংল্যাণ্ডের ৭৭ গুণ। ইহার উপকূলভাগ ৪,৫০০ মাইল দীর্ঘ। ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশের সংখ্যা ২৮। তিব্বত এবং আউটার মঙ্গোলিয়াকে (Outer Mongolia) এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। এই দুইটি প্রদেশ চীনের অধীন হইলেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহারা কতকটা স্বাধীনতা ভোগ করে।

চীনের প্রধান নদী ৩টি। ইহাদের নাম ইয়াংসি, পীত নদী (Hoang Ho) এবং "পশ্চিমনদী" (West River or Sikiang)। সমগ্র দেশ ইহাদের দ্বারা ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২,৯০০ মাইল দীর্ঘ ইয়াংসি নদী বৃহত্তম। ইহা চীনের মধ্যভাগ দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত। ইহার পরেই ২,৪০০ মাইল দীর্ঘ পীত নদীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার কোন কোন অংশ মাত্র নাব্য এবং তাহাও বৎসরে কয়েক মাসের জন্য। ইহার জল পীতবর্ণ বলিয়াই ইহার

নাম পীত নদী। বিগত ৬০০ বৎসরের মধ্যে বহুবার পীতনদীর প্রবাহ-পথের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভবিষ্যতেও ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। প্রবাহ-পথের পরিবর্ত্তনের মুখে ইহা পার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র জনপদ প্লাবিত করিয়া নূতন খাত করিয়া লয়। এই প্লাবনের ফলে সঙ্ঘটিত প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার জন্যই পীতনদীর অপর নাম হইয়াছে "China's Sorrow" বা "চীনের দুঃখ"। "পশ্চিমনদী"র দৈর্ঘ্য ১,০০০ মাইলের কিছু বেশী। দক্ষিণ চীনের ধান চাষের পক্ষে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

চীনের সর্ব্বোচ্চ গিরিশ্রেণী দেশের উত্তরে এবং পশ্চিমে অবস্থিত। টিয়েন্‌সান্ (Tienshan) পর্ব্বত মালা সিংকিয়াং প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ২৫,০০০ ফুট উচ্চ। রিষ্টহোফেন (Richt Hofen) পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর পশ্চিমে কান্‌সু (Kansu) এবং তিব্বতের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ২০,০০ ফুট। রিষ্টহোফেন হইতে নির্গত নদী সমূহ গোবি এবং মঙ্গোলীয মরুভূমির উষর বুকে মরূদ্যানের সৃষ্টি করিয়াছে। আল্‌তাই (Altai) পর্ব্বত সিংকিয়াং এবং মঙ্গোলিয়াকে রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিযাছে। আল্‌তাই কথাটির অর্থ স্বর্ণ। এই পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। সিং লিং (Tsing ling) গিরিশ্রেণী উত্তর এবং দক্ষিণ চীনের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। সান্‌সি এবং সান্‌টুং প্রদেশের পর্ব্বত মালা ৬,০০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহারা চীনের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

মধ্য চীনে বহু হ্রদ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ টুংটিং (Tung-ting) হ্রদটি হুনান প্রদেশের উত্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য ৭৫ মাইল এবং বিস্তার ৬০ মাইল। টুংটিং-এর পরেই পয়াং (Poyang) হ্রদের নাম করা যাইতে পারে। চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই হ্রদটি ৯০ মাইল দীর্ঘ

এবং ২০ মাইল প্রশস্ত। ইহা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কিয়াংসু প্রদেশে অবস্থিত।

উত্তর চীনে শীত এবং গ্রীষ্ম দুইই খুব বেশী। উত্তর চীনের আকাশ শীতকালে নির্মেঘ থাকে। বসন্তকালে উত্তর এবং পশ্চিমের মরুভূমি হইতে প্রবল ঝটিকার সঙ্গে বালুকণা উড়িয়া আসে। মধ্য চীনে শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ চীনে অত্যধিক বারিপাত হয়। এখানকার গ্রীষ্মকালও অতীব পীড়াদায়ক।

মহাচীনের জন সংখ্যা সম্পূর্ণ ভাবেই তাহার আয়তনের অনুরূপ। চীনের বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা ৪৫০,০০০,০০০-রও অধিক। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে প্রতিদিন পৃথিবীতে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহার এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০টি চীন দেশীয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তিব্বত এবং আউটার মঙ্গোলিয়া ব্যতীত চীনে ২৮টি প্রদেশ আছে। এই ২৮টি প্রদেশের প্রত্যেকটিরই নামের এক একটি বিশেষ অর্থ আছে। ইয়াংসি এবং ইহার ৩টি প্রধান শাখা দ্বারা বিধৌত প্রদেশের নাম জেচোয়াং (Szechwang) অর্থাৎ 'চার নদীর দেশ' (তুলনীয় পাঞ্জাব)। জেচোয়াং-এর দক্ষিণ সীমান্তের পর্ব্বত শ্রেণী প্রায় সর্ব্বদাই মেঘাবৃত থাকে। কাজেই ইহার দক্ষিণে অবস্থিত প্রদেশটির নাম ইউনান (Yunnan) অর্থাৎ 'মেঘের দক্ষিণ'। টুংটিং হ্রদের উত্তরদিকের প্রদেশটির নাম হুপে (Hupeh) বা 'হ্রদের উত্তর'। টুংটিং-এর দক্ষিণে অবস্থিত প্রদেশের নাম হুনান (Hunan) অর্থাৎ 'হ্রদের দক্ষিণ'। সান্‌সি (Shansi) প্রদেশের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত পর্ব্বতমালার জন্য ইহাকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। সান্‌সি কথাটির অর্থ 'পর্ব্বতের পশ্চিম'। সান্‌টুং (Shantung) প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তে পর্ব্বত শ্রেণী বিদ্যমান আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। সান্‌টুং কথাটির অর্থ 'পর্ব্বতের পূর্ব্ব'। পীত নদী হোনান (Honan) প্রদেশের উত্তর এবং হোপের (Hopei) দক্ষিণ সীমানা নির্দ্দেশ

করিতেছে। হোপে এবং হোনানের অর্থ যথাক্রমে 'নদীর উত্তর' এবং 'নদীর দক্ষিণ'। হরিৎ বর্ণের জল বিশিষ্ট কোকৃণুর (Koknoor) হ্রদের নাম হইতে তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত প্রদেশেটির নাম হইযাছে সিংহাই ; (Tsinghai) অর্থাৎ 'সবুজ হ্রদ'। আবার গোবি মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত প্রদেশটির নাম নিংসা (Ningsha) অর্থাৎ 'গ্রীষ্মকালীন শান্তি'। এই প্রদেশে একমাত্র গ্রীষ্ম ঋতুই সুখবহ। শীতকালে এই অঞ্চলে প্রবল তুষার ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া ইহাকে প্রায বাসের অযোগ্য করিযা তোলে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

মহাচীনের প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত। সভ্য মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অপরিহার্য্য প্রায় যাবতীয় সম্পদই এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাশ্চাত্য জাতি সমূহ চীনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে আগ্রহান্বিত হইলেও চীন কোন দিনই ইহাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে নাই। সম্রাট কিয়েন্‌লুং (১৭৩৬-৯৬)-এর রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ (১৭৬০-১৮২০) লর্ড ম্যাকার্টনিকে চীনের রাজদরবারে প্রেরণ করেন (১৭৯৩)। চীনের সহিত ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করাই লর্ড্ ম্যাকার্টনির দৌত্যের উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হ'ন্ নাই।

ধান দক্ষিণ চীনের প্রধান কৃষি-সম্পদ এবং চীনের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ অন্নভোজী। ক্যাণ্টনের সন্নিহিত বদ্বীপে এবং ইয়াংসি ও তাহার শাখা সমূহ দ্বারা বিধৌত অঞ্চল সমূহে প্রধানতঃ ধান্য উৎপন্ন হয়। চা দক্ষিণ চীনের অপর একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম চীনের সাহিত্যে চা-এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সর্ব্বপ্রথম চা-এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। তদানীন্তন ইংরেজ সমাজে ইহা একটি বিলাসের উপকরণ ছিল।

হংকং-এর সন্নিহিত উষ্ণ সমতলভূমিতে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে সর্ব্বমোট উৎপন্ন রেশমেব শতকরা ২৭ ভাগ চীন দেশে উৎপাদিত হয় এবং রেশম শিল্প দক্ষিণ চীনের অন্যতম প্রধান শ্রম-শিল্প। বাঁশ চীনের অপর একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। গৃহ এবং গৃহ-সজ্জা নির্ম্মানে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৌকা-মাঝি এবং জেলেদিগের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। জল সেচনের কার্য্যেও বাঁশের ব্যবহার হয়।

চীনের মৃত্তিকা কার্পাস চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উত্তর এবং দক্ষিণ চীনের সর্ব্বত্রই প্রচুর কার্পাস জন্মিয়া থাকে। কার্পাসের সঙ্গে সঙ্গে নীলের চাষও হইয়া থাকে। গম উত্তর চীনের আর একটি প্রধান কৃষি-জাত দ্রব্য। চীনে যত গম উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে শীতকালে উৎপন্ন ফসলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চীনের অন্যান্য কৃষি-জাত দ্রব্যের মধ্যে বাজরা, জোয়ার, বাদাম এবং ভাটকলাই বা সয়াবিনের নাম উল্লেখ যোগ্য। অগ্নি-দগ্ধ বাদাম চীনেব শিশুদিগের একটি প্রিয খাদ্য। যুক্তরাষ্ট্রের একটি রসায়ণাগারে আজ বাদাম হইতে চল্লিশটি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে। সয়াবিনেব প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র মাঞ্চুরিয়ায বিন মানুষ এবং পশু উভয়েরই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সর্ব্বপ্রথম তামাকের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমানে চীনের সর্ব্বত্রই তামাকের চাষ প্রচলিত হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর চীন হইতে বহু তামাক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। জেচোয়াং, এবং ফুকিয়েন (Fukien) প্রদেশে কর্পূর পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে চীন অহিফেনের চাষ আরম্ভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম চীনের অধিবাসিগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অহিফেনের ব্যবহার প্রচলিত

করে। এককালে বঙ্গদেশে উৎপন্ন অহিফেন চীনের বাজারে বিক্রীত হইত এবং এই ব্যবসায়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচুর অর্থাগম হইত। এই অহিফেন উপলক্ষ্যেই ১৮৪০ সালে চীন এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ইহাই কুখ্যাত প্রথম অহিফেন যুদ্ধ (First Opium War)। সতের বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে অহিফেনের জন্যই আবার এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ইহা দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ (Second Opium War) নামে পরিচিত। দুই বারই চীন পরাস্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ যখন যুদ্ধের কারণ জানিতে পারিল, তখন বুঝিল যে যুদ্ধের জন্য ইংল্যাণ্ডই দায়ী। জনমতের চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ সরকার আইন করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অহিফেন ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিলেন।

লবণের ব্যবসায় চীন সরকারের একচেটিয়া। তবে নির্দ্দিষ্ট হারে শুল্ক দিতে সম্মত হইলে যে কেহ এই ব্যবসায় করিতে পারে। চীনে প্রতি বৎসব ২,০০০,০০০ টন লবণ উৎপন্ন হয়। জেচোয়াং লবণ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র।

চীনে যথেষ্ট পরিমাণে এ্যান্টিমণি (Antimony) পাওয়া যায়। একমাত্র হোনান প্রদেশে সংগৃহীত এ্যান্টিমণিই পৃথিবীর সমস্ত দেশের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ। কিয়াংসি প্রদেশে উলফ্রাম বা টুংষ্টেন (Wolfram or Tungsten) পাওয়া যায়। ইস্পাত নির্ম্মাণ করিতে উলফ্রামের দবকার হয়। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও পৃথিবীর অন্য কোন দেশে উলফ্রাম পাওয়া যাইত না। কয়লা উত্তর চীনের একটী প্রধান খনিজ সম্পদ। চীনের প্রধান প্রধান কয়লার খনি গুলি কান্‌সু, সান্‌সি প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে চীনের বিভিন্ন অংশে বহু নূতন নূতন কয়লা, তৈল, লৌহ, সীসা, গন্ধক এবং তাম্রখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদেব যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার হইলে অদূর ভবিষ্যতে চীন যে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শ্রম-শিল্প প্রধান দেশে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

———

বিশ্ব সভ্যতায় চীনের দান

আমাদের ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহের মধ্যে অনেকগুলিই সর্ব্বপ্রথম চীন দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবিষ্কার যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্য আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার জানিতেন না।

খ্রীষ্ট জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নাকি কয়েকজন বৈদেশিক রাজদূত মূল্যবান্ উপহার দ্রব্যাদি লইয়া চীনের রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্রাট সাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং বিবিধ মহার্ঘ্য উপহার প্রদানে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন। ইহার পর তিনি শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার এই অতিথিগণ স্বদেশে ফিরিবার পথে পথ-ভ্রান্ত হইয়া যাইবার ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা বিদায়কালে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট শকটের সম্মুখভাগে লৌহনির্ম্মিত ক্ষুদ্র একটি মনুষ্যমূর্ত্তি সংলগ্ন রহিয়াছে। প্রতিটি মূর্ত্তির একখানি হাত সম্মুখদিকে প্রসারিত। সম্রাট বলিলেন যে শকট যে দিকেই যাউক্ না কেন ঐ হাত সর্ব্বদাই দক্ষিণ দিকে প্রসারিত থাকিবে। বলা বাহুল্য, ইহাই আদিম দিক্‌নিরূপন যন্ত্র। দিক্‌দর্শন যন্ত্রকে এখনও চীন ভাষায় 'South-pointing needle' বা "দক্ষিণ দিক নির্দ্দেশক সূচিকা" বলা হইয়া থাকে।

কাগজ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও চীনেরই প্রাপ্য। এই আবিষ্কার কখন হইয়াছিল সঠিক জানা না গেলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব যুগেই কাগজ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথমে অত্যন্ত পাতলা বাঁশ বা কাঠ কাগজের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। লিখন প্রণালীর জটিলতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরণের উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। ফলে কাগজ আবিষ্কৃত হয়। আজিও সহস্র সহস্র চীনবাসী কাগজ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার চীনের অপর একটি অমর কীর্ত্তি। চীনদেশেই সর্ব্বপ্রথম কাঠের ব্লক (Block) নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসৃণ একখণ্ড কাষ্ঠের উপর অক্ষর উৎকীর্ণ করিয়া তাহাতে কালি মাখাইয়া তাহা দ্বারা কাগজের উপর ছাপ দেওয়া হইত। মধ্যযুগে যে সমস্ত ইউরোপীয় পরিব্রাজক চীন ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন যে মুদ্রিত কাগজের টুক্‌রা চীন দেশে টাকার ন্যায় মূল্যবান্। তাঁহারা কাগজের নোটের কথা বলিয়াছিলেন। এই কাগজের টাকা বা নোটের ব্যবহার পরে অন্যান্য দেশেও প্রচলিত হয়। এই কাগজের নোটের অনুকরণেই খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর সুলতান মাহ্‌মুদ তোগলক তাম্র মুদ্রা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল তাহা না করায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। 'বিল অব এক্‌শ্চেঞ্জ' (Bill of Exchange) আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি প্রধান সহায়। ইহাও প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম চীন দেশে আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত হয়। ইহার সাহায্যে ভ্রমণকারী তাঁহার ভ্রমণের পথে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইতে পারেন। চীন ভাষায় ইহার নাম 'Fei-chien' অর্থাৎ 'উড়ন্ত টাকা' (Flying money)।

পোর্সিলেন (Porcelain) বা চীনামাটি ও সর্ব্বপ্রথম চীনদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পোর্সিলেন শিল্প এক সময় চীনের প্রধান জাতীয় শিল্প ছিল। সরকারী পোর্সিলেন কারখানা সমূহে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জীবিকার সংস্থান করিত। আতস বাজি, বোমা এবং বারুদও চীনেরই আবিষ্কার।

কিংবদন্তী এই যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭০০ অব্দে লি-জু (Lei-tzu) গুটিপোকা হইতে রেশম বাহির করিয়া তাহা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিবার কৌশল আবিষ্কার করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চীনদেশে ব্যবহৃত একখানা শকটের সম্মুখভাগে একটি ক্ষুদ্র ঢোলক সংলগ্ন থাকিবার কথা শোনা যায়। শকট-

চক্রের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আবর্ত্তনের পর যান্ত্রিক কৌশলে ঢোলকটিতে আঘাত পড়িত। ইহাই প্রথম বেগ পরিমাপক যন্ত্র (Speedometer)। এই আদিম বেগ-যন্ত্রটির চীনা নামের ইংরেজী অনুবাদ করিলে এই রূপ দাঁড়ায়—"Measure-mile-drum-cart"।

চীনের কৃষক

মহাচীনের বিরাট জন-সমষ্টির শতকরা সত্তর হইতে আশি জনের কৃষিকার্য্যই একমাত্র জীবিকা। জীবন ধারণের জন্য তাহারা একান্ত ভাবেই মাতা বসুন্ধরার করুণার মুখাপেক্ষী। চীনের কৃষক সম্প্রদায় তাহার সমাজ-শরীরের মেরুদণ্ড। আর এই সম্প্রদায়ের ভাগ্যের সহিত চীনের জাতীয় উন্নতি একই সূত্রে গ্রথিত। অধ্যাপক টনি-র (Professor Tawney) কথায়—"A tolerable standard of well-being cannot be said to prevail as long as some considerable proportion of her (China's) rural population is under-fed and under-housed, decimated by preventible diseases and liable to be plunged in starvation by flood and drought. A stable state is equally difficult of creation until the social conditions of China have been substantially improved."—(*Land and Labour in China*)। কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে না পারিলে চীনের জাতীয় উন্নতির সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য।

অদৃষ্টের পরিহাসে চীনের কৃষক সমাজ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আছে। মনে রাখিতে হইবে যে মহাচীনের

সর্ব্বত্রই কৃষকের অবস্থা ঠিক এক প্রকার নহে। কিন্তু এ কথা বলিতে বাধা নাই যে মোটের উপর তাহারা দরিদ্র। চোখে না দেখিলে সে দারিদ্র্যের স্বরূপ কল্পনা করা যায় না। চীন-কৃষকের জীবনযাত্রার সাধারণ মান কত নিম্ন, তাহাও চোখে না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না।

এই অন্তহীন দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, কৃষকদিগের জমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। অবশ্য বড় জোত একেবারে নাই এমন নহে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য এবং যেগুলি আছে তাহাও অতি দ্রুত অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। প্রচলিত আইন অনুসারে পৈত্রিক সম্পত্তিতে সমস্ত পুত্রের সমান অধিকার। সুতরাং প্রত্যেক পুরুষেই কৃষকের অধিকৃত জমি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক এবং ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় জমির উন্নতি সাধনে একেবারেই অনবহিত। উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধন না করিয়া ইঁহারা সেই অর্থ দ্বারা সহরে বাড়ী করেন, জিনিষপত্র বন্ধক রাখিবার দোকান খোলেন, আর না হয় টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহাতে লাভও হয় বেশী। এদিকে জমি চাষ করে যে কৃষক, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার দিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা তাহার অমানুষিক। স্বীয় কার্য্যে দক্ষতাও তাহার অনন্যসাধারণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাকে একান্ত ভাবে প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে একেবারেই শক্তিহীন।

চীনের গণ-শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম খ্যাতনামা কর্ম্মী ডাঃ জেম্‌স্ ইয়েন্ জাপ-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার (১৯৩৭) অব্যবহিত পূর্ব্বে পিকিং হইতে ২৮০ মাইল দূরে টিং-সিয়েনের কৃষকদিগকে উন্নত ধরণের কৃষি-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। স্থানীয় জনসাধারণ এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে কি না সে সম্বন্ধে

গোড়ার দিকে সন্দিহান থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই প্রচেষ্টার সফলতার কথা সমগ্র চীনে ছড়াইয়া পড়িবার ঠিক মুখেই প্রতিবেশী জাপানের সঙ্গে চীনের জীবন-মরণ সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় এই ধরণের অন্য কোন প্রচেষ্টা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

কৃষিকার্য্যের জন্য বেতনভোগী শ্রমজীবীর প্রয়োজন চীনদেশে খুব বেশী হয় না। ইহার কারণ দ্বিবিধ—প্রথমতঃ, সাধারণ কৃষকের জমির পরিমাণ খুব কম এবং দ্বিতীয়তঃ, একটু বয়স হইলেই কৃষক-পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ক্ষেতের কাজে মাতা-পিতাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করে। কাজেই বিত্তহীনের দল উদরান্নের জন্য কর্ম্মসংগ্রহের চেষ্টায় সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী সহরে যায়, আর না হয় সৈন্য অথবা দস্যুদলে যোগ দান করে।

কৃষক জমির খাজানা নগদ টাকা অথবা ইচ্ছা করিলে ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য দ্বারা দিতে পারে।

১৯৩৭ সালে যখন জাপানের সহিত চীনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন সমগ্র চীনে মোট প্রায় পাঁচ কোটি কৃষিক্ষেত্র ছিল। ইহাদের আয়তন গড়ে প্রায় চার একর। জাপানে প্রতি কৃষকের অধিকৃত জমিব পবিমাণ কিন্তু গড়ে ইহা অপেক্ষা অনেক কম। কাজেই চীন-কৃষকের সাধাবণ অবস্থা খুব খারাপ হইবার কথা নহে।

কিন্তু হইলে কি হইবে? কতকগুলি কাবণে দারিদ্র্য তাহার ঘুচিতে পারে না। প্রথমতঃ, চীনে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা প্রচলিত। বিবাহিত পুত্রেরা সকলেই সপরিবারে পিতৃগৃহে বাস করে। একই গৃহে পিতামহ, পুত্র এবং পৌত্রের সমাবেশ বিরল নহে এবং এই ধরণের একটি পরিবারের জনসংখ্যা কোন ক্ষেত্রেই ১০।১২ জনের কম হয় না। দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র মঙ্গোলিয়া ভিন্ন চীনের অন্য কোথাও কৃষকেরা পশুপালন করে না (অবশ্য কৃষিকার্য্যের জন্য না হইলে নয় এমন পশুর কথা ছাড়িয়া দিলে)। তৃতীয়তঃ, প্রচণ্ড শীতের জন্য বৎসরের অর্দ্ধেক না হইলেও এক তৃতীয়াংশ সময়

ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং বিপর্য্যয়ের কথাও মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষের ন্যায় চীনেও কৃষক শিশু জন্মগ্রহণ করে দারিদ্র্যের মধ্যে। দারিদ্র্যের মধ্যেই সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং এই দারিদ্র্যের মধ্যেই তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চীন-কৃষকের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা অমানুষিক। জমিতে জল সেচন বিষয়ে চীন-কৃষক অপ্রতিদ্বন্দ্বী। খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে জেচোয়াং প্রদেশে প্রচলিত জল-সেচন ব্যবস্থা এত সুন্দর যে ইহা আধুনিক পূর্ত্তশিল্পীদিগের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চীনের কৃষকের এক প্রধান শত্রু জমিদার। জমিদার সাধারণতঃ জমিদারিতে থাকেন না। আর যখন থাকেন, তখনও প্রজার প্রতি ভূম্যধিকারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি একেবারেই উদাসীন। তাঁহার কারণ বোধ হয় এই যে জমিদার জানেন যে জমিদারি শীঘ্রই ভাগ-বাঁটোয়ারা হইযা যাইবে। সুতরাং প্রজাদের নিকট হইতে যত কম সময়ে যত বেশী আদায় করিয়া লওয়া যায়, সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। আর যখন জমিদারের অনুপস্থিতিতে গোমস্তা কর্ত্তা হইয়া বসে, তখন কৃষকেব দুঃখ-দুর্দ্দশা চরমে উঠে। জমিদারের খাজানাব সঙ্গে গোমস্তার সেলামিও তাহাকে জোগাইতে হয়। কৃষকের আব এক প্রধান শত্রু মহাজন। দরিদ্র বলিয়া মহাজনের দ্বারস্থ না হইয়া তাহার উপায় নাই। মহাজনও সুযোগ বুঝিয়া অতি উচ্চ হারে সুদের দাবী করিযা থাকে। ঋণ পরিশোধেব জামিনস্বরূপ কিছু দিন পূর্ব্বেও কৃষককে অনেক সময় ক্ষেতের ফসল বন্ধক রাখিতে হইত।

ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য বাজারে পাঠাইবার ব্যয় এবং অসুবিধাও বিস্তর। দেশের মধ্যে বিভিন্ন জাযগায় শুল্ক সংগ্রহের ঘাঁটি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতেই কিছু কিছু আক্কেল সেলামি দিতে হয়। বেশী দিনের কথা নহে হ্যাংকাও-এ উৎপন্ন চা ৬০০ মাইল দূববর্ত্তী সান্‌সিতে আনিতে হইলে পথে অন্যান দ্বাদশটি বিভিন্ন ঘাঁটিতে শুল্ক দিতে হইত। চীন দেশে উৎপন্ন চা

এবং রেশম পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য ইহাদের উৎপাদন এবং রপ্তানি খুবই কমিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক দুর্য্যোগ এবং অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে কৃষকদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষের পর সৈন্যাধ্যক্ষ জুলুম করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে জেচোয়াং প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রজাদের ষাট বৎসরের খাজানা অগ্রিম দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও কৃষকের বিপদ্ কাটে নাই। সৈন্যদল কর্ত্তৃক বারবার তাহাদের গৃহ এবং সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৩১ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে চীনে কৃষকের অবস্থায় আংশিক উন্নতি ঘটে। টি, ভি, সুং ছিলেন এই সময় নান্‌কিং সরকারের অর্থ সচিব। তাঁহার চেষ্টায় দেশেব মধ্যে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় জিনিষপত্র পাঠাইবার শুল্ক একেবারে না হইলেও বহুলাংশে উঠিয়া যায়। এদিকে কৃষি-দপ্তর হইতে কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করা হয় যে উন্নত ধরণের কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। সরকারী কৃষি বিভাগ তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বীজ, বিশেষতঃ তুলার বীজ, বিতরণ করিতে আরম্ভ করে। নূতন নূতন রেলপথ এবং হাজার হাজার মাইল মোটর চলাচলের রাস্তা নির্ম্মিত হওয়াতে কৃষকের দুর্ভাগ্যের বোঝা কিছুটা হাল্কা হইল। বহু সমস্যার সমাধান কিন্তু তখনও বাকী রহিয়া গেল। জমিদার এবং মহাজনের ক্ষমতা তখন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম চীনে সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপই করা হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে চীন-কৃষকের অবস্থা যে তৃতীয় দশকে তাহার অবস্থা অপেক্ষা মোটের উপর উন্নত ছিল, একথা অস্বীকার করা চলে না।

১৯৩৭ সালে জাপ-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। আক্রমণকারী জাপ সৈন্যদল কৃষকের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন

করিয়াছে আর স্ত্রীলোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। (তুলনীয়—"And wherever a Japanese regiment goes all available women from grandmothers to little things of seven or eight years, are swept into the "Consolation House" for the use of Japanese soldiers."—*The Story of China's Revolution*, by O. M. Green, P. 171)।

এই অপরিসীম দুঃখ এবং দুর্গতির মধ্যেই কিন্তু নবারুণ-রেখা দেখা যাইতেছে। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের জোয়ার আসিয়াছে। দিনের পর দিন জীবনের স্পন্দন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে চীনের রাজধানী চুংকিং-এ স্থানান্তরিত হয়। তাহার পর জাতীয় জীবনের ঘোরতর দুর্য্যোগর মধ্যেও কৃষি এবং কৃষকের উন্নতির প্রচেষ্টা মোটের উপর অব্যাহত রহিয়াছে।

কৃষকের অবস্থার উন্নতিকল্পে যাবতীয় জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রম-সমবায় আন্দোলনের (Industrial Co-operative Movement) কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। কি ভাবে ইহার সূচনা হয় বলা শক্ত। জাতীয় সরকার চুংকিং-এ সরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই গুটিকয়েক এই ধরণের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে মিঃ রিউই এ্যালে এবং চীনের খ্রীষ্টীয় যুব সমিতির (Y. M. C. A.) সম্পাদক মিঃ জর্জ্জ হগ্ এবং ডাঃ এচ্, এচ্, কুং-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নিউজিল্যাণ্ডবাসী মিঃ রিউই এ্যালে বহুদিন যাবত চীনে বাস করিতেছেন। ইনিই চীনের শ্রম-সমবায় আন্দোলনের মাতা, পিতা এবং ধাত্রী। এ্যালে প্রথম হইতেই মহাচীনের জাতীয় বিপ্লবের প্রতি সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন মনোভাব পোষণ করিয়া আসিতেছেন। চীনের বিপ্লব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করিবার জন্য প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কয়েক বৎসর পর তিনি চীনে আসিয়াছিলেন। এ্যালে কিছুদিন

সাংহাই মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে কারখানা পরিদর্শকের কাজ করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি চীনের শ্রমিক এবং শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি দেখিলেন যে শ্রমিকদের মজুরির হার অত্যন্ত অল্প এবং তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানগুলি নোংরামির প্রতিমূর্ত্তি এবং মনুষ্য বাসের অযোগ্য। যে সমস্ত কারখানায় তাহারা কাজ করে সেগুলিতে দুর্ঘটনা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইলেও দুর্ঘটনা যাহাতে ঘটিতে না পারে সেই জন্য সতর্কতামূলক কোন ব্যবস্থা বা দুর্ঘটনার ফলে যে সমস্ত শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এবং অসুস্থ শ্রমিকদিগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। মিঃ এ্যালে তখন হইতেই চীনের সর্ব্বহারা সম্প্রদায়ের দুঃখ মোচনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৩৮ সালে অর্থাৎ চীন-জাপান যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে এ্যালে এবং তাঁহার কয়েক জন মার্কিন ও চীনদেশীয় বন্ধু পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে দেশময় শ্রমিকদিগের সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিলেই রণ-বিধ্বস্ত মহাচীনে শ্রম-শিল্পের নবজন্ম হইবে। কয়েকজন উৎসাহী এবং তরুণ বয়স্ক চীনদেশীয় এঞ্জিনিয়ারের সহযোগিতায় এবং চীন সরকার ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যে এ্যালে এবং তদীয় সহযোগীবৃন্দের পরিকল্পনা বাস্তবরূপ গ্রহণ করিল।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল—

(১) জাপান কর্ত্তৃক অর্থনৈতিক অবরোধ এবং জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর দিয়া দেশে জাপানী পণ্যের প্রবেশ সত্ত্বেও শ্রম-শিল্পের দিক হইতে চীনকে স্বাবলম্বী এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিয়া তোলা। যুদ্ধকালীন বিপর্য্যয়ের জন্য বিদেশ হইতে বৃহদায়তন এবং গুরুভার যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং এই সব যন্ত্রপাতি ব্যতীতই কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

(২) জাপ বিমানের পাল্লার বাহিরে দেশের অভ্যন্তরভাগে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-কেন্দ্র গঠন করা। যে সমস্ত অঞ্চল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে সে সমস্ত জায়গায় ছোট ছোট ভ্রাম্যমান শিল্প-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে যেন প্রয়োজন হইলে অল্প সময়েব মধ্যেই সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা চলে।

(৩) লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদিগের স্ত্রী-পুত্র এবং অক্ষম সৈনিকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহেব ব্যবস্থা করা।

এ্যালে এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এই আশা পোষণ করিতেন যে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করিবার ফলে কর্ম্মীরা গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিবে। তাহাদের উদ্যম এবং আত্মনির্ভরশীলতা বর্দ্ধিত হইবে। চীন রাষ্ট্রেব নাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিবে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি, সাহস এবং শক্তি অর্জ্জন করিবে।

শ্রম-সমবায় আন্দোলন জাতীয় সবকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত। যুদ্ধের সময় ইহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র চুংকিং-এ অবস্থিত ছিল। যে সমস্ত অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে জাপ-আক্রমণ-আশঙ্কামুক্ত ছিলনা, সে সমস্ত অঞ্চলে "গরিলা" শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রায় ২০,০০০ শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠান (Industrial Co-operative) ছিল। বিগত কয়েক বৎসরে ইহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বন্দুক, মেশিন গানের গুলি, সৈন্যদের ব্যবহার্য্য পোষাক, কম্বল, জুতা, ঝোলা এবং চামড়ার জিনিস, গৃহসজ্জার আসবাব, তৈজসপত্র, সাবান, দিয়াশলাই, চর্ব্বি-বাতি এবং নানা প্রকার রাসায়ণিক দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হয়।

নূতন শিল্প-সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইলে উদ্যোক্তাদিগকে প্রস্তাবিত মূলধনের এক দশমাংশ সংগ্রহ করিতে হয়। বাকী নয় ভাগ

সরকার নিজে ধার দেন্ অথবা নিজ দায়িত্বে কোন ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া দিয়া থাকেন। সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহ ও যত শীঘ্র সম্ভব এই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ১৯৩৯ সালে সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে টাকা ধার দিয়াছিলেন ১৯৪২-এর পূর্ব্বেই তাহার বেশীর ভাগ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সর্ব্বশেষ যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রতিমাসে উৎপন্ন পণ্যের মূল্য তিন লক্ষ পাউণ্ড।

এই আন্দোলনের ফলেই চীন দেশের কৃষক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ না হইলেও বহুলাংশে কৃষি-নিরপেক্ষ হইতে সমর্থ হইয়াছে। শীতকালে যখন চাষের কাজ বন্ধ রাখিতে হয়, কৃষক তখন ঘরে বসিয়াই নিয়মিত ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। এই আন্দোলনের ফলেই আবার অভিনব সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছে। শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ শিক্ষা এবং জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত। জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধগুলির সম্যক্ প্রতিপালন এবং নিজেদের সন্তানগণের শিক্ষার প্রতি ইঁহাদের সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই আবার কর্ম্মিগণ শিল্পনৈপুণ্য অর্জ্জন করেন। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন শিল্পে এই উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

সমবায় আন্দোলন চীনের অর্থনৈতিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারিবে কি না জোর করিয়া বলা শক্ত। হয়ত পারিবে না। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে বহু চীন-সন্তান যে কলের মজুর বা কারখানার বেতনভোগী শ্রমিক হইবার দুর্গতি হইতে অব্যাহতি পাইয়া দৈহিক, মানসিক এবং চারিত্রিক অপঘাতের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও পাইবে তাহা অস্বীকার করা চলে না।

১৯৪২ সালের জুন মাসে চুংকিং সরকারের ভূমি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত দপ্তর (National Land Administration) স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান

উদ্দেশ্য কৃষক যে জমি চাষ করে তাহাকে সেই জমি ক্রয় করিতে সাহায্য করা। অল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে কুসীদজীবীদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। কৃষকগণ প্রধানতঃ "ফার্ম্মার্স্ ব্যাঙ্ক" (Farmers' Bank), "দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব চায়না" (The Central Bank of China) এবং "দি ব্যাঙ্ক অব কম্যুনিকেসন্স্" (The Bank of Communications) হইতে প্রয়োজন মত ঋণ পাইয়া থাকে। শেষোক্ত দুইটি চীনের প্রধান সরকারী ব্যাঙ্ক। সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহ নিজেরাও টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। টাকা ধার করিবার উদ্দেশ্যের উপর সুদের হার নির্ভর করে। সাধারণতঃ শতকরা বার্ষিক ১½ হইতে ৬।৭ ডলার পর্য্যন্ত সুদ নেওয়া হইয়া থাকে।

এ কথা অবশ্য বলা চলে না যে চীনের কৃষককুলের আজ আর কোন অসুবিধা নাই। বহু বিষয়েই এখনও তাহাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে হইবে এবং প্রতিবন্ধকও রহিয়াছে সংখ্যাতীত। বিনিযুক্ত স্বার্থবান্ সম্প্রদায় মনে করে যে কৃষকের অবস্থার উন্নতি তাহাদের (প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের) শ্রেণী-স্বার্থের পরিপন্থী। প্রতিক্রিয়াপন্থিগণ সংস্কারকগণের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে সচেষ্ট। এমন কি চিয়াং-কাই শেকের সহিতও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের একাধিক বার মতান্তর ঘটিয়াছে। চোরাকারবারী এবং চাউলের মজুতদারগণই বিশেষ করিয়া কৃষকদের কল্যাণ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং করিতেছে (তুলনীয় ভারতবর্ষের অবস্থা)।

মুদ্রাস্ফীতি জনিত আর্থিক বিপর্য্যয়ের ফলে সরকারকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করির্তে হইতেছে। ইহার ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের যতটা অসুবিধা হইয়াছে, কৃষকদের ততটা হয় নাই। যদিও সমস্ত জিনিস-পত্রের দামই ৭।৮ গুণ হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ গুণ বা তাহারও বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, তথাপি কৃষি-জাত দ্রব্যের উচ্চ মূল্যের জন্য কৃষক সম্প্রদায় অন্যদের মত অসুবিধায় পড়ে নাই।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে শ্রম-সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাইবার ব্যবস্থা চীন-কৃষকের পক্ষে অভিনব এবং পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল জীবন যাপন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাগাধুনিক ইতিহাস

মহাচীনের আদিম অধিবাসীদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণ মিয়াওজে, লোলো, টৌ, লি ইত্যাদি নামে পরিচিত। ইহারা প্রধানতঃ কোয়েইচো (Kweichow), জেচোয়াং, ইউনান, কোয়াংটুং (Kwangtung) ও কোয়াংসি (Kwangsi) প্রদেশের পর্ব্বতবহুল অঞ্চলে এবং হাইনান (Hainan) দ্বীপে বাস করিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও ইহারা বহুলাংশে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

আনুমানিক ৪,৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক চীনজাতি প্রথম চীন দেশে আগমন করে। এই নবাগতগণ প্রথমতঃ পীত নদীর পশ্চিম তীরে সান্‌সি প্রদেশ অধিকার করিয়া সেখানে বসবাস করিতে থাকে। কালক্রমে ইহারা পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫৫২ অব্দে ফু-সি (Fu-hsi)-র সিংহাসনারোহণ চীন-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটী বিশেষ স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনিই প্রথম চীনবাসীদিগকে জালের সাহায্যে মাছ ধরিতে এবং বনের পশুকে পোষ মানাইতে ও পালন করিতে এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেন্। তিনিই বিবাহ সংক্রান্ত আইন কানুনগুলি বিধিবদ্ধ করেন এবং চিত্র-লিখন পদ্ধতি (Hieroglyph) প্রবর্ত্তিত করেন। ফু-সি-র উত্তরাধিকারী সেন্-নুং (Shen-nung) কৃষিকার্য্য এবং বনৌষধির ব্যবহার প্রচলিত করেন। সেন্-নুং-এর পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা হোয়াংটি (Hwangti)

চীন-পাঁজির আবিষ্কর্ত্তা। কেহ কেহ বলেন যে তিনিই চীনে রেশম কীট পালন প্রথার প্রবর্ত্তক। হোয়াংটি-র উত্তরাধিকারী ইয়াও (Yao) এবং সু (Shu) ও ইউ (Yu) নামে তাঁহার দুইজন সহযোগী কৃষিকার্য্যের সুবিধা এবং বন্যা প্রতিরোধের নিমিত্ত কয়েকটি খাল খনন করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২২০৫ অব্দে ইউ দি গ্রেট (Yu the Great) সিয়া (Hsia) রাজবংশেব প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৭৬৬ অব্দে সাং (Shang) বংশোদ্ভব টাং (Tang) সিয়া বংশের বিলোপ সাধন করিয়া সাং অথবা ইন্ (Shang or Yin) রাজবংশ স্থাপন করেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১১২২ অব্দে উ উং (Wu Wung) কর্ত্তৃক চৌ (Chou) রাজবংশ স্থাপিত হয়। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২৫৫ অব্দে চৌ বংশের পতনের পর কিছুকাল পয্যন্ত দেশব্যাপী অরাজকতার তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে।

চৌ বংশীয়গণ প্রথমতঃ সেন্‌সি (Shensi) প্রদেশে বাস করিতেন। কিঞ্চিদূন সহস্র বর্ষকাল চৌ নৃপতিগণ চীনের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। প্রত্ন-তাত্ত্বিক বিচারে চৌ যুগকে ব্রোঞ্জের যুগ বলা যাইতে পারে। আর সমাজ-তত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহাকে সামন্ততন্ত্রের যুগ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ঐতিহাসিক বিচারে এই যুগ চীন ইতিহাসের "ক্লাসিক্যাল" যুগ (Classical Age)। গ্রীক ইতিহাসের স্বর্ণ যুগের সহিত এই যুগের তুলনা মোটেই অসমীচীন হইবেনা। চীন ভাষায় লিখিত দুইখানি সর্ব্বাপেক্ষা বহুল পঠিত এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বুক অব সঙ্‌স্' (Book of Songs) এবং 'বুক অব হিষ্টরি' (Book of History) এই যুগেই রচিত হয়। বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্তও এই দুইখানি পুস্তক মহাচীনের ভাবধারাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

সেন্‌সি প্রদেশের সিয়ান্ (Sian) নগরের অনতিদূরে চৌ রাজগণের প্রথম রাজধানী ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৭৭১ অব্দে একটি যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সিয়ান্ পরিত্যক্ত হওয়ার পর উত্তর হোনানে নূতন রাজধানী স্থাপিত হইল।

কন্‌ফ্যুসিয়াস

চীনের বিখ্যাত ধর্ম্মগুরু

এই উত্তর হোনানেই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সাং (Shang) রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

চীনের দার্শনিক চিন্তা জগতের তিন দিক্‌পাল লাওসে (Laotze), কন্‌ফ্যুসিয়াস্ (Confucius) এবং মেন্‌সিয়াস্ (Mencius) এই যুগেই আবির্ভূত হ'ন্।

মানুষের মনোজগতে বিবর্ত্তনের ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে বৈশালী নগরে বর্দ্ধমান মহাবীর ও কপিলাবস্তুর সর্ব্বত্যাগী রাজপুত্র ভগবান বুদ্ধ এবং মহাচীনে লাওসে ও কন্‌ফ্যুসিয়াস্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬০৪ অব্দে চীনের অন্তর্গত হোনান প্রদেশে লাওসে ভূমিষ্ঠ হ'ন্। লাওসে কথাটির অর্থ বৃদ্ধ। জনশ্রুতি এই যে লাওসে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখনই তাঁহার মাথায় টাক এবং মুখে দাঁড়ি ছিল। তিনি প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়ের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত অতীন্দ্রিয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। লাওসে প্রবর্ত্তিত মতবাদ তাওয়িস্‌ম্ (Taoism) নামে অভিহিত হয়। 'তাও' অর্থ অভ্রান্ত অথবা যুক্তি। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৫১ অব্দে সান্‌টুং প্রদেশে কন্‌ফ্যুসিয়াস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে তাহা প্রচার করেন। কন্‌ফ্যুসিয়াস্ প্রথমে লু প্রদেশের শাসনকর্ত্তার উপদেষ্টা ছিলেন। প্রভুর সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি এই কাজ ছাড়িয়া দেন্। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৭৯ অব্দে তাঁহার দেহাবসান হয়। অনুগামিগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে তাঁহার উপদেশাবলী সংগৃহীত হয়। কন্‌ফ্যুসীয় দর্শনে অতীন্দ্রিয়বাদের স্থান নাই। শুদ্ধ নীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। কন্‌ফ্যুসীয় দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে নারী পুরুষের, পুত্র পিতার এবং সকলে রাজার বশে থাকিবে। পরিবারের উপর পিতার কর্ত্তৃত্বের ন্যায় সমগ্র সমাজের উপর রাজার অবাধ এবং নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৭২ অব্দে মেন্‌সিয়াস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান লু। কন্‌ফ্যুসিয়াসের শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও মেন্‌সিয়াসের চিন্তাধারা অধিকতর মৌলিক। মেন্‌সিয়াস্‌ই সর্ব্বপ্রথম কন্‌ফ্যুসিয়াসের উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে তাহা প্রচার করেন।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২২১ অব্দে চিন্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা (Duke of Tsin) চিন্ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্রাট (Hwangti) উপাধি গ্রহণ করেন। ইতিহাসে ইনি সি-হোয়াংটি (Shi-Hwangti) নামে সমধিক পরিচিত। সি-হোয়াংটিই সর্ব্বপ্রথম চীনে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০৯ অব্দে সম্রাট সি-হোয়াংটি-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তৎ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের অবসান হয়। কিন্তু তাঁহার দ্বাদশ বর্ষব্যাপী নাতিদীর্ঘ রাজত্ব কালে রাজ্যের আয়তন উত্তরে মহাপ্রাচীর (Great Wall) হইতে দক্ষিণে ইয়াংসি নদী এবং পূর্ব্বে পীতসাগর (Yellow Sea) হইতে পশ্চিমে জেচোয়াং প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সামন্ত প্রথার ধ্বংস সাধন এবং মহাপ্রাচীরের সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন সি-হোয়াংটি-র দুইটি অমর কীর্ত্তি। যাবতীয় প্রাচীন গ্রন্থকে অগ্নিসাৎ করিবার আদেশ প্রদান সি-হোয়াংটি-র আর একটি কীর্ত্তি। তবে ইহা কুকীর্ত্তি।

সি-হোয়াংটি-র দেহাবসানের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং গৃহ-যুদ্ধ চলিবার পর খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০৬ অব্দে শাসন ক্ষমতা হান্ (Han) বংশের হস্তগত হইল। এই বংশের প্রথম সম্রাট লিউ-প্যাং (Liu-Pang)। এই বংশের দুইটি শাখা প্রাচীন বা প্রতীচ্য হান্ রাজবংশ এবং অর্ব্বাচীন বা প্রাচ্য হান্ রাজবংশ নামে পরিচিত। সিয়ান্—তদানীন্তন চাঙ্গান (Changan)—হান্ রাজাদের রাজধানী ছিল। হান্ যুগে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। এই যুগেই রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। হান্ বংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে তাতারগণ প্রবল হইয়া বার বার চীন আক্রমণ করিতে থাকে। হিউং-নু বা হূণ (Hiung- nu or Hun)

জাতিও এই সময়েই চীন আক্রমণ করে। হূণ আক্রমণে বিব্রত এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ হান্ রাজগণ বহুদিন পর্য্যন্ত হূণদিগকে কর স্বরূপ রেশম, চাল এবং মদ্য জোগাইয়াছিলেন।

২২১ খ্রীষ্টাব্দে হান্ রাজবংশের পতন হয়। মহাচীনের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যুগে যুগে একই কারণ রাজ্য এবং সাম্রাজ্যের পতন ঘটাইয়াছে। দেশের সমৃদ্ধি, রাজ দরবারের ঐশ্বর্য্য, বিলাস এবং জাঁকজমক, বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত কতকগুলি বিত্তবান্ এবং সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের আড়ম্বরের অন্তরালে প্রতিযুগেই অগণন জন সাধারণের অন্তহীন দারিদ্র্যের কাহিনী চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এই দারিদ্র্য যখন সহনশীলতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে তখনই কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে রাজ্য বা সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছে। এই সমস্ত বিদ্রোহের যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারাই বাহুবলে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া বসিতেন।

হান্ বংশের পতনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দী কাল পরিপূর্ণ মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এই যুগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজ্যগুলির নাম ওয়েই (Wei), যু (Wu) এবং সু (Shu)। ইহারা সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। অবশেষে ওয়েই-এর রাজা তাঁহার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া প্রতীচ্য চিন্‌বংশের (Western Tsin Dynasty) প্রতিষ্ঠা করেন (২৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)। এই বংশের রাজাদের প্রথম রাজধানী কাইফেং (Kaifeng)। অল্পকালের মধ্যেই তাতার আক্রমণের ফলে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরে নান্‌কিং (Nanking)-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। এইখানে পর পর প্রাচ্য চিন্ (Eastern Tsin), সুং (Sung), সি (Tsi), লিয়াং (Liang), চেন্ (Chen), এবং সুই (Sui) এই ছয়টি রাজ বংশ রাজত্ব করে।

ইহার পর ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে টাং (Tang) রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। টাং বংশীয় রাজগণ ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা টাই ইউয়ান্ (Tai Yuan) স্বীয় সৈন্যদলকে নূতন ভাবে গঠিত করেন। তাতারদিগকে বিতাড়িত করিয়া তিনি সেন্‌সি প্রদেশের অন্তর্গত চাঙ্গানে (Changan) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া তিনি রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। টাং যুগে ৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই যুগেই আবার চীনে সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়।

টাং বংশের পতনের পর ৯৬০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচটি রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। এই যুগ ছিল স্বৈরাচারী রণ-নায়কতন্ত্রের যুগ। ৯৬০ সালে সুং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। চীন আবার ধনৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। চীনের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি ও এই যুগে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহন করিয়াছিল। কিন্তু এই যুগেও সমগ্র দেশে রাজ-কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাইফেং-এ সুং রাজাদের প্রথম রাজধানী ছিল। পরে সেখান হইতে রাজধানী নান্‌কিং-এ স্থানান্তরিত হয়। ইহার পর নান্‌কিং ও পরিত্যক্ত হইল। ইয়াংসি উপত্যকায় হ্যাংচোতে (Hangchow) নূতন রাজধানী স্থাপিত হইল। ১১২৫ সালে কিন্ বা নূচেন তাতারগণ—ইতিহাসে ইহারা 'গোল্ডেন তাতার' অথবা 'গোল্ডেন হোর্ড' (Golden Tartar or Golden Horde) নামে পরিচিত—কাইফেং অধিকার করিয়া সুং সম্রাটকে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করে। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮০ সালে মঙ্গোল জাতীয় ইউয়ান্ (Yuan) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা কাল পর্য্যন্ত সুং এবং তাতারগণের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই ছিল।

১২১৩ সালে চেঙ্গিস্ খাঁনের আক্রমণের ফলে উত্তর চীনের সান্‌টুং উপত্যকা পর্যন্ত মঙ্গোল অধিকার বিস্তার লাভ করে। মোঙ্গল বিজয়-

বাহিনীর কার্য্যক্ষেত্র যে কেবলমাত্র চীন দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে। এশিয়া এবং ইউরোপের বহু দেশও এই সময়ে তাহাদের পদানত হয়। চেঙ্গিস্ খাঁনের পুত্র ওগোটাই খাঁন (Ogotai Khan) পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সম্রাট লি-সুং (Li-Tsung, 1225-65) মঙ্গোলগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া কিন্ তাতারগণকে যুদ্ধে পরাভূত করেন এবং তাহাদিগকে উত্তর চীন হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পর মঙ্গোল মিত্রগণের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের ফলেই লি-সুং রাজ্যচ্যুত হইয়া সপরিবারে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হ'ন্।

চেঙ্গিস্ খাঁনের পৌত্র মঙ্গোল নায়ক কুব্লাই খাঁন (Kublai Khan, 1260-95) অতঃপর চীনের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিলেন। তৎ-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইউয়ান্ বংশ নামে পরিচিত। জাপানের বিরুদ্ধে চীনেব অভিযান কুব্লাই খাঁনের রাজত্বের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অভিযান অবশ্য সুফলপ্রসূ হয় নাই। ইউনান, ব্রহ্মদেশ এবং আনাম অধিকার করিয়া কুব্লাই খাঁন স্বীয় সাম্রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত করেন। মঙ্গোল সম্রাটগণের রাজধানী পিংকিং-এ (১৯২৮ সাল হইতে নাম পিপিং) অবস্থিত ছিল। চীন প্রকৃত প্রস্তাবে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ মাত্র ছিল। বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্য এই যুগে মঙ্গোলিয়ার উত্তর প্রান্ত হইতে আনামের দক্ষিণ সীমান্ত এবং পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর হইতে পূর্ব্বে পীতসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুব্লাই খাঁনের রাজত্বকালে ১২৭১ সালে ভিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কো পলো (Marco Polo) চীন দেশে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চৈনিক সভ্যতা সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতা অপেক্ষা বহু বিষয়ে অধিকতর উন্নত ছিল।

মঙ্গোলদিগের কু-শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইউয়ান্-চাং (Yuan-Chang)-এর নেতৃত্বে চীনের অধিবাসিগণ বিদ্রোহ

ঘোষণা করে। পূর্ব্ব জীবনে বিভিন্ন সময়ে ইনি দস্যু এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ছিলেন। মঙ্গোলগণকে বিতাড়িত করিয়া ইউয়ান্-চাং মিং (Ming) রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। নান্‌কিং-এ তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৪২১ সালে মিং বংশের তৃতীয় সম্রাট ইয়ুলো (Yulo) রাজধানী পিকিং-এ সরাইয়া লইয়া আসেন। উত্তর সীমান্তে যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও মিং রাজগণ অল্পদিনের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন। বাণিজ্য, শিল্পকলা এবং বিদ্যাচর্চ্চার ও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইল।

মিং যুগেই ইউরোপীয় বণিক্‌গণ সর্ব্বপ্রথম চীন দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। পর্ত্তুগীজগণ ১৫১৬ সালে, ফিলিপাইন হইতে স্পেনীয়গণ ১৫৭৫ সালে, ওলন্দাজগণ ১৬০৪ সালে এবং ইংরেজগণ ১৬৩৭ সালে চীনের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। মিং যুগের শেষের দিকে জেস্যুইট্ (Jesuit) যাজকগণ রাজ্‌দরবারে স্থান লাভ করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চীনের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। খাদ্যাভাবে লোকে প্রথমতঃ ঘাসের মূল এবং গাছের ছাল খাইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহাও যখন দুর্ঘট হইল, তখন মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইল। এদিকে মিং দরবার নির্ব্বিকার। পেটের দায়ে বহুলোক এই সময় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। ক্রমে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। ইযাংসি এবং পীতনদীর উপত্যকা ভূমি বিধ্বস্ত করিয়া বিদ্রোহীদল পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ এই সময়ে সাম্রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে মাঞ্চু অভিযান প্রতিহত করিতে ব্যাপৃত ছিল। পিকিং অনায়াসেই বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইল। শেষ মিং সম্রাট আত্মহত্যা করিয়া অপমানের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

এই সময় বিদ্রোহী নেতা লি জে-চেং (Li Tze-Ch'eng) মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে যুদ্ধরত মিং সৈন্যাধ্যক্ষ উ স্যন্-কুয়েই (Wu Sun-

Kuei)-কে আত্ম সমর্পন করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা এবং উপপত্নীকে অপহরণ করেন। আত্মসমর্পন করা দূরের কথা, উ শপথ করিলেন যে, যে কেহ লি-কে হত্যা করিতে পারিবে তাহাকেই তিনি সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিবেন। উ অবশেষে মাঞ্চুগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া পিকিং-এর অল্প উত্তরে মহাপ্রাচীরের পাদদেশে লি-কে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

১৬৪৪ সালে মাঞ্চু নায়ক নুরহাচি (Nurhachi) কর্ত্তৃক চিং (Tsing) রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঞ্চুগণ তাতার জাতীয়। ইহারা প্রথমতঃ মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত কিরিন প্রদেশে বাস করিত। দ্বিতীয় মাঞ্চু সম্রাট কাংহি-র (Kanghi, 1662-1723) রাজত্বকালে মহাচীনের সর্ব্বত্র মাঞ্চু কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ইঁহারই রাজত্বকালে ফরমোসা দ্বীপ চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মঙ্গোলযুগে রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব শাসক জাতির হাতে থাকিলেও বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রধানতঃ চৈনিকগণের হস্তেই ন্যাস্ত ছিল। চীনের অভিনব শাসক সম্প্রদায়ও এই নীতির অন্যথা করেন নাই। কাংহি-র পৌত্র কিয়েন্ লুং (Kien lung, 1736-96)-এর রাজত্বকালে ছোট খাট আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সত্ত্বেও দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা বা সমৃদ্ধি বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। পূর্ব্ব তুর্কিস্থান জয় করিয়া তিনি ব্রহ্মের বিদ্রোহ দমন করেন এবং সেইখানে মাঞ্চু কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে নেপালের গুর্খাগণ তিব্বত আক্রমণ করে। তিনি এই আক্রমণ প্রতিহত করিযা তিব্বতে মাঞ্চু অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিয়েন্ লুং-এর উত্তরাধিকারী কিয়াকিং (Kiaking)-এর সময় হইতে সাম্রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়। শাসন ব্যবস্থা-ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া পড়িল। রাজ্যের সর্ব্বত্র গুপ্ত সমিতি সমূহ সক্রিয হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্র অসন্তোষ বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল।

এদিকে ক্যান্টনস্থিত বৈদেশিক বণিক্‌গণের সংখ্যা দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হইল। কিন্তু নানা প্রকার সরকারী বিধি-নিষেধ এই সমস্ত বণিকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পদে পদে ক্ষুণ্ণ করিত এবং তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত।

১৭২৯ সালে চীনে সর্ব্বপ্রথম অহিফেন-ধূমপান নিষিদ্ধ হইলেও এই নিষেধাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৭৯৬ সালে পুনরায় অহিফেন সেবন নিষিদ্ধ হইল। ১৮০০ সালে সম্রাটের আদেশে চীনে অহিফেনের চাষ এবং বিদেশ হইতে চীনে অহিফেন আমদানি নিষিদ্ধ হইল।

সম্রাট টাওকোয়াং (Taokwang, 1820-50) শাসন-ব্যবস্থা এবং রাজ দরবারের দুর্নীতি দূর করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই।

মাঞ্চু চীন

১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী শেষ চিঙ্‌ সম্রাট স্যুয়ান্‌-টুং সিংহাসন ত্যাগ করায় মাঞ্চু রাজ বংশের অবসান হইল। মাঞ্চু যুগেই চীন প্রথম মধ্যযুগীয় অবস্থা হইতে বর্ত্তমান যুগে উত্তীর্ণ হয়। বহির্জগতের সহিত এই যুগেই তাহার নিয়মিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে ১৮৪২ সালে সভ্য মানুষের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় অপকীর্ত্তি প্রথম অহিফেন যুদ্ধ (First Opium War) সঙ্ঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড চীনের প্রতিপক্ষ ছিল। নান্‌কিং সন্ধির (আগষ্ট, ১৮৪২) সর্ত্তানুসারে পরাজিত চীন ইংল্যাণ্ডকে হংকং (Hongkong) ছাড়িয়া দেয় এবং ক্যান্টন (Canton), এ্যাময় (Amoy), ফুচো (Fuchow),

নিংপো (Ningpo) এবং সাংহাই (Sanghai) বন্দরে বৈদেশিক বণিক্‌গণের বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকার করে।

১৮৪২ সাল হইতে মহাচীনের ভাগ্যাকাশে যে দুর্য্যোগের সূচনা হইয়াছে শতাব্দীর ব্যবধানে আজও তাহার অবসান হয় নাই। কিন্তু এই দুর্য্যোগের মধ্যেই প্রাচীন চীনের চিতা ভস্মের উপর অভিনব চীনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

১৮৪২ সালে কোরিয়া ও আনাম ব্যতীত এবং তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও সিংকিয়াং সমেত চীন সাম্রাজ্য আয়তনে আলাস্কা, হাওয়াই এবং পোর্টো-রিকো সমেত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ৭০৫,৪৯৭ মাইল বড় ছিল। সঠিক জানা না গেলেও মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে ঐ সময় চীনের লোক-সংখ্যা অন্যূন ৪০০,০০০,০০০ ছিল। ১৮১২ সালে এই সংখ্যা ৩৬২,৪৬৭,১৮২ ছিল। মাঞ্চু শাসনাধীন চীনের সাধারণ জীবন যাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন ছিল সত্য, কিন্তু সমসাময়িক ইউরোপের জীবন যাত্রার সাধারণ মানের তুলনায় এই মানকে খুব বেশী নিম্ন বলা চলে না।

পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত মাঞ্চু চীনের সমাজে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আসন ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার ঠিক নীচেই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার পর যথাক্রমে শ্রম-শিল্পী (artisan), ব্যবসায়ী এবং সৈনিক ও ভৃত্য সম্প্রদায়ের স্থান ছিল।

পাশ্চাত্যদেশ সমূহে রাজকর্ম্মচারী, অধ্যাপক ইত্যাদি বুদ্ধিজীবিগণের যে স্থান মাঞ্চু চীনের বিদ্বৎ সম্প্রদায়ও সমাজে সে স্থানের অধিকারী ছিলেন। কনফ্যুসিয়াসের যুগে ইঁহাদিগকে ধনুর্ব্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, সঙ্গীত, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইত। শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত মাঞ্চু শাসনাধীন চীনের ইতিহাসে একান্তই বিরল। অতীত যুগের মনীষিগণের রচিত গ্রন্থাবলী কণ্ঠস্থ করা এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই

শিক্ষার্থীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ফলে সে যুগের শিক্ষা পদ্ধতি জ্ঞান-বিস্তারের সহায়ক না হইয়া তাহার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল অর্থাৎ মাঞ্চু যুগে প্রদত্ত শিক্ষা প্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। চীনবাসীগণ মনে করিতেন যে চীনের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পূর্ণাঙ্গ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে অবশ্য মাঞ্চু রাজগণের যুগে প্রচলিত শিক্ষাবিধিকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে সরকারী চাকুরি মিলিত। কিন্তু সরকারী চাকুরির সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং প্রার্থীর সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত অল্প হওয়ার ফলে সকলের ভাগ্যে তাহা জুটিত না। বিত্তবান্ এবং প্রভাবশালী পরিবারের প্রার্থীদিগের ভাগ্যেই সাধারণতঃ সরকারী চাকুরি জুটিত। অনেককেই শিক্ষকতা দ্বারা অথবা লেখনী চালনা করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতে হইত। এই সমস্ত বৃত্তির পারিশ্রমিক জীবনধারণের পক্ষে একান্তই অপর্য্যাপ্ত ছিল।

মাঞ্চুযুগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে চৈনিকদিগের প্রায় কোন জ্ঞান ছিলনা বলিলেই চলে। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান এবং যন্ত্র-বিজ্ঞান একান্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল।

সমগ্র সমাজের শতকরা প্রায় ৮০ জনই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। আজ পর্য্যন্ত এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। উত্তরাধিকারের প্রচলিত আইন অনুসারে পিতার মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের পর পুত্রগণ সকলেই সম্পত্তির মালিক হইতেন। ফলে চাষের জমি অতি শীঘ্রই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িত। আর এই জন্যই কৃষকের অবস্থা ছিল একান্তই শোচনীয়। প্রয়োজনের তাগিদে কৃষকগণ জমির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি অবহিত হইতে বাধ্য হয়। সারের সাহায্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করিবার প্রথা বহুপূর্ব্বেই চীনদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এবং চীনের ভূমি অতিশয় উর্ব্বর হইলেও কৃষককে নিজের পরিবারবর্গের অন্ন সংস্থান করিবার জন্য শীত-

গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া এবং রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় করিয়া অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত। নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মব্যস্ততার অবসরে মধ্যে মধ্যে অভিনয় দর্শন এবং জুয়াখেলা তাহার চিত্তবিনোদন করিয়া কর্ম্মশক্তিকে সঞ্জীবিত রাখিত।

মাঞ্চু যুগে চীনের সমাজ-সংগঠন ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক। এক একটি পরিবারে যে কেবল মাতা, পিতা এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিই বাস করিত তাহা নহে। প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের উত্তর পুরুষগণের সমবায়ে এক একটি পরিবার গঠিত হইত। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই পরিবারের কর্ত্তা হইতেন। পরিবারের সকলকে নির্ব্বিচারে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী বাঁচিয়া থাকিলে তিনিই পরিবারের কর্ত্রী হইতেন। ফলে ৫০ বা তদধিক বৎসর বয়স পর্য্যন্তও অনেকে স্ব স্ব পরিবারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতেন না। বিবাহ ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর মতামতের কোন গুরুত্বই ছিল না। সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। পুত্র দ্বারা বংশপ্রবাহ রক্ষিত হয় বলিয়া কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিকতর কাম্য এবং আদরণীয় ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা অপরিজ্ঞাত ছিল না। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা, অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্তা, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনা অথবা বাচালস্বভাবা হইতেন, যদি তাঁহার কোন দুরারোগ্য দুর্ব্বলতা বা হাতটান দোষ থাকিত, তবে স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। উপপত্নী রাখা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। উপপত্নী পরিবারের মধ্যে স্থান পাইলেও তাহাকে বিবাহিতা স্ত্রীর সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইত না। সে তাহার উপপতির সামাজিক মর্য্যাদার অংশভাগিনী ছিল না। মাতা এবং পিতার প্রতি আনুগত্য পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে একটি প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত হইত। পরিবারে কর্ত্তা পরিবারভুক্ত সকলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত

করিতেন। বিচিত্র রুচি এবং বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন বহুজনের একত্র একই পরিবারে বাসের ফলে পারিবারিক জীবন সাধারণতঃ সুখের হইত না। মোড়লের নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রাম-বৃদ্ধগণের বৈঠকে গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইত।

বিদ্বৎ এবং কৃষক সম্প্রদায়ের নিম্নেই শ্রম-শিল্পীদিগের স্থান ছিল। উৎপাদন-সহায়ক আধুনিক যন্ত্র পাতির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় মাঞ্চু যুগের প্রায় অবসান কাল পর্য্যন্ত আধুনিক অর্থে বিত্তবান্ পুঁজিপতি এবং বিত্তহীন শ্রমিকের সৃষ্টি হয় নাই। একই শ্রম-শিল্প দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা সকলে মিলিয়া নিজেদের সঙ্ঘ (Guild) গঠন করিত। এই জাতীয় প্রত্যেকটি সঙ্ঘ স্ব স্ব কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ্ এবং তাহার কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিত। সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় উৎপন্ন পণ্যের সর্ব্বনিম্ন মূল্য এবং কর্ম্মীদিগের পারিশ্রমিকের নিম্নতম হার বাঁধিয়া দেওয়া হইত। উৎপন্ন পণ্য উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট না মধ্যম শ্রেণীর হইবে তাহাও এই বার্ষিক সভায় স্থির করা হইত। প্রত্যেক সভ্যকে সঙ্ঘের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইত। এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে প্রতীকার প্রার্থনা করা চলিত সত্য ; কিন্তু তাহাতে সাধারণতঃ কোন ফল হইত না। সঙ্ঘের ব্যবস্থা নাকচ করিতে বিচারকগণও ইতস্ততঃ করিতেন। এই সমস্ত শিল্পী-সঙ্ঘের অনেকেরই নিজস্ব সভা-গৃহ থাকিত।

শিল্পীদিগের ন্যায় বণিক্গণও সঙ্ঘবদ্ধ হইতেন। যাতায়াত-ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হইলেও মাঞ্চু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নিয়মিত-ভাবেই বাণিজ্যিক আদান প্রদান চলিত। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী এবং নদীবহুল অঞ্চল সমূহে একস্থান হইতে অপর স্থানে পণ্য দ্রব্য প্রেরণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। প্রথমতঃ সে যুগের জাহাজ সমুদ্রযাত্রা এবং লম্বা পাড়ির পক্ষে একান্তই অনুপযোগী ছিল। এদিকে স্থল পথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। সমগ্র মাঞ্চু সাম্রাজ্যে একটিও ভাল

রাস্তা ছিল না। অসুবিধার উপর অসুবিধা, জলে স্থলে সর্ব্বত্রই দস্যু-ভীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। চলাচলের অসুবিধা এবং পারিবারিক বন্ধনের জন্যই মাঞ্চু শাসনাধীন চীনের অধিবাসীদিগকে প্রধানতঃ গৃহকোণে বদ্ধ থাকিতে হইত। বাহির বিশ্বের সহিত পরিচয় ছিলনা বলিয়াই সে যুগের চীনবাসী সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইত।

মাঞ্চু শাসন-ব্যবস্থায় সম্রাট নিরঙ্কুশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। এই দিক্ হইতে দেখিলে মাঞ্চু শাসনতন্ত্রকে স্বেচ্ছাচারী বলা ভিন্ন উপায় থাকে না। সম্রাটের একটি উপাধি ছিল "Son of Heaven" অর্থাৎ "ঈশ্বর-পুত্র"। তিনি একাধারে জাতির প্রধান পুরোহিত, আইন প্রণেতা, শাসক এবং বিচারক, এককথায়, জাতির ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। স্বীয় কার্য্যের জন্য তিনি কোন মানুষের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য ছিলেন না।

সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব ছিল সম্রাটের। তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা, স্বীয় পূর্ব্বজগণ কর্ত্তৃক প্রণীত আইন এবং প্রাচীন রীতি, নীতি ইত্যাদি মানিযা চলিতে হইত। কাজেই মাঞ্চু শাসনতন্ত্র কোন সমযেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারমূলক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দুইটি প্রতিষ্ঠান 'গ্র্যাণ্ড্ সেক্রেটারিয়েট্' (Grand Secretariat) এবং্ 'গ্র্যাণ্ড্ কাউন্সিল' (Grand Council)-এর মধ্যে শেষোক্তটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহাতে সাধারণতঃ ছয় জন সদস্য থাকিতেন। শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার বিভিন্ন বিভাগীয় শাসনপরিষদের (Administrative Board) উপর ন্যস্ত ছিল। ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত এই পরিষদের সংখ্যা ছিল ছয়টি—অসামরিক কর্ম্মচারী নিয়োগ বিভাগ (Board of Civil Appointments), রাজস্ব বিভাগ (Board of Revenne), ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান বিভাগ (Board of Rites), যুদ্ধ বিভাগ (Board of War), দণ্ড প্রয়োগ বিভাগ (Board

of Punishments) এবং পূর্ত্ত বিভাগ (Board of Works)। দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের পর ১৮৬১ সালে সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করিবার জন্য পররাষ্ট্র বিভাগের (Board of Foreign Affairs) সৃষ্টি হয়।

'সেন্সর' (Censor) গণ সাম্রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর করিতেন। রাজধানী পিকিং-এ ২৪ জন এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশে ৫৬ জন 'সেন্সর' (Censor) ছিলেন। ইঁহাদিগকে 'সম্রাটের চক্ষুকর্ণ,' (Eyes and ears of the Emperor) বলা যাইতে পারে। স্বয়ং সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কেহই ইঁহাদের সমালোচনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেন না।

সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের শাসনভার একজন রাজপ্রতিনিধির উপর অর্পিত হইত। প্রদেশের শান্তি এবং শৃঙ্খলার জন্য তিনি সম্রাটের নিকট দায়ী থাকিতেন। প্রদেশের দেয় বার্ষিক রাজস্ব নিয়মিতভাবে রাজধানীতে প্রেরণ করিবার দায়িত্বও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইত। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা। অন্যান্য প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কোষাধ্যক্ষ, বিচারক, নিমক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারা (Salt-Intendant) এবং শস্য-কর আদায়কারী (Grain Intendant) কর্ম্মচারীর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রজা ইচ্ছা করিলে অর্থের পরিবর্ত্তে শস্য দ্বারা কর দিতে পারিত। এই শস্য-কর আদায় করা এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা শেষোক্ত কর্ম্মচারীকে করিতে হইত।

প্রত্যেক প্রদেশ আবার কতকগুলি ক্ষুদ্রতর বিভাগে (Prefecture) বিভক্ত হইত। এক এক জন বিভাগীয় শাসনকর্ত্তার উপর ইহাদের প্রত্যেকটির শাসনভার অর্পিত হইত। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র শাসন-কেন্দ্র গুলি আমাদের দেশের জেলার সমতুল্য ছিল। ইহাদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে 'সিয়েন' (Hsien) বলা হইত।

সরকারী চাকুরিতে লোক নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে সরকার কর্ত্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতেন স্বয়ং সম্রাট। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই সব সময় চাকুরি পাওয়া যাইত না। যদি রাজদরবারে কোন পৃষ্ঠপোষক না থাকিতেন, তবে প্রতিপত্তিশালী কোন সভাসদ্‌কে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিতে না পারিলে চাকুরি পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। রাজদরবারে কোন প্রভাবশালী মুরুব্বি না থাকিলে মাঞ্চু শাসনের শেষের দিকে সরকারী চাকুরি লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। রাজকর্ম্মচারীদিগকে অত্যন্ত কম বেতন দেওয়া হইত। অবশ্য ইঁহারা প্রত্যেকে যে ভাতা পাইতেন তাহা বেতন অপেক্ষা বহুগুণ অধিক ছিল। কিন্তু বেতন এবং ভাতাতেও সরকারী চাকুরিয়াদিগের দিন চলা ভার ছিল। সুতরাং সুযোগ পাইলে ইঁহারা প্রত্যেকেই উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। উৎকোচ গ্রহণের সুযোগও ছিল প্রচুর।

প্রত্যেক প্রদেশের দেয় রাজস্বের পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন যখন পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসে, তখন ভূমি-রাজস্বের হার খুব বেশী ছিল না। সরকারী আয়ের একটা প্রধান অংশ বাণিজ্য শুল্ক হইতে আসিত। এই শুল্কের কোন নির্দ্দিষ্ট হার ছিল না। বিদেশীয় বণিক্‌গণকে সম্পূর্ণভাবে শুল্ক সংগ্রাহক কর্ম্মচারীদিগের খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হইত। সংগৃহীত শুল্কের মোটা একটা অংশ আদায়কারীগণ আত্মসাৎ করিত।

মাঞ্চু রাজত্বের শেষের দিকে চীন সরকারকে একাধিক আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। সমরোপকরণ সংগ্রহের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বাড়িয়া যায়। এদিকে দুর্ভিক্ষ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। ফলে প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়। এই সমস্ত মিলিয়া এক ভয়াবহ আর্থিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল।

মাঞ্চু চীনের শাসন-ব্যবস্থা উপরের দিকে স্বেচ্ছাচারী হইলেও নীচের দিকে এই ব্যবস্থা যে বহুলাংশে গণতান্ত্রিক ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ("autocracy super-imposed on democracy")। সরকারী কর্ম্মচারীগণ দণ্ডবিধি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করিতেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন কানুন বিভিন্ন শিল্পী এবং ব্যবসায়ী সঙ্ঘ (Guild) কর্ত্তৃক প্রণীত এবং প্রযুক্ত হইত। সরকারী আদালতের সাহায্য ব্যতীতই সাধারণতঃ ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা করা হইত। গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত গ্রাম-বৃদ্ধ রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন এবং যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে নাগরিকদিগের জীবন রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্ব মুক্ত ছিল।

যুগ-সন্ধি

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট টাওকোয়াং-এর সংস্কার-প্রচেষ্টার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার বিভিন্ন সংস্কার-প্রচেষ্টার মধ্যে অহিফেন ব্যবসায় বন্ধ করিবার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনে সর্ব্বপ্রথম অহিফেনের আমদানি হয়। তখন কেবলমাত্র ঔষধার্থেই অহিফেন ব্যবহৃত হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণের চীনে আগমনের পর হইতে চীন দেশে প্রথম অহিফেন ধূমপানের প্রথা প্রচলিত হয়। গোড়ার দিকে অবসরভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রধানতঃ অহিফেনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে চীনে প্রচুর পরিমাণে অহিফেন পাঠাইতে আরম্ভ করে। সমাজের সর্ব্বস্তরেই এই সময় হইতে অহিফেন সেবন প্রচলিত হয়। ফলে সমগ্র জাতির দেহ এবং মনের গুরুতর অবনতি সঙ্ঘটিত হইল। চীন সরকার যখন অহিফেনের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া ইহার আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হইলেন, তখন

ইংরেজ বণিক্‌গণ এক অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে চীনগামী জাহাজের খোলে অহিফেন বোঝাই করিয়া দেওয়া হইত। এই সমস্ত জাহাজ চীনে পৌছিয়া তীর হইতে বহু দূরে বন্দর-সীমানার বাহিরে নোঙ্গর করিত। খোলে বোঝাই অহিফেন পরে গোপনে দেশের অভ্যন্তর ভাগে চালান দেওয়া হইত। ইহার ফলে দেশী এবং বিদেশী চোরাকারবারীরা বেশ ফাঁপিয়া উঠিল।

১৮৩৯ সালে সম্রাট টাওকোয়াং অহিফেনের গোপন আমদানি বন্ধ করিবার জন্য লিন্ সি-স্থ-কে (Lin Tsi-Sui) হাই কমিশনার (High Commissioner) নিযুক্ত করিলেন। ক্যাণ্টনে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ও অন্যান্য সমস্ত বিদেশীয় বণিক্‌কে গৃহ-বন্দী করিয়া দাবী করিলেন যে, ইঁহাদের নিকট যত অহিফেন আছে সমস্ত তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বৈদেশিক বণিক্‌গণ প্রাণের দায়ে ২০,২৯১ বাক্স অহিফেন চীন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষও ইহার সমস্তটা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইংল্যাণ্ড এবং চীনের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাই কুখ্যাত প্রথম অহিফেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধে চীন হারিয়া যায়। ১৮৪২ সালে যুদ্ধাবসানে নান্‌কিং সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। পরাজিত চীন প্রবল প্রতিপক্ষের সমস্ত দাবী মানিয়া লইল। ইহারই ফলে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে চীনের অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত লইয়া গেল।

নান্‌কিং সন্ধি অনুসারে মাঞ্চু সরকার বৈদেশিক বণিক্‌গণের যে অহিফেন নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার মূল্য এবং যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ইংরেজদিগকে প্রভূত ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হইলেন। ইহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত চীন যখনই কোন আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে, প্রত্যেকবার বিজেতাকে যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধের ফলে স্পষ্ট বোঝা গেল চীন কত দুর্ব্বল, কত অন্তঃসারবিহীন।[১] অহিফেন যুদ্ধ এবং পররর্ত্তীকালে অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য চীনকে বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের নিকট অনেক টাকা ঋণ করিতে হয়। ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সরকারী আয় বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় বিদেশাগত পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইল। শুল্ক বিভাগ প্রথম হইতেই বিদেশীয়, বিশেষ করিয়া ইংরেজ, কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইত। এই সময় বিদেশাগত সমস্ত পণ্যের মূল্যের উপর শতকরা মাত্র পাঁচ টাকা হারে (5% ad valorem) আমদানি শুল্ক ধার্য্য করা হইল। এই ব্যবস্থার ফলে চীনে বৈদেশিক পণ্যের আমদানি হু হু করিযা বাড়িয়া যাওয়াতে দেশের কুটির-শিল্প এবং অর্থনৈতিক সংগঠন একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। চীনের শিল্পোন্নতির পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়িল এবং জাতির অর্থনীতিক জীবনে ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিল।

বৈদেশিক বণিক্‌গণ পূর্ব্বে কেবলমাত্র নান্‌কিং বন্দরে বাণিজ্য করিতে পারিতেন। প্রথম অহিফেন যুদ্ধের পর অন্যান্য কযেকটি বন্দরে ইহাদিগের বাণিজ্য করিবাব অধিকার স্বীকার করিতে হইল। এই বন্দরগুলিকে Treaty Port বা সন্ধি-বন্দর অর্থাৎ সন্ধির ফলে উন্মুক্ত বন্দর বলা হয়। ১৮৪২ সালের সন্ধির ফলে ক্যাণ্টন, এ্যাময়, নিংপো ফুচো, এবং সাংহাই বন্দরে বৈদেশিকগণের বাণিজ্যাধিকার স্বীকৃত হইল। হংকং ইংরেজদিগকে দিয়া দেওয়া হইল। কোন কোন সন্ধি-বন্দরে ইহার পর আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশ স্থাপিত হইল। এই সমস্ত উপনিবেশে যাহারা বাস করিতেন তাঁহারা বহুলাংশে চীনের সরকারী শাসন-ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব-মুক্ত ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক সন্ধি-বন্দরেই বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রেব নিজস্ব এলাকা ছিল।

১। "The effect of this break through was cataclysmic. It immediately exposed the fact that China not only had ceased to be the "centre of the world" and the greatest fortress in Asia, but on the contrary was powerless against the fate that had overtaken India."

—*The Unfinished Revolution in China* by I. Epstein, p. 19.

এই সমস্ত এলাকাতে বৈদেশিক আইন প্রচলিত ছিল। চীনের কোন অধিবাসী বৈদেশিকদিগের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা করিলে প্রতিবাদীর দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার বিচার হইত। ইহারই ফলে চীনে বৈদেশিকগণের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্ত্তৃত্ব বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

১৮৪৩ সালে ইংল্যাণ্ডের সহিত চীনের আর একটি সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে চীন সরকার একটি নূতন বিধান মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এই বিধানই সর্ব্বজননিন্দিত "most favoured nation clause"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্র চীনে যে সুবিধা ভোগ করিবে অন্য সমস্ত বৈদেশিক রাষ্ট্রই সে অধিকার দাবী করিতে পারিবে।[১]

১৮৪৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চীনের যে সন্ধি হয় তাহাতে আমেরিকা এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ করে। এই নীতি প্রয়োগের ফলে চীনের অস্তিত্ব রক্ষা পাইল সত্য, কিন্তু ইহার জন্য তাহাকে মূল্য দিতে হইল বড় বেশী।[২]

সম্রাট সিয়েংফেং (HsiengFeng, 1851-61)-এর রাজত্ব-কালে মহা-চীনের শাসন-ব্যবস্থা আরও শিথিল এবং কলুষিত হইয়া পড়িল। দেশময়

১। "This subjected the Chinese to another new principle: that any privilege won from them by any foreign country could be equally enjoyed by all other foreign countries." The Making of Modern China by Owen and Eleanor Latimore. p. 117.

২। "The clashing interests of the Western Powers did not allow any one of them............take over China completely. Since the Peking Government was the agent responsible for giving equal terms to all the co-operating contenders, all had an interest in its continued existence. If this was very expensive insurance, it also eliminated certain risks. There is no doubt that, in the long run, it preserved a certain minimum of China's sovereignty, even though the great Chinese leader Sun Yet-Sen was to remark somewhat bitterly that instead of a colony or semi-colony, it made the country a 'hypo-colony'—a colony for everyone."—The Unfinished Revolution in China by I. Epstein, p. 20.

অন্তর্বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই সমস্ত অন্তর্বিপ্লবের মধ্যে টাইপিং বিদ্রোহ (Taiping Rebellion, 1850-64) সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। সামন্ত শক্তির ধ্বংস সাধন এবং সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানো এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় কৃষকদিগের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলিতেছিল। সুতরাং সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ কৃষক সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ টাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল।

এই বিদ্রোহের নেতা হুং সিউ-চুয়ান্ (Hung Hsiu-Chuan) বেশী লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান্ নাই। হুং-এর অনন্য দুর্লভ কর্ম্ম-ক্ষমতা এবং দূরদর্শিতা বহুলাংশে তাঁহার শিক্ষার অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। প্রথম জীবনে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অত্যাচারী মাঞ্চু রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়া "শান্তিময় স্বর্গীয় রাজ্য" (Piny Tien Kuo or Peaceful Kingdom of Heaven) স্থাপন করিবার জন্য জনসাধারণকে তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইতে তিনি আহ্বান করিলেন। লক্ষ লক্ষ কৃষক হুং-এর আহ্বানে সাড়া দিল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হইতেও কেহ কেহ এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। অনেক সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষীও বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিয়াছিল। কোয়ান্-টুং এধং কোয়াংসির অজ্ঞাত অখ্যাত কয়েকটি গ্রামে টাইপিং বিদ্রোহের সূচনা হয়। ১৮৫২ সালের বসন্তকালে বিদ্রোহী বাহিনী কোয়াংসি হইতে হুনান প্রদেশের ভিতর দিয়া উত্তরদিকে অগ্রস হইল। অল্পকালের মধ্যে চাংসা ব্যতীত সমগ্র হুনান, ইয়োচো, হ্যানিয়াং এবং উচাং বিদ্রোহীদিগের পদানত হইল। অতঃপর টাইপিং বাহিনী ইয়াংসি নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইল। ইহার চলার পথে যে সমস্ত জনপদ পড়িল তাহা লুণ্ঠিত এবং ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইল। জমিদারদিগের জমিতে অধিকারসূচক যাবতীয় দলিল পত্র বিদ্রোহীরা ধ্বংস করিয়া ফেলিল (তুলনীয়—ইংল্যাণ্ডের কৃষক-বিদ্রোহ, ১৩৮১ সাল)। নান্‌কিং অধিকার করিয়া হুং সিউ-চুয়ান্ সেইখানে

সদ্যোজাত টাইপিং সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইহার পর কিছু দিনের জন্য টাইপিং বাহিনীর পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রগতি বন্ধ রহিল। কিন্তু উত্তরে পিকিং অধিকার করিবার জন্য অভিযান প্রেরিত হইল। সমস্ত বাধা পদদলিত করিয়া টাইপিং বাহিনী বিজয় গর্ব্বে টিয়েন্‌ট্‌সিন (Tientsin) বন্দরের অনতিদূরে শিবির স্থাপন করিল। তখন বিদ্রোহের প্রাথমিক বেগ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই টাইপিং বাহিনী দক্ষিণে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল (১৮৫৪)। এদিকে টাইপিং বিদ্রোহের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিপ্লবী শক্তিসমূহ সক্রিয় হইয়া উঠিল। ১৮৫৪ সালে বিশাল মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিঃসপত্ন কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইত না।

ঠিক এই সময়েই আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ও বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছিল। ক্যাণ্টনের শাসনকর্ত্তা ইয়ে মিং-চিনের (Yeh Ming-Chin) অনুসৃত নীতিতে তত্রত্য বৈদেশিক বণিক্‌গণ অনেক দিন হইতেই অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি 'এ্যারো' (Arrow) নামক একখানি বিলাতি জাহাজ হইতে কয়েকজন জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করেন। ক্যাণ্টনের ইংরেজ রাজ দূত এই আচরণের জন্য ইয়ে-র নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। ক্ষতিপূরণ দেওয়া দূরের কথা, ইয়ে ইংরেজ দূতের প্রতিবাদের কোন উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না। ইহারই ফলে দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ (Second Opium War) সংঘটিত হয়। সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী ক্যাণ্টন এবং পেইহো (Peiho) নদীর মোহনাতে অবস্থিত টাকুর দুর্গশ্রেণী (Taku forts) অধিকার করিয়া টিয়েন্‌ট্‌সিন অভিমুখে অগ্রসর হইল। কালবিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম মাঞ্চু সরকার ইংরেজ এবং তাহার মিত্র ফরাসী, রুশীয় এবং আমেরিকানদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সমস্ত সন্ধি টিয়েন্‌ট্‌সিনের সন্ধি (Treaties of Tientsin, 1858) নামে খ্যাত। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে পিকিং-এ বৈদেশিক

দূতাবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হইলেও কার্য্যতঃ ১৮৬০ সালের পূর্ব্বে কোন দূতাবাস স্থাপিত হইতে পারে নাই।

১৮৬০ সালে নান্‌কিং হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে টাইপিং বাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ সুচো এবং হ্যাংচো বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হয়। পরে হ্যাংচো পরিত্যক্ত হয়। পশ্চাদপসরণের পূর্ব্বে টাইপিং সৈন্যদল হ্যাংচোর ৭০,০০০ অধিবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সাংহাই অধিকার করিতে যাইয়া বিদ্রোহী বাহিনী বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের নিকট হইতে বাধা পায়। ১৮৬২ সালে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন চার্লস, ই, গর্ডন (Chinese Gordon) সাংহাইর বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। নগরের পর নগর হইতে বিদ্রোহীদিগকে বিতাড়িত করিযা গর্ডন অবশেষে সুচো অধিকার করেন। ইহার পর গর্ডন পদত্যাগ করিলেন। ১৮৬৩ সালের মধ্যেই টাইপিং বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। মাঞ্চু বাহিনী নান্‌কিং পুনরধিকার করিল। হুং সিউ-চুয়ান্ আত্মহত্যা করিলেন।

পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী টাইপিং বিদ্রোহের ফলে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী ১১টি প্রদেশ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে ২০,০০০,০০০ নর-নারীর জীবনান্ত হয়। এই বিদ্রোহ একাধারে ভূস্বামী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদিগের এবং মাঞ্চু কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয় অভ্যুত্থান। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে টাইপিং বিদ্রোহের সমর্থক হইলেও শেষ পর্য্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যেই এই বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। বৈদেশিকগণ যখন বুঝিতে পারিলেন যে বিদ্রোহীগণ তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়ণক হইতে সম্মত হইবেনা তখন তাঁহারা টাইপিংগণের বিরুদ্ধে মাঞ্চুসরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। হুং সিউ-চুয়ান্ বৈদেশিক সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন না। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ নিরপেক্ষ থাকিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন।[১]

১। "The Anglo-French intervention against the Taipings was further sped by the unwillingness of the latter to compete with the

মহাচীনের গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাসে টাইপিং বিদ্রোহ একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। ইহা চীনের সর্ব্বশেষ কৃষক-বিদ্রোহ এবং সর্ব্বপ্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীনের রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীবনে এই বিদ্রোহ এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করিল। যে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে মহাচীন নবজন্ম লাভ করিয়াছে, টাইপিং বিদ্রোহ সে সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়। আজ পর্য্যন্ত এই সংগ্রামের উপর সমাপ্তির যবনিকা পড়ে নাই।

চীনের অর্থনীতিক জীবনে টাইপিং বিদ্রোহীগণই সর্ব্বপ্রথম সমবায় নীতি এবং সাম্যের আদর্শকে রূপ-প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের ভূমি সংক্রান্ত বিধানে ইহাব প্রমাণ রহিয়াছে।[২]

টাইপিং বিদ্রোহের পরবর্ত্তী ২০ বৎসর কাল চীনের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নাই। এই সময়ের মধ্যে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৬৭ সালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে চীন হইতে মিঃ বার্লিংগেম (Mr. Anson W. Burlingame)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধির দল বিদেশে প্রেরিত

Manchus for the post of foreign tool. Hung Hsiu-Chuan, the "Heavenly King", did not ask for European assistance, only for European neutrality. He showed no interest in London's offers to act as "honest broker" between the warring parties, saying that if he had to deal with the Emperor he would do so direct."—*The Unfinished Revolution in China* by I. Epstein, p. 26.

২। "Having fields, let them cultivate together, and when they get any rice, let them eat it together .....so that everyone may share and share alike......As soon as the harvest arrives, every vexillary (lowest Taiping administrative official) must see to it that the twenty-five parishes under his charge have sufficient supply of food, and what is over and above he must deposit in the public granary...Then the sovereign will have sufficient to use and all the families, in every place, will be equally provided for, while every individual will be well-fed and well-clothed"—*Taiping land law*.

হয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। ১৮৭০ সালে টিয়েন্‌ট্‌সিনে একটি ভীষণ দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার ফলে টিয়েন্‌ট্‌সিনের ফরাসী-পরিচালিত অনাথ আশ্রম এবং গির্জ্জা ভস্মীভূত এবং বহু ফরাসী নাগরিক হতাহত হয়। এই সময় ইউরোপে ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ (Franco-Prussian War, 1870) চলিতেছিল। সুতরাং ফ্রান্সের চীনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর ছিল না। পরে অবশ্য চীনসরকারকে এই দাঙ্গার জন্য প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল।

১৮৮৩ সালে ফরাসীগণ কর্ত্তৃক মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত টংকিন (Tongkin) আক্রান্ত হওয়ায় চীন এবং ফরাসী দেশের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। পর বৎসর ফুচো বন্দরে ফরাসী নৌ-বহর কর্ত্তৃক চীনের নৌ-বহর বিধ্বস্ত হয়। ফরাসী বাহিনী অতঃপর ফরমোসা অধিকার করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। ১৮৮৫ সালে স্বাক্ষরিত একটি সন্ধির ফলে টংকিন ফরাসী অধিকার ভুক্ত হইল।

চীনে মাঞ্চুকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ৬৬৭ সালে চীন কোরিয়া অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু কোরিয়াতে চীনের কর্ত্তৃত্ব কোন দিনই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এদিকে প্রতিবেশী জাপানেরও বরাবরই কোরিয়ার উপর শ্যেনদৃষ্টি ছিল। জাপান সুযোগ পাইলেই মধ্যে মধ্যে কোরিয়া আক্রমণ করিত। ১৮৭৬ সালে এই রকম একটি আক্রমণের পর কোরিয়া জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। পিকিং সরকারের আদেশে সমস্ত বৈদেশিক জাতিই এখন হইতে কোরিয়াতে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিল।

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য ১৮৯৪ সালে মাঞ্চু সরকার কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জাপ সরকারও কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার (!) উদ্দেশ্যে সৈন্য পাঠাইলেন। ফলে চীন এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্থল যুদ্ধে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া জাপবাহিনী চীন-

সৈন্যকে কোরিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। জলযুদ্ধেও চীনসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। ইয়ালু (Yalu) নদীর যুদ্ধের পর পোর্ট আর্থার (Port Arthur) জাপানের হস্তগত হইল। ১৮৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল সিমোনোসেকিতে (Shimonoseki) চীন এবং জাপানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা চীন জাপানকে সুদূর প্রাচ্যে সর্ব্ব প্রকারে অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। জাপান চীনের নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থ পাইল। লিয়াওটুং উপদ্বীপ, ফরমোসা এবং পেস্কাডোর‍্স্ দ্বীপমালা জাপ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। পরে রুশিয়া, ফ্রান্স এবং জার্ম্মানী এই ত্রি-শক্তির চাপে পড়িয়া জাপানকে অর্থের বিনিময়ে লিয়াওটুং-এর উপর দাবী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

১৮৯৭ সালে সান্টুং প্রদেশে দুইজন জার্ম্মানী দেশীয় খ্রীষ্টীয় যাজক নিহত হ'ন্। এই হত্যার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীন জার্ম্মানীকে কিয়াওচাও (Kiaochow) ইজারা দিতে বাধ্য হয়। ইহার পর সুদূর প্রাচ্যে শক্তি-সাম্য (Balance of power) রক্ষা করিবার অজুহাতে রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স যথাক্রমে পোর্ট আর্থার, ওয়েইহেইওয়েই (Weiheiwei) এবং কোয়াংচোওয়ানের (Kowangchowwan) ইজারা পায় (১৮৯৮)। ইহাদের দেখাদেখি ইটালি ও চেকিয়াং (Chekiang)-এ সুন্মেন্ (Sunmen) উপসাগরের ইজারা দাবী করে। কিন্তু এই দাবীতে কর্ণপাত করা হয় নাই।

এই সময়েই মাঞ্চুসাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে পারিত। যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব ষ্টেট মিঃহে ঘোষিত 'Open door and equality of opportunity' অর্থাৎ "মুক্তদ্বার এবং অধিকার সাম্যে"র নীতির জন্যই এই পরিণতি সঙ্ঘটিত হয় নাই। এই নীতি অনুসারে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্র চীনে কোন অধিকার লাভ করিলে অন্য সকল জাতিকেই সেই অধিকার দিতে হইত। "মুক্তদ্বার" নীতির ফলে চীন কোন জাতি বিশেষের

উপনিবেশ না হইয়া আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশে পরিণত হইল।[১] এই নীতি এবং আন্তর্জ্জাতিক অসম সন্ধিসমূহ বহুলাংশে চীনের সার্ব্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ করিয়া বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জকে প্রকৃত প্রস্তাবে চীনের ভাগ্যবিধাতা করিয়া তুলিয়াছিল।

জাপ যুদ্ধ যেমন একদিকে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করিল, তেমনই অপরদিকে আবার চীনের সংস্কারপন্থীদিগকে সক্রিয় করিয়া তুলিল। সেং ক্যুও-ফান্ (Tseng Kuo-fan), সো সুং-টাং (Tso Tsung-tang) প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ মাঞ্চু সাম্রাজ্য এবং শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সো সুং-টাং ইয়াকুব বেগের নেতৃত্বে পরিচালিত সিং কিয়াং-এর উইগুর (Uigur) বিদ্রোহ এবং চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদিগের অন্যান্য বিদ্রোহ দমন করিলেন। এই সমস্ত কর্ম্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে বিদেশীয় শত্রুর গ্রাস হইতে চীনকে রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। এই সময়েই চ্যাং সি-টুং (Chang Sbih-tung) চীনের সর্ব্ববৃহৎ ইস্পাতের কারখানা (Hanyehping Steel Works) স্থাপন করেন। সো সুং-টাং ল্যান্‌চোতে (Lanchow) একটি কাপড়ের কল স্থাপন করেন।

"তরুণ চীনদল" (Young China Party) বিশ্বাস করিত যে আমূল সংস্কার ব্যতীত মাঞ্চু সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এই দলের অন্যতম নেতা কাং ইউ-ওয়েই (Kang Yu-wei) ক্রমশঃ সম্রাট

১। "a colony of all nations which had merchant ships to send to China and gun-boats to accompany them."—*The Making of Modern China* by Owen and Eleanor Latimore, p. 117.

"The Open Door did not propose a cessation of imperialistic demands on China ; they merely registered a claim of "me too"......... The practical effect of this arrangement was to halt the process of cutting China up into colonial possessions. There developed, instead, a uniform procedure of presenting joint international demands to the Chinese Government"—Ibid, pp. 121-22

কোয়াংস্থকে (Kuang Hsu) সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন এবং সংস্কারের আদর্শে আস্থাবান্ করিয়া তুলিলেন। ফরমানের পর ফরমান জারি করিয়া বিদ্যুৎগতিতে শাসন-ব্যবস্থার শত বর্ষাধিক কাল সঞ্চিত যাবতীয় গলদ দূর করিবার চেষ্টা চলিতেলাগিল। এই প্রচেষ্টাই ১৮৯৮ সালের সংস্কার-আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলন মাত্র তিনমাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল। সম্রাটের মন্ত্রিগণ শীঘ্রই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সম্রাট সিয়েং ফেং (Hsieng Feng)-এর মাতা জু-সি (Tzu-Hsi)—ইনি Empress Dowager নামে সমধিক পরিচিতা—এই সময় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন কার্য্যে আবার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রভাব এবং প্রচেষ্টায় সংস্কারের বেগ মন্দীভূত হইয়া অবশেষে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সংস্কার আন্দোলনের বহু সমর্থক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। সম্রাট কোয়াংস্থকে জীবনের বাকী ১০ বৎসর কাল বন্দী করিয়া রাখা হইল।

জাতি-মানসের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বহ্নি কিন্তু নির্ব্বাপিত হইলনা। ১৯০০ সালে এই অসন্তোষ বক্সার বিদ্রোহে (Boxer Rebellion) আত্মপ্রকাশ করিল। 'ই-হো' (Yi-ho) নামে একটি গুপ্ত সমিতি এই বিদ্রোহ পরিচালিত করে। 'ই-হো' কথাটির 'ন্যায় এবং ঐক্য সমিতি' এবং 'মুষ্টিযুদ্ধ অনুশীলন সমিতি' এই দুই অর্থই হইতে পারে। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। বিদেশীয়গণকে চীন হইতে বিতাড়িত করিয়া জাতীয় গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এই বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। বক্সারগণ মাঞ্চুদিগকেও বিদেশীয় বলিয়াই মনে করিত। প্রকৃত প্রস্তাবে মাঞ্চুরাজবংশ বিদেশাগতই ছিল।

জু-সির কৌশলে বক্সারগণ তাহাদের মাঞ্চু বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে চীন হইতে বিতাড়িত করিবার

চেষ্টা করিতে লাগিল। মাঞ্চুদরবার বলিতে লাগিল যে বিদেশীয় সয়তান দিগকে (Foreign Devils) বিতাড়িত করিতে না পারিলে চীনের দুঃখ-রজনীর অবসান হইবেনা। কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ক্যাণ্টনের শাসনকর্ত্তা লি হাং-চাং (Li Hung-Chang) এবং নান্‌কিং-এর শাসনকর্ত্তা লিউ কুন্‌-ই (Liu Kun-Yi) প্রথম হইতেই সরকারী নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

পিকিং এবং টিয়েন্‌ট্‌সিন বক্সারগণের হস্তগত হইল। বক্সার বাহিনী কর্ত্তৃক অতঃপর পিকিং-এর বৈদেশিক দূতাবাস অঞ্চল অবরুদ্ধ হইল। আট সপ্তাহকাল অবরোধের পর সম্মিলিত ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, রুশীয়, ইটালীয়, অষ্ট্রিয়, আমেরিকান এবং জাপ বাহিনী পিকিং-এর উদ্ধার সাধন করে। জু-সি ছদ্মবেশে পিকিং হইতে পলায়ন করিয়া সিয়ান্‌ফুতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পলায়নকালে তিনি বন্দী সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলেন নাই। ইহার পর পিকিং লুণ্ঠিত হইল। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ ইত্যাদি কিছুই বাকী রহিল না। বক্সার বিদ্রোহকালে পিকিং-এ সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের আচরণ ইতিহাসের একটি কলঙ্ক-মলিন পৃষ্ঠা।[১]

১৯০১ সালে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বহিরাগত-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকেই চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। পিকিং হইতে টিয়েন্‌ট্‌সিন পর্য্যন্ত যাবতীয় রক্ষণ-ব্যবস্থা—প্রাচীর, দুর্গ ইত্যাদি—ভূমিসাৎ করা হইল। চীন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জকে ৬,৭৫০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য নানাবিধ সুবিধা দিতে সম্মত হইল। বক্সার বিদ্রোহের পর চীনের সার্ব্বভৌমিকতা আরও ক্ষুণ্ণ হইল। রাজধানী পিকিং-এ এবং পিকিং হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত রেলপথের উভয় পার্শ্বে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইল।

১। "It was not a reputable page in the history of either East or West"—*A Short History of Chinese Civilisation* by Tsui Chi, p. 239.

বক্সার বিদ্রোহ দমন করা হইল, কিন্তু যে জাতীয়তাবোধ ইহার মূল কারণ তাহার ধ্বংসসাধন সম্ভব হইল না। রাজদরবারে সংস্কারপন্থীদিগের প্রতিপত্তি দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৯০৩ সালে সরকারী শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হইল। পরীক্ষাগ্রহণের বিধি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হইল। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়া হইল। ১৯০৬ সালে সম্রাটের মন্ত্রী-পরিষদ্ আধুনিক নীতিতে গঠিত হইল। শাসন-ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন কিন্তু হইল না। ফলে জনসাধারণের অসন্তোষ না কমিয়া দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল। সর্ব্বত্র বিপ্লব-বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল।

বক্সার বিদ্রোহ প্রথমদিকে সমভাবে মাঞ্চু এবং অন্যান্য বাহিরাগত-বিরোধী হইলেও পরে মাঞ্চুশাসনের দৃঢ়তা সম্পাদন এবং অন্যান্য বিদেশীয়দিগের বিতাড়ণ ইহার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।[১] বিদ্রোহের পর হইতে মাঞ্চু-শাসনের অবসান ঘটানো বিপ্লবীদিগের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।[২] এই সময় যে সমস্ত ছোট-খাটো গণ-অভ্যুত্থান হয়, সমস্তগুলিকেই কঠোর হস্তে দমন করা হইল।

বক্সার বিদ্রোহের ফলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ চীন সম্পর্কে তাঁহাদের চিরাচরিত নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে চীন যত দুর্ব্বলই হউক্ না কেন সরাসরি চীন জয় করিবার চেষ্টা করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।[৩] এখন হইতে মাঞ্চুসরকারের মধ্যস্থতায় তাঁহারা শোষণকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। জু-সি-ও বিদেশীয়দিগের অনুগত মিত্ররূপে তাঁহাদিগকে সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারই সহায়তায় বক্সার বিদ্রোহের পলায়িত নেতৃবৃন্দকে ধরিয়া

১। "Safeguard the dynasty, exterminate the foreigner."

২। "Drive out the Ching, restore the Ming."

৩। "It taught Western Powers that weak though the country was, it might explode disastrously if they tried to make it an India" —*The Unfinished Revolution in China* by I. Epstein, p. 33.

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ১৯৪৬ সালে জাপান সম্রাট হিরোহিটো (Hirohito)-ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই রকম ভাবে নীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৯০৮ সালে অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে সম্রাট কোয়াংস্থ এবং জু-সির মৃত্যুর পর মাঞ্চুবংশের শেষ সম্রাট স্থয়ান্-টুং (Hsuan-tung) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহায় বয়স তখন ৫ বৎসর।

সংস্কার-আন্দোলন

১৮৯৪-৯৫ সালের প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয় চীন তথা বিশ্বের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। চীন বুঝিল যে ক্ষুদ্র হইলেও আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত কোন রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারী শাসনাধীন যে কোন বৃহত্তর রাষ্ট্র অপেক্ষা শক্তিমান্ হইতে পারে। ফলে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের আমূল সংস্কারের দাবী দিনের পর দিন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

এইভাবে যে সংস্কার-আন্দোলনের সূত্রপাত হইল তাহার নেতৃবৃন্দ সকলেই ছিলেন দক্ষিণচীনের অধিবাসী এবং তাহাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক। ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে বহু চীনদেশীয় শ্রমিক জীবিকার সংস্থানের জন্য বিদেশে যায়। যে সমস্ত শ্রমিক এই সময় পিতৃপুরুষের ভিটার মায়া কাটাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে দক্ষিণচীনের অধিবাসীই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। প্রথম যাহারা বিদেশে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরে টাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ইহারই ফলে সাগরপারে যে সমস্ত চৈনিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলিতে মাঞ্চু-বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রধানতঃ ইহাদেরই মধ্যস্থতায় দক্ষিণচীনে প্রগতিশীল আধুনিক ভাবধারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল।[১]

১। The 'overseas Chinese' settlements were therefore consciously and militantly anti-Manchu...... Subsequent comings and goings

দক্ষিণচীনের ক্যাণ্টন সহরের বহু বৎসর যাবত বাণিজ্যসূত্রে হংকং-এর সহিত প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বৈদেশিকদিগের সহিত মেলামেশার ফলে ক্যাণ্টনবাসীগণ বুঝিতে পারিলেন যে পাশ্চাত্য দেশসমূহের শাসন-ব্যবস্থা চীনের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ঘরের এবং পরের শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্যাণ্টন হইতে যে সমস্ত ছাত্র উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে জাপান, সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন, কি করিয়া গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালিত হয় তাঁহারা তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। টাইপিং বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই আধুনিক চীনের জনক, চীনসাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, সুন্ ইয়াট্-সেন (Sun Yat-sen) দক্ষিণ চীনের কোয়ান্টুং প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতকের শেষভাগেই তিনি তাঁহার বৈপ্লবিক কার্য্যাবলী আরম্ভ করিয়াছিলেন। এদিকে ক্যাণ্টনের অধিবাসী অপর একজন সংস্কারক কাং ইউ-ওয়েই—আমরা পূর্ব্বেই ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছি—প্রচলিত রাষ্ট্রিক কাঠামো বজায় রাখিয়া সংস্কার-প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। সুপণ্ডিত এবং চিন্তাশীল লেখক কাং-এর কন্‌ফ্যুসীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার লিখিত জাপান-সম্রাট মেজি (Meiji) এবং রুশিয়ার জার পিটার দি গ্রেটের (Peter the Great) সংস্কারের ইতিহাস সম্রাট কোয়াংসু-র মনে গভীর রেখাপাত করে। চীনের "নব্য সাহিত্য" আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত লিয়াং চি-চাও (Liang Chi-Chao) কাং-এর শিষ্য এবং সমর্থক ছিলেন।

between men and the homelands implanted new ideas. They began to send back money for Western-style improvements in their old villages and an island of relative modernism grew in South China where the ground had already been broken by the region's long history of international trade.'—*The Unfinished Revolution in China* by I. Epstein, p. 33.

কাং এবং লিয়াং-এর আমুকূল্যে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ইউরোপীয় মনীষীবৃন্দের গ্রন্থাবলী চীনভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। চার্লস ডারউইন (Charles Darwin), হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), জোহানেস মূলার (Johannes Muller), এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), রুসোঁ (Rousseau), ভল্টেয়ার (Voltaire), এবং মণ্টেস্কু্য (Montesquieu)-র রচনাবলী অনূদিত এবং পঠিত হইতে লাগিল। এইভাবে চীনের গণ-মানসে আসন্ন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

চীনসমাজে বিদ্যা এবং বিদ্বানের সমাদর বরাবরই খুব বেশী। বিগত জাপ-যুদ্ধের সময়েও মহাচীনে শিক্ষাবিস্তার একেবারে বন্ধ থাকে নাই। ১৯৪০ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে চুংকিং হইতে সরকারীভাবে ঘোষিত হয় যে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে ৪৬,০০০,০০০ নিরক্ষর ব্যক্তি অক্ষর-জ্ঞান লাভ করিয়াছে। বিদ্যালয়গামী ছাত্র এবং ছাত্রীরা অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাতা এবং পিতাকে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করে। এই কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হয়। একটু বয়স্ক ছাত্রগণ স্ব-স্ব প্রতিবেশীর এবং গ্রামের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এই ভাবে শিক্ষাদান কার্য্যের জন্য কর্ম্মী গড়িয়া তোলা হইতেছে।

দুইটি আন্দোলন যুদ্ধরত মহাচীনের শিক্ষা-প্রগতির বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এই দুইটি আন্দোলনেরই সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। ইহাদের মধ্যে একটি ডাঃ হু সি (Dr. Hu Shih)-র নেতৃত্বে পরিচালিত "সাহিত্যিক পুনরুজ্জীবন (Literary Renaissance) আন্দোলন" কথ্য ভাষাকে (Pai hua) সাহিত্যে ব্যবহার করিয়া সাধারণের বিদ্যার্জ্জনের পথ সুগম করিয়াছে। ইহার ফলে আজ প্রথমশিক্ষার্থী অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রন্থাদি পাঠ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে। অপর আন্দোলনটির নাম দেওয়া যাইতে পারে "সহস্র অক্ষর আন্দোলন" (Thousand Character Movement)। প্রথমশিক্ষার্থী যাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কথ্য

ভাষায় মুদ্রিত সহজ পুস্তক এবং সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে চীনের বর্ণমালার ১,০০০টি অক্ষরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ওয়াই, সি, ইয়েন (Y. C. Yen) এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধকালে জাপান যতই চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিযাছে, চীন ততই পশ্চাদপসবণ কবিয়াছে। ছাত্র এবং অধ্যাপকবৃন্দ শত্রুকবলিত অঞ্চল সমূহ হইতে হাজার হাজার মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া অনধিকৃত অঞ্চলে (Free China) চলিয়া আসিয়াছেন এবং মাটির ঘর, পবিত্যক্ত ধর্ম্মমন্দিব এবং পর্ব্বতগাত্রে খোদিত গুহা ইত্যাদি যেখানে সুবিধা পাইযাছেন সেখানেই অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। যুদ্ধেব যাবতীয় দুর্য্যোগের মধ্যেও চীনের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যুদ্ধকালীন ছাত্র-সংখ্যা যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের শিক্ষার্থীর সংখ্যা অপেক্ষা বেশী বই কম ছিল না। ১৯৩৬ সালে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্ব্বমোট ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৩২,০০০ আর ১৯৪৩ সালে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৪৫,০০০-এ দাঁড়াইয়াছিল।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পডিয়াছি। এইবার অসমাপ্ত আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাক্। ১৮৯৮ সালে সম্রাট কোয়াংসু কাং এবং লিয়াং-কে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের আমূল সংস্কার-প্রস্তাব রচনা করিবার ভার অর্পণ করিলেন। বহু প্রয়োজনীয সংস্কার সাধিতও হইল। ইহাতে সম্রাট সিয়েং-ফেং-এব মাতা জু-সি এবং প্রগতিবিরোধীগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। জু-সি এই সময মাঞ্চুসম্রাটগণেব গ্রীষ্মাবাসে (Summer Palace) বাস করিতেছিলেন। তিনি অভিযোগ করিলেন যে সংস্কারকগণ তাঁহার জীবন নাশের ষডযন্ত্র কবিতেছেন। তিনি আবার চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অবিলম্বে সংস্কারকদিগের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। ছয় জন নেতৃস্থানীয সংস্কারক অল্প কযেকদিনের ব্যবধানে প্রাণ হারাইলেন। সম্রাট গোপনে কাং ইউ-ওয়েইকে সতর্ক করিযা দিলেন। কাং প্রথমতঃ সাংহাইর

আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশে এবং সেখান হইতে হংকং-এ পলায়ন করিলেন। লিয়াং চি-চাও জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। কোযাংস্থ বন্দী হইলেন। জু-সি বলিলেন যে নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিবার জন্য সম্রাটের বিশ্রাম প্রয়োজন।[১] জু-সি স্বহস্তে সাম্রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিযা সংস্কারকদিগের কৃত অনর্থের (!) প্রতিকার করিতে যত্নবতী হইলেন।

চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসের পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা বক্সাব বিদ্রোহের কথা সংক্ষেপে পূর্ব্ব অধ্যায়ে অলোচিত হইয়াছে।

বক্সার বিদ্রোহের পর বৈদেশিকগণের সহিত অপমানজনক সন্ধি, বৈদেশিকগণের সহিত যুদ্ধে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর চরম অযোগ্যতাব প্রমাণ, সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা এবং শোষণকারী বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জেব সহিত মাঞ্চুদরবারের সহযোগিতা প্রভৃতিব ফলে জনসাধারণের উদ্যত রোষ অত্যাচারী এবং অযোগ্য শাসকদিগের উপর পতিত হইল। বহিরাগত-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়া জাতি পূর্ব্বেই স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আবাব তাহার নূতন করিযা মনে পডিয়া গেল যে মাঞ্চুরাজবংশও চীনদেশীয নহে। সুতরাং যে ভাবেই হউক্‌, ইহাব উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে।

বিপ্লবের সমর্থক পুস্তক, পুস্তিকা এবং সাময়িকে দেশ ছাইয়া গেল। দিনের পর দিন ইহাদিগের পাঠক-সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রধানতঃ ম্যাকাও, হংকং এবং সাংহাই হইতে এই জাতীয সাহিত্য প্রকাশিত হইত। এই সমস্ত স্থানগুলি মাঞ্চুশাসনাধীন ছিল না। সুতরাং মাঞ্চুসরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও বিপ্লবী সাহিত্যের প্রকাশ এবং প্রচার বন্ধ হইল না। এই সমস্ত সাহিত্য মাঞ্চু শাসন-ব্যবস্থার নিরপেক্ষ, কঠোর সমালোচনা করিতে ইতস্ততঃ করিত না। এইভাবে মাঞ্চুবিরোধী সাহিত্যের মধ্যস্থতায ক্রমশঃ ডাঃ সুন্‌ ইয়াট্‌-সেনের বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল।

১। "He needs a little rest to recover from his indisposition."

সংবাদপত্র এবং সাময়িক সাহিত্য

অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রাচীন যুগে চীনেও সংবাদপত্রের অস্তিত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও চীনে কোন বে-সরকারী সংবাদপত্র ছিলনা। চীনের সংবাদপত্র আজও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। সংবাদসংগ্রহ ও পরিবেষণ এবং সম্পাদনার দিক হইতে ইউরোপ এবং আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহের সহিত ইহার কোন তুলনাই চলেনা। কিন্তু এই অপরিণত অবস্থাতেই অন্যান্য দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রের মত চীনের সংবাদপত্রসমূহও কলুষিত এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জনমতগঠন এবং সুগঠিত জনমতের প্রকাশ সংবাদপত্রের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু বিত্তবানের উৎকোচে বশীভূত এবং শক্তিমানের ভ্রূভঙ্গীতে বিচলিত হইয়া মহাচীনের অধিকাংশ সংবাদপত্র আজ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক অর্থে সংবাদপত্রের প্রচলন অল্পদিনের কথা হইলেও খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দীতে হান্ বংশের রাজত্বকালে চীনে সরকারী সংবাদপত্র প্রচলিত থাকিবার কথা জানা যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে টাং বংশীয় সম্রাট মিংহুয়াং (Minghuang)-এর রাজত্বকাল হইতে নিয়মিতভাবে সরকারী 'গেজেট' প্রকাশিত হইলেও মাঞ্চুযুগ পর্য্যন্ত ইহার প্রচার প্রধানতঃ সরকারী মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই 'গেজেট' বিদ্বৎসমাজেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। মিং এবং চিং বংশীয় রাজগণের সময়েও এই জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই 'গেজেট'কে কোন ক্রমেই আধুনিক সংবাদপত্রের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। ইহাতে প্রকৃত জনমত অভিব্যক্ত হইতনা। এই যুগে জনমতের অভিব্যক্তির কোন বাহন ছিলনা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও সরকারের অনুসৃত নীতি এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সমালোচনা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নহে।

তবে এই সমালোচনা কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অর্ব্বাচীন হান্ (Later Han) যুগে সরকারী নীতি কার্য্যকলাপের সমালোচনা অত্যন্ত সক্রিয় এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমালোচনা প্রকৃতপ্রস্তাবে দুর্নীতি এবং দুর্নীতির পরিপোষক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মহাচীনের বিদ্বৎ-সমাজের অভিযান। ইহারই ফলে চীনের ছাত্র-আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে সুং এবং মিং যুগে সঙ্ঘবদ্ধ ছাত্র-শক্তি মহাচীনের যাবতীয় প্রগতিশীল কর্ম্মপ্রচেষ্টায় একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মহাচীনের ছাত্রসমাজ আজ পর্য্যন্ত এই ঐতিহ্য বিস্মৃত হয় নাই। অর্ব্বাচীন হান্‌যুগে ছাত্র-আন্দোলন দমন করিবার জন্য সরকারী আদেশে কয়েক শত বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক ছাত্র কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সরকারের অকর্ম্মণ্যতায় বিক্ষুব্ধ মহাচীনের ছাত্র-সমাজ আবার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে চীনে সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। মুখ্যতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের চেষ্টা এবং যত্নে চীনে সংবাদপত্রের উন্নতি সাধিত হয়। ইহারা নিজেদের প্রচারের মাধ্যম হিসাবে সংবাদ-পত্রের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সংবাদ এবং সাময়িক পত্র প্রকাশের পক্ষে অপরিহার্য্য ছাপাখানা ইত্যাদির সুবিধাও ইঁহাদিগের যথেষ্টই ছিল। মরিসন (Morison), মেড্‌হার্ষ্ট (Medhurst), ইয়ং জে, এ্যালেন (Young J. Allen), টিমোথি রিচার্ড (Timothy Richard) প্রমুখ খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ মনে করিতেন যে মহাচীনে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার জনপ্রিয়তা সম্পাদন এবং এই বিরাট উপ-মহাদেশে গণ-চেতনার উদ্বোধন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। ইহাদিগের প্রচারিত ভাবধারাই যে মহাচীনের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটাইয়া নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে।

খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ প্রথমতঃ মাসিক এবং পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনের প্রথম দৈনিকপত্র আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৯৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীন হইতে মাত্র সাত খানা দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইত। পরবর্ত্তীকালে এই সংখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল :—

সন	প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা
১৮৯৫	১৯ খানা
১৯০৩	৬৫ "
১৯০৭	১২৩ "
১৯১০	২৫০ "
১৯১২	৫০০ "
১৯২১	৫৫০ "
১৯২৬	৬২৮ "
১৯৩৫	৯১০ "

১৯৩৫ সালের পরবর্ত্তীকালের হিসাব পাওয়া না গেলেও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আজ চীন হইতে প্রকাশিত দৈনিকের সংখ্যা খুব কম করিয়া ধরিলেও এক হাজারের কম নহে। অনেক বেশী হওয়াই সম্ভব। সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যাও নগণ্য নহে। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রতি ১০,০০০ চীনবাসীর মধ্যে ৫০০ জন অর্থাৎ প্রতি শতে পাঁচ জন সংবাদপত্র পাঠ করিতেন।

চীনের সংবাদপত্র এবং সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

১।	আধুনিক সংবাদপত্রের সূচনা	১৮১৫—৯৫
২।	প্রাক্-বিপ্লব যুগ	১৮৯৫—১৯১১
৩।	বিপ্লবোত্তর যুগ	১৯১২—

মহাচীনের সংবাদপত্র এবং সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উইলিয়ম মিল্‌নে (William Milne), রবার্ট মরিসন (Robert Morrison), ফ্রায়েড্‌রিস অগাষ্ট গুট্‌জ্‌লাফ্‌ (Friedrich August Gutzlaff), জেমস লেগ (James Legge), ওয়াল্টার হেনরি মেড্‌হার্ষ্ট (Walter Henry Medhurst) এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে চার্লস ব্যাটেন হিলিয়ের (Charles Batten Hillier), আলেকজাণ্ডার ওযাইলি (Alexander Wylie), জোসেফ এড্‌কিনস (Joseph Edkins), টিমোথি রিচার্ড (Timothy Richard) এবং সর্ব্বোপরি ইয়ং জে, এ্যালেনের (Young J. Allen) ন্যায় চীন-তাত্ত্বিকগণের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভাগ্যগুণে চীনদেশীয় সহযোগীর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। এই সহযোগীদিগের মধ্যে মরিসনের সহযোগী লিয়াং আ-ফা (Liang A-fa), লেগের সহযোগী ওয়াঙ্‌ টাও (Wang Tao) এবং এ্যালেনের সহযোগী সাই এর্‌হ্‌ কাং (Tsai Erh-K'ang)-এর নাম করা যাইতে পারে।

ওযাং টাওকে চীনের বার্ত্তাবিদ্‌গণের আদিগুরু বলা যাইতে পারে। তিনি অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ১৮৬০ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে উ-টিং ফ্যাং (Wu Ting-fang), ইউং উইং (Yung Wing) প্রভৃতি বিদেশ-প্রত্যাগত ছাত্রগণের পরিচালনায় চীনে কয়েকখানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে লিন্‌ সে-সু (Lin Tsheh- hsu)-র মনোযোগ সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য সাময়িক পত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি এবং তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারী ওয়েই ইউয়ান্‌ (Wei Yuan) চীনের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং দৃষ্টিকোণ প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সাময়িক পত্রিকাসমূহ চীনভাষায় অনুবাদ করিবার পরামর্শ দিলেন। ১৮৭২ সালে চীনের বিখ্যাত দৈনিক সুন্‌ পাও (Shun Pao) প্রকাশিত

হয়। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র সিন্ ওয়ান্ পাও (Sin Wan Pao) ১৮৯৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৯৪-৯৫ সালে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের ভাগ্যবিপর্যায় মহাচীনের সর্ব্বাঙ্গীণ জাগরণের সূচনা করে। এই যুদ্ধের পর হইতে চীনে বহু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ কবিল। ইহারা প্রত্যেকেই সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কারের দাবী করিতে লাগিল।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে চীনের সংবাদপত্র এবং সামযিক সাহিত্য এক নবযুগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯১১ সালের যে বিপ্লব মাঞ্চুরাজবংশেব অবসান ঘটাইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ চীনের সংবাদ এবং সামযিক পত্রসমূহের আন্দোলনের ফল। বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও এই সমস্ত পত্রিকার পরিচালক এবং লেখকগণ নির্ভীক ভাবে লেখনী পরিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন্ নাই।

১৮৯৫ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত যে যুগ তাহাকে চীনের সংবাদ-পত্রের ইতিহাসের সুবর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রের যুগে চীনে সংবাদপত্রের প্রচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ অপেক্ষা বহু গুণ বাডিয়া গিযাছে এবং সর্ব্ববিষয়েই সংবাদপত্রেব উন্নতি সাধিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও আধুনিক চীনের সংবাদপত্রের সহিত প্রাক্-সাধারণতন্ত্র যুগের সংবাদপত্রের কোন তুলনা হয না। বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদপত্রের উন্নতি হইয়াছে সত্য; কিন্তু অতিশয মন্থর গতিতে এই উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রগতিবিরোধী ইউযান্ সি-কাই (Yuan Shi Kai)-র শাসন এবং দ্বিতীয়তঃ ১৯২৭ সাল হইতে আবম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত চীন যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া চলিযাছে, তাহাই ইহার জন্য দায়ী।

চীনভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক 'চাইনিজ মান্থলি ম্যাগাজিন' (Chinese Monthly Magazine) ১৯১৫ সালের ৬ই আগষ্ট উইলিযাম মিল্‌নে কর্ত্তৃক মালক্কা হইতে প্রকাশিত হয়। রবার্ট মবিসন এবং লিয়াং আ-ফা

এই কার্য্যে তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮৩৩ সালে ক্যাণ্টন হইতে চীনের প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। উ টিং-ফ্যাং-এর উৎসাহে ১৮৫৮ সালে সর্ব্বপ্রথম চীনে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয। এই পত্রিকাখানি ইংরেজী 'চায়না মেল' (China Mail)-এর চৈনিক ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণ মাত্র ছিল। প্রথম প্রথম সাময়িক পত্রিকা সমূহের কোন গ্রাহক ছিল না বলিলেও চলে। "চাইনিজ মান্থলি ম্যাগাজিনের" গ্রাহক-সংখ্যা অবশ্য কালে ২,০০০-এ দাঁড়াইয়াছিল। সে যুগে ইহাই অত্যন্ত সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। দক্ষিণ চীন এবং শ্যাম, আনাম ও মালয় প্রবাসী চীনদেশীয় বণিক্‌গণের মধ্যেই ইহার পাঠক-গোষ্ঠি সীমাবদ্ধ ছিল। যে সমস্ত খ্রীষ্টীয় প্রচারক চীনে সংবাদ এবং সাময়িক পত্রের প্রকাশ ও উন্নতি কল্পে স্ব-স্ব শক্তি এবং অবসর নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই চীনের প্রাচীন ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে জেমস লেগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনের সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়াল্টার হেনরি মেড্‌হার্ষ্টের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। ১৮৬৪ হইতে ১৯০৪ সালের মধ্যে ইয়ং জে, এ্যালেন চীনের অধিবাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মহাচীনের দৃষ্টিভঙ্গীর আধুনিকতা সম্পাদনের জন্য সাময়িক সাহিত্যের সহায়তা অপরিহার্য্য।

১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে চীনে যে সমস্ত দৈনিক প্রকাশিত হয়, সেগুলি বিভিন্ন বৈদেশিক দৈনিকের চৈনিক সংস্করণ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আধুনিক চীনের দুইখানি প্রধান সংবাদপত্র বৈদেশিকগণের পরিচালনায় সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অর্থকরী বৃত্তিরূপেও বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক এবং বণিক্‌গণই সর্ব্বপ্রথম চীনে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭০ সাল হইতে চীনদেশীয়গণ ইঁহাদের

দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে থাকেন। এই যুগেই চীনের সংবাদপত্রসেবীগণের অগ্রদূত ওয়াং টাও (Wang Tao) 'স্বন্ ওয়ান্ ইযাট্ পো' (Tsun Wan Yat Po) নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই কাগজখানা আজও চলিতেছে। খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ যেমন চীনে সাময়িক পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রদূত ছিলেন, তেমনই বিদেশ-প্রত্যাগত চীনদেশীয় ছাত্র এবং প্রগতিশীল সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ দৈনিক পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শকের কাজ করিযাছেন। চীনের প্রথম বিদেশ-প্রত্যাগত ছাত্র ইউং উইং (Yung Wing) ১৮৭৪ সালের ৩রা মে সাংহাই হইতে 'হুয়েই পাও' (Huei Pao) নামক দৈনিক প্রকাশ করেন। সর্ব্বপ্রথম যে সমস্ত চীনদেশীয় ছাত্র বিদ্যা-র্জ্জনের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন উ টিং ফ্যাং তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অপর একজন বিদেশ-প্রত্যাগত ছাত্র কোযাং চিচাও (Kwang Chichaow) ১৮৬৬ সালের২ ংশে মে 'কোযাং পাও' (Kwang Pao) নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

এই যুগের সংবাদপত্রসমূহ একান্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল। সাংবাদিকগণের কোন সামাজিক মর্য্যাদা ছিল না বলিলেই চলে। চীনের জনৈক রাজপ্রতিনিধি সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে 'কিযাংসু এবং চেকিয়াং-এর সাহিত্য-জগতের অকর্ম্মণ্য কুঁড়ের বাদ্শাবদল" ("literary loafers of Kiangsu and Chekiang) আখ্যায অভিহিত করিয়াছিলেন। জনমতও সংবাদপত্রসেবীগণের প্রতি সশ্রদ্ধ বা তাঁহাদিগের অনুকূল ছিলনা। পরে লিয়াং চি-চাও—ইঁহাকে Prince of Chinese journalists অর্থাৎ চীনের সংবাদপত্রসেবীদিগের মুকুটমণি বলা হয—যখন সাময়িক পত্রে রাজ-নৈতিক সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে চীনের সংবাদ-পত্রসেবীদিগের সাহিত্যিক এবং সামাজিক মর্য্যাদা স্বীকৃত হইতে থাকে।

এই যুগের কোন সংবাদপত্রেরই কাট্তি কয়েক শতের অধিক ছিল না। কোন সংখ্যাতেই দুই পৃষ্ঠায় বেশী কাগজ থাকিত না। সুতরাং সংবাদপত্র

পরিচালনার কার্য্য মোটেই কঠিন ছিল না। এই সমস্ত পত্রিকায় নানাবিধ টুকিটাকি খবর ব্যতীত উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদই প্রায় প্রকাশিত হইত না। বাজারদর, সমুদ্রগামী জাহাজ ছাড়িবার সময়, রঙ্গমঞ্চের বিজ্ঞাপন ইত্যাদিও থাকিত। অর্থের দিক্ হইতে লাভবান্ হওয়া পত্রিকা পরিচালনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহার কারণও সহজেই বোঝা যায়। সমসাময়িক চীনসমাজ বিশ্ব-সমস্যাসমূহের প্রতি একান্তই উদাসীন ছিল। রাজনীতিতেও ইহার কোন সক্রিয় অনুরাগ ছিল না।[১]

১৮৯৪-৯৫ সালে চীন জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয় দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগের সূচনা করিল। এই যুগের সংবাদপত্রসেবী দেশাত্মবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহাচীনের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই যুগকে স্বর্ণযুগ আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া, রাজরোষ উপেক্ষা করিয়া এবং লাভের প্রত্যাশা না করিয়া এই যুগের সংবাদ এবং সাময়িক

১। "The papers of those days contained chiefly tit-bits of social gossip of no real importance. Not only were they unable to report on the important affairs and plans of the nation, but they were afraid to publish them even if they had access to such reports. The result was that the news material was chiefly of the vaguest and trivial sort.......there were reports about market prices, boat-sailings theatre programmes, which were all advertisements, serving as a guide to amusements for travellers......In one word, the newspapers of those days were published with the one aim of making money, while the editors tried to do as little as they could. The general reason was that Chinese society of those days, both high and low, did not possess a world outlook, nor did they take an intelligent interest in politics, but regarded the daily paper only as an enterprise of the foreign firms having little to do with ourselves."—*The Golden Jubilee Memorial Volume of the Shun Pao* (Published in 1922).

পত্রসমূহ জনমত গঠনকল্পে দেশময় যে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছিল, তাহারই ফলে পরিণামে মাঞ্চুরাজবংশের পতন ঘটিয়াছিল। এই সমস্ত পত্রিকা যুগোপযোগী ভাবধারা প্রচারের এবং সমসাময়িক জনমতের অভিব্যক্তির প্রধান এবং একমাত্র বাহন ছিল। এই ভাবধারার চারিটি বিভিন্ন দিক্ ছিল। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক সংস্কারের দাবী, সরকারী আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিপরায়ণতার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আদর্শের জনপ্রিয়তা সম্পাদন। কাং ইউ-ওয়েই এবং লিয়াং চি-চাও-র লেখায় এই সমস্ত উদ্দেশ্যের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশাগত মাঞ্চুরাজবংশের উপর তীব্র আক্রমণ। ইহার প্রধান সমর্থক সুন্ ইয়াট-সেন, চ্যাং টায়েন (Chang Tayen) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মনে করিতেন যে মাঞ্চুরাজবংশের বিতাড়ণই জাতির মুক্তির একমাত্র উপায়। তৃতীয়তঃ, ইয়েন্ ফু (Yen Fu)-র নেতৃত্বে প্রগতিশীল ভাবধারার প্রচার এবং প্রসার। ইয়েন্ ফু এবং তাঁহার সমর্থকগণ বলিতেন যে চীনের দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা সম্পাদন এবং প্রতীচ্য ভাবধারায় জাতি-মানসকে নিষিক্ত করিতে না পারিলে চীনের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। চতুর্থতঃ, মহাচীনের প্রাচীন সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন। ইহার সমর্থনকারীদিগের মধ্যে চ্যাং-টায়েন এবং লিউ সিপেই (Liu Shihpei)-র নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমুদয় বিভিন্ন চিন্তাস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে চীনের সাহিত্যিক সমাজের জাতীয় এবং রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। এই চেতনা যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে তাহাই মাঞ্চুসাম্রাজ্যসৌধকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে—'মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে হ'ল তার সীমা'।[১] সরকারী কর্ম্মচারী এবং লব্ধ-

(১) "In the play and counter-play of these currents, literary China was awakened to a national and political consciousness and its enthusiasm kindled into a glowing flame that consumed the Manchu Empire."—*A History of the Press and Public Opinion in China* by Lin Yutang, P. 94

প্রতিষ্ঠ লেখকগণও এই সময় লোকশিক্ষার জন্ম সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং এই প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইউয়ান্ সি-কাই, চ্যাং চি টুং, স্থন্ ইয়াট-সেন, কাং ইউ ওয়েই, লিয়াং চি চাও, স্থন্ চিয়ানাই, ওয়েন্ টিংসি, চেন্ চুন্‌হুয়ান্, চ্যাং টাইইউ, সাই ইউয়ান্ পেই, উচি হুয়েই প্রমুখ রাজকর্ম্মচারী, সংস্কারক এবং মনীষীবৃন্দ মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতিকল্পে স্ব-স্ব শক্তি নিযোগ করিলেন। ইঁহারা বহু দৈনিক এবং সাময়িকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

চীনের বার্ত্তাবিস্তার ইতিহাসে লিযাং চি চাও-র নাম চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। ১৯১১ সালের প্রথম চীন-বিপ্লব প্রধানতঃ ইঁহারই লেখনী-নিঃসৃত প্রবন্ধসমূহের ফল। পাশ্চাত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি লিয়াং-এর অপবিসীম অনুরাগ ছিল। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আদর্শ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ১৯০৮ সালে জু-সি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম পুরস্কার ঘোষণা করিলে তিনি জাপানে পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে 'পিউর ক্রিটিসিস্‌ম্ পিরিয়ডিক্যাল' (Pure Criticism Periodical) নামক একখানি সাময়িক প্রকাশ করিতে থাকেন। প্রতি দশদিন অন্তর প্রকাশিত এই সামযিকখানি তিন বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। মাঞ্চুসরকারের আদেশে চীনদেশে ইহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইযাছিল। সম্রাটের ১৯০০ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের একটি ফরমানের বলে কাং ইউ-ওয়েই এবং লিয়াং চি চাও-র লেখার চীনদেশে প্রবেশ নিসিদ্ধ হইয়া যায়। লিয়াং একাধিক সাময়িক প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে নিঃসন্দেহে আধুনিক চীনের অন্যতম প্রধান লেখক বলা চলে। ইয়েন্‌ফু চীনের সাময়িক সাহিত্যের আর একজন দিক্‌পাল। তিনি এ্যাডাম স্মিথ, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলী চীন-

ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৯৭ সালে টিয়েন্‌ট্‌সিন হইতে প্রকাশিত "ক্যুওওয়েন্ পাও' (Kuowen Pao) নামক একখানি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পত্রিকাখানি বেশী দিন চলে নাই। এই সময় প্রকাশিত চীনের যাবতীয় সংবাদপত্র এবং সামযিক স্বদেশ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। রাজশক্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই যুগে সংবাদপত্র এবং সামযিক সাহিত্যেব প্রচার পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইযাছিল। এই যুগের সাময়িকসমূহ পাশ্চাত্য ভাবধারার সহায়তায় মহাচীনের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইযাছিল। চীনভাষায় প্রকাশিত এই যুগের সাময়িকসমূহের মধ্যে 'উসি পাইহুয়াপাও' (Wusih Paibuapao) এবং 'ক্যুওট্‌সুই স্যুয়ে পাও' (Kuotsui Hsueh Pao)-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনের প্রথম মহিলা সাংবাদিক কুমাবী চিউ ইউফ্যাং (Miss Chiu Yufang) ১৮৯৮ সালে প্রথমোক্ত পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়খানি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। ১৯১২ সালে সাধাবণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবাব পূর্ব্বে এই সমস্ত সাময়িক মহাচীনেব চিন্তাজগতে বৈপ্লবিক জাগরণ ঘটাইয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। 'সু পাও' (Su Pao), 'ফু পাও' (Fu Pao), 'মিন্ পাও' (Min Pao), 'মিন্‌হু পাও' (Minhu Pao) এবং 'মিন্‌লি পাও' (Minli Pao) প্রভৃতি পত্রিকাগুলি প্রত্যক্ষভাবেই মাঞ্চু-বিরোধী আন্দোলন পবিচালনা করিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে 'সু পাও' সমধিক বিখ্যাত। এই সময় স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত দেশপ্রেমিক সংস্কার-আন্দোলনকারিগণের উদ্যোগে জাপান হইতে সংস্কারের সমর্থক বহু সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইত। দিনের পর দিন এই সমস্ত সাময়িকের প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য সরকার চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা এবং পুস্তিকার উপর নিষেধাজ্ঞার

পর নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে লাগিলেন। ১৯০০ সালে পিকিং সরকার আদেশ দিলেন যে কোন ছাত্র সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে, কাগজের সম্পাদক অথবা সংবাদদাতার কার্য্য করিতে কিংবা বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে বিপ্লব-সমর্থক কোন পুস্তক, পুস্তিকা, পত্রিকা ইত্যাদি ক্রয় করিতে অথবা আনয়ন করিতে পারিবে না। অন্তঃসারবিহীন, ক্লীব মাঞ্চুসরকারের অন্যান্য বহু আদেশের মত এই আদেশও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

১৯০৪ সালে টি চুচিং (Ti Chuching) কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সি পাও' (Shih Pao or Eastern Times) নামক দৈনিকখানিকে চীনের সংবাদপত্রজগতে আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৮৯৫ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ষোল বৎসর কাল চীনের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। পরবর্ত্তীকালে ১৯১৫-২৫ সাল এই দশকের কথা ছাড়িয়া দিলে নিরপেক্ষ সংবাদ-পরিবেষক এবং জনমতের অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসাবে চীনের সংবাদপত্রসমূহের গুরুতর অবনতি ঘটিয়াছে। মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং প্রচারের দিক্ হইতে অবশ্য উন্নতিই হইয়াছে। ১৯১৫ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল চীনের সংবাদপত্রসমূহ প্রাক্-বিপ্লব যুগের আদর্শে জনমত গঠন এবং প্রচাব করিতে সহায়তা করিয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালের দ্বিতীয় চীন-বিপ্লবেব ক্ষেত্র প্রস্তুতিব কার্য্যে সংবাদ-পত্রের দান কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিবার মত নহে।

১৯১২ সালে যখন চীনসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চীন হইতে ৫০০-এরও অধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ইহার এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ১০০খানা পিকিং হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার পর ইউয়ান্-সি কাই যখন রাজতন্ত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন, তখন এই ৫০০ সংবাদপত্রের প্রায সব কয়খানাই বন্ধ হইয়া যায়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করিবার অজুহাত এই যুগে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার একটি প্রধান অস্ত্র ছিল।

প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজশক্তি সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বযুগে এই অস্ত্রের সহায়তায় প্রতিকূল সমালোচনা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। দুর্য্যোধনও বলিয়াছিলেন, "নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি"। কিন্তু পারিয়াছিলেন কি ?

এই দুর্য্যোগের মধ্যে ১৯১৭ সালে চীনের সাহিত্য-জগতে এক বিরাট বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া এই বিপ্লব মহাচীনের রাজনৈতিক জীবনেও ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহারই ফলে তরুণচীন স্বদেশের রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবিতে উৎসাহিত হইয়াছিল। এই সময় আবার বহু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং সাহিত্যের প্রচার চীনেব সাময়িক সাহিত্যকে নবজীবন দান করিযা সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের সূচনা করিল। "৪ঠা মে'র ছাত্র-আন্দোলন" (May 4th Movement—1919) এবং "৩০শে মে'র গণ-অভ্যুত্থান" (May 30th Movement) এই যুগের দুইটি স্মরণীয় ঘটনা।

১৯২৫ সালের মে মাসে সাংহাইতে একটি জাপানী সূতার কলের শ্রমিক নেতা কু চেংহুং (Ku Chenghung) কলের জাপ কায্যাধ্যক্ষের গুলিতে নিহত হ'ন। এই হত্যার প্রতিবাদে সাংহাইর রাজপথে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদিগের মধ্যে কযেকজনকে ইংরেজ পুলিশ গুলি করিয়া হত্যা করে। চীনের জনমত এই সময যেমন সুগঠিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে বা পরে তেমন আর কোনদিনই হয নাই। সাংহাইতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদিগের উপর গুলিবর্ষণের সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেশময় জাপানী এবং বিলাতি পণ্য বর্জ্জনের জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। ১৯২৬-২৭ সালের মহাবিপ্লব এই আন্দোলনেরই পরিণতি। চীনের সংবাদ-পত্র, ছাত্রসমাজ, বণিক্‌সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ

গ্রহণ করিয়াছিল। ক্যুওমিনটাং এবং সাম্যবাদী দল এই সময় পরস্পরের সহযোগিতা করিতেছিল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সুন্ ইয়াট-সেনের জীবনান্ত হইয়াছিল (মার্চ্চ, ১৯২৪)। তিনি তাঁহার চরমপত্রে বলিয়া গিয়াছেন যে গণ-জাগরণ ব্যতীত চীনের মুক্তির কোন আশাই নাই। কেবল চীন নহে, সমস্ত পর-পদানত এবং পর-শোষিত দেশ সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। তখন এই সত্য উপলব্ধি করিলেও পরবর্ত্তী কালে ক্যুওমিনটাং দল ইহা বিস্মৃত হইয়াছে।[১]

ইহার পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে আধুনিক ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করিবার চেষ্টা করা হইতেছিল। ১৯১৮-১৯ সালে চীনের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত কথ্য ভাষাতে চারি শতেরও অধিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইত। এই সমস্ত পত্রে সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক এই উভয়বিধ প্রসঙ্গই আলোচিত হইত। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদিগের অনুকরণে লিখিত ছোট গল্প, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতা এবং নাটক এই সমস্ত সাময়িকে প্রকাশিত হইত। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইত। এই সময় চীনের প্রাচীন গৌরব, তাহার দর্শন, ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা আরম্ভ হয়। যে সমস্ত সাময়িক পত্র এই জাতীয় আলোচনার উপর বিশেষ জোর দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিচালিত 'সিনোলজিক্যাল কোয়ার্টারলি' (Sinological Quarterly) এবং ডাঃ হু সি পরিচালিত সাপ্তাহিক 'এণ্ডেভার'(Endeavour)-এর মাসিক সংস্করণের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

১। "* * * entirely forgotten by the people who today mumble these words ("awakening the masses") in their prayers and acknowledge verbal allegiance to the great deceased leader" —*A History of the Press and Public Opinion in China* by Lin Yutang, P. 123.

১৯১৯ সালের "৪ঠা মে'র ছাত্র-আন্দোলন' এই সংস্কৃতি-আন্দোলনের প্রথম ফল। সাধারণতন্ত্র-শাসিত চীনের ছাত্রসম্প্রদায় এই সর্ব্বপ্রথম রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল।

১৯১২ সালে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চীনে সংবাদপত্রের সংখ্যা এবং প্রচার পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইযাছে। ১৯২১ সালে চীন হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার পত্রিকার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১।	দৈনিক	৫৫০ খানা	৭।	পাক্ষিক	৫৪ খানা
২।	২দিন অন্তর প্রকাশিত	৬ ”	৮।	মাসিক	৩০৩ ”
৩।	৫ ” ”	৯ ”	৯।	ত্রৈমাসিক	৪ ”
৪।	১০ ” ”	৪৬ ”	১০।	ষাণ্মাসিক	১ ”
৫।	অৰ্দ্ধ-সাপ্তাহিক	৯ ”	১১।	বার্ষিক	১ ”
৬।	সাপ্তাহিক	১৫৪ ”			

মোট ১১৩৭ খানা

—*Proceedings of the Second World Press Conference.*

১৮৮৬ সালে চীন হইতে সর্ব্বমোট ৭৮ খানি সংবাদপত্র এবং সাময়িক প্রকাশিত হইত। সুতবাং দেখা যাইতেছে যে ৩৫ বৎসবে ইহাদিগেব সংখ্যা ১৪ গুণেরও বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৯২৬ সালে চীন হইতে দেশীয় ভাষায় ৬২৮ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ঐ বৎসর চীন হইতে প্রকাশিত ইংরেজী, জাপানী, রুশীয়, ফবাসী এবং কোরীয ভাষাব দৈনিকেব সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬, ১৬, ৬, ৩ এবং ১ খানা। হিসাব করিযা দেখা গিয়াছে যে ঐ বৎসর চীন হইতে প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, সরকারী বুলেটিন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রেব সর্ব্বমোট সংখ্যা ২,০০০-এর কাছাকাছি ছিল।

বিপ্লবোত্তর যুগে যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকা তরুণচীনের মনে গভীর বেখাপাত করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে লিয়াং চি চাও-সম্পাদিত 'ইউংইয়েন'

(Yung Yen), 'ক্যুওফেংপাও' (Kuofengpao), এবং 'টাচুংহুয়া' (Tachunghua), কাং ইউ-ওয়েই-সম্পাদিত 'পুজেন্' (Pujen), চুং সিং-ইয়েন (Chung Shingyen)-সম্পাদিত 'চিয়াইন্' (Chiayin), পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক পরিচালিত 'দি রেনেসাঁ' (The Renaissance) এবং ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেনের সম্পাদকতায় প্রকাশিত 'ক্যুওমিন্' (Kuomin) ও 'দি রিকনস্ট্রাকসন' (The Reconstruction)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের প্রভাবশালী অন্যান্য সাময়িকের মধ্যে 'মিন্টু '(Mintu) এবং 'লা জেনেসি' (La Jennesse)-র কথাও মনে রাখিতে হইবে।

১৯২৭ সালে নান্‌কিং-সরকারের প্রতিষ্ঠা চীনের সাহিত্যজগতে এক নব-যুগের প্রবর্ত্তন করে। ১৯২৭ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাম্যবাদী চিন্তাধারা এবং সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়। এই সময় সাম্যবাদী আদর্শের সমর্থক বহু সাময়িকও প্রকাশিত হইতে থাকে। রুশীয় ভাষা হইতে বহু গ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত হইল। প্রথম প্রথম নান্‌কিং-সরকার ইহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। সাম্যবাদী সাময়িকগুলির প্রচারিত আদর্শ এবং ভাবধারায় তরুণচীন ধীরে ধীরে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত সরকারের টনক নড়িল।

সরকারী দমননীতির জন্য সাম্যবাদী সাময়িকগুলির মধ্যে কোনখানাই দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই। এই সমস্ত সাময়িকের নামগুলি বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল—'হারিকেন' (Hurricane) অর্থাৎ ঘূর্ণিবাত্যা, 'ডেসার্ট' (Desert) অর্থাৎ মরুভূমি, 'এডি' (Eddy) অর্থাৎ আবর্ত্ত, 'দি মাসেস্' (The Masses) অর্থাৎ জনগণ, 'দি ষ্টর্ম পেট্রেল' (The Storm Petrel) অর্থাৎ ঝড়ের অগ্রদূত, ইত্যাদি। ১৯৩২ সাল হইতেই সরকারী প্রতিকূলতার জন্য ইহাদিগের প্রচার বহুলাংশে হ্রাস পাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী অনুগ্রহ-পুষ্ট বিবিধ পত্র এবং পত্রিকার

আবির্ভাব ঘটে। এই শেষোক্তগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রগতিবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী।

অন্যান্য দেশের মত চীনেও প্রগতিশীল এবং প্রগতিবিরোধী উভয় প্রকার সংবাদপত্রই রহিয়াছে। ১৯৩৭ সালে যখন দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন 'লা ইম্পার্সিয়াল' (L' Impartial or Ta Kung Pao) চীনের প্রগতিপন্থী পত্রিকাগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। সম্পাদনার দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহা তৎকালীন যে কোন চীনদেশীয় পত্রিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সময়কাব প্রগতিবিরোধী রক্ষণশীল পত্রিকাগুলির মধ্যে 'স্থন্ পাও' (Shun Pao) এবং 'সিন্ ওয়ান্ পাও' (Sin Wan Pao)-র নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শেষোক্ত পত্রিকা দুইখানির সম্পাদনা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তথাপি দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের প্রাক্কালে ইহাদিগের গ্রাহক-সংখ্যা চীনের অন্য যে কোন পত্রিকা অপেক্ষা অধিক ছিল। সেই সময় ইহাদের প্রত্যেকের দৈনিক প্রচার-সংখ্যা ন্যূনাধিক ১০০,০০০ ছিল। বিখ্যাত গ্রন্থকার লিন্ ইউটাং (Lin Yutang) বলেন যে চীনের জনপ্রিয় দৈনিকগুলির সম্পাদনা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহারা সংবাদ অপেক্ষা বিজ্ঞাপনকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সুসম্পাদিত দৈনিকগুলির পাঠক-সংখ্যা একান্তই সীমাবদ্ধ।[১] ১৯২৭ সালেপ্রকাশিত 'হিষ্টরি অব্ চাইনিজ জার্নালিস্‌ম্' (History of Chinese Journalism)-এর বিখ্যাত গ্রন্থকার কো কুং চেন্ (Ko Kung Chen)ও অনুরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে বিজ্ঞাপন ছাপিবার পর কাগজেব যে সামান্য জায়গা বাকী থাকে তাহা

১। "... ... our most popular dailies are the worst-edited, being run with advertisements as the basis and news of secondary importance only to fill the broken spaces left over by advertisements, while the better edited dailies reach a smaller public"—*A History of the Press and Public Opinion in China* by Lin Yutang, p. 131.

পূর্ণ করিবার জন্যই চীনদেশীয় সংবাদপত্রসমূহে সংবাদ মুদ্রিত হইয়া থাকে। প্রকাশিত সংবাদসমূহও যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় না। একই কাগজের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। একই পত্রিকার ২।৩ জায়গায় একই সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কাগজে বাজে বকুনির তুলনায় কাজের কথা থাকে খুব কম।[১]

গত ২০ বৎসরে চীনে সংবাদপত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজ অনেক পত্রিকারই বিশেষ সাপ্তাহিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বহু প্রগতিশীল সংবাদপত্র চিত্তাকর্ষক সংবাদ-শিরোনাম (Head line) ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। অনেক পত্রিকাতেই অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, ক্রীড়া-কৌতুক, চলচ্চিত্র, নারী-সমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়মিতভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও সংবাদ সংগ্রহ এবং পরিবেষণের দিক্ হইতে বিচার করিলে চীনের সংবাদপত্রসমূহ আজ পর্যন্ত একান্তই অপরিণত এবং অনগ্রসর অবস্থায় রহিয়াছে। যোগ্য সংবাদদাতা নাই বলিলেও চলে। আর এই জন্যই প্রকাশিত সংবাদ প্রায়ই সুলিখিত হয় না। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সংবাদদাতাদিগের লিখন-ভঙ্গী মোটেই সজীব এবং সরস নহে। এতদ্ব্যতীত সংবাদপত্রগুলি প্রধানতঃ রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেষণ করিয়া থাকে বলিয়া সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পত্রিকা পাঠে বেশী উৎসাহ বোধ করেন না।

১। "The news reported in our China newspapers only serves the purpose of filling up the space. In reporting an event, an account often appears without proper introduction or ending and sometimes conflicts with itself. Sometimes the same event appears in two or three places without any order or system There is a lot of empty verbiage and the reader is not able to get at the salient points. The reason for the former is that the reporters have not learned their job but content themselves with copying releases, while the latter defect is due to the fact that the editors do not think for their readers and only want to save troubles. So, we often find a score of pages with a lot of words and nothing interesting in it that is worth reading. This is indeed a great pity."—*History of Chinese Journalism* by Ko Kung Chen, P. 218.

দেশের সাময়িক সাহিত্য তাহার জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান এবং নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। ইহারা লোকশিক্ষার অন্যতম প্রধান বাহনও বটে। চীনের সাময়িক পত্রিকা আজ এক হিসাবে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বর্ত্তমানে বিভিন্ন মাসিক প্রকাশিত হইয়া থাকে। চীনের ১৯৩৫ সালের বর্ষ-পঞ্জিতে (Year Book) ৪৫০ খানা সাময়িক পত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। দৈনিক এবং সাময়িক পত্র ব্যতীত চীনে 'মস্কুইটো পেপার' (Mosquito Paper) নামক এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রায়তন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক। এই গুলিতে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না এমন অনেক টুকিটাকি খবর থাকে। ১৯৩৫ সালে চীন হইতে ২০০-এর অধিক 'মস্কুইটো পেপার' প্রকাশিত হইত।

দৈনিকের ন্যায় চীনের সাময়িক পত্রগুলির সম্পাদনাও অত্যন্ত নিম্ন-শ্রেণীর। লেখকদিগের দক্ষিণার হার অত্যন্ত কম বলিয়া ভাল লেখকগণ সাধারণতঃ সাময়িকপত্রে লিখেন না। আমেরিকার সাপ্তাহিক এবং মাসিকগুলি প্রকাশিত প্রতিটি প্রবন্ধের জন্য লেখককে সাধারণতঃ ১০০ হইতে ২,০০০ ডলার (১ ডলার = আঃ ৩৷৹।৪৲) পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিয়া থাক। পক্ষান্তরে চীনে এই দক্ষিণার হার ১,০০০ শব্দের একটি প্রবন্ধের জন্য সাধারণতঃ ৩।৪ ডলারের বেশী নহে। (ইহা অবশ্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা)। জাতীয় জাগরণে চীনের সাময়িক পত্রসমূহের দান মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। সমাজ-জীবনের সর্ব্বস্তরে ইহাদের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। লিয়াং চি চাও-সম্পাদিত 'সিন্‌মিন্ সুং পাও' (Hsinmin Tsung Pao), 'ইউংইয়েন্' ও 'টাচুংহুয়া', ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেনের 'ফু পাও', 'মিন্ পাও' ও 'ক্যুওমিন্' (Kuomin), কাং ইউ-ওয়েই-পরিচালিত 'পুজেন্' প্রভৃতি সাময়িকপত্র চিন্তা-জগতে বিরাট এবং বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নব্য চীনের গোড়া পত্তন করিয়াছে।

সুন্ ইয়াট-সেন ও বিপ্লব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মহাচীনের জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই দুর্যোগের কৃষ্ণমেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। জনসাধারণ মাঞ্চুরাজবংশের উপর আস্থা এবং শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ এবং নববলদৃপ্ত জাপান পদে পদে মহাচীনের সার্ব্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। জাতীয় জীবনের এই ঘোর দুর্দ্দিনে দক্ষিণচীনের ক্যাণ্টন বন্দরের অনতিদূরে এক গ্রামে মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে সুন্ ইয়াট-সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক বারবার জাতীয় মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার ফলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল সুন্ তাহাকে রূপ দান করেন এবং অবশেষে প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গণ-বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সুন্ ইয়াট-সেনের নেতৃত্বে দুঃখ-দুর্গম পথে নব্য চীনের যে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল আজও তাহার অবসান হয় নাই। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাহার অগ্রগতি মোটের উপর অব্যাহত রহিয়াছে।

সুন্ ইয়াট-সেন ছিলেন আজন্ম-বিদ্রোহী। বাল্যকালে তিনি তাঁহার শিক্ষকের অবাধ্য ছিলেন। এই অপরাধে তিনি বহুবার বেত্রদণ্ড এবং অন্যবিধ শারীরিক নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। সুনের বিদ্রোহ কেবল বিদ্যামন্দিরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একটু বয়স হইলেই তিনি বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা এবং আচরণের নির্ভীক সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মাঞ্চু রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে তিনি বিজাতীয় ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন। শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষমতা ইঁহাদিগের না থাকিলেও কৃষকের আয়ের মোট একটা অংশ রাজকর বলিয়া আদায় করিতে ইঁহাদিগের তৎপরতার অন্ত ছিল না। সুনের রাজ-

ডা. সুন ইয়াৎ-সেন

মাদাম সুন ইয়াৎ-সেন

কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ঘৃণা পরে মাঞ্চুরাজবংশের বিরুদ্ধে বোষ এবং বিদ্বেষে পরিণত হয়। টাইপিং বিদ্রোহের এক বৃদ্ধ সৈনিক স্থনের এই মানসিক পরিণতি ঘটাইতে বিশেষ সহাযতা করিযাছিল।

স্থনের এক অগ্রজ হনুলুলুতে (Honululu) কৃষিকার্য্য কবিতেন। মাত্র ১৩ বৎসর বযসে মাতা-পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি অগ্রজেব নিকট চলিয়া গেলেন। দেশে থাকিবার কালে প্রচলিত বিধি-নিষেধেব চাপে তাঁহাব নিঃশ্বাস বন্ধ হইযা আসিতেছিল। নূতন জায়গায় অভিনব পরিবেশের মধ্যে মুক্তির স্বাদ পাইয়া তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিযা বাঁচিলেন। হনুলুলুতে আসিয়া স্থন্ ইয়াট-সেন প্রথম প্রথম তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ক্ষেত্রজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ে সহায়তা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে তিনি হাওযাই (Hawaii) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যযনকালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মান্তব গ্রহণ করায তদীয় অগ্রজ তাঁহাব প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। জ্যেষ্ঠ স্থনেব আশঙ্কা হইল যে স্থন্ ইয়াট-সেন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পডিয়া স্বদেশ, স্বজাতি এবং জাতীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা এবং অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিবেন। ১৮৮৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার নাম কাটাইয়া ঘরের ছেলে ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় স্থনের বয়স ১৮ বৎসব। ইহার পূর্ব্বেই মহাচীনের নবজন্মের সূচনা হইয়াছিল। জাতি ক্রমেই স্বীয় মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। আধুনিক ভাবধারার নিষেকে জাতি-মানসেব দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল। দেশে ফিরিবার কয়েকদিন পবেই স্থন্ ইযাট-সেন এক দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়া বসিলেন। দেবার্চ্চনা ইত্যাদিকে এই স্বধর্ম্মত্যাগী বিদ্রোহী তরুণ অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া মনে কবিতেন। একদিন তিনি গ্রাম্যমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পেই টি(Pei Ti)-র মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবমূর্ত্তির গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত করিলেন। দেবমূর্ত্তির কোন ক্ষতি হইয়াছিল কিনা আমাদের জানা নাই। তবে স্থন্ ইয়াট-সেনের আঙ্গুল

জখম হইয়াছিল। এই ঘটনা গ্রামবাসীদিগকে ভীত, সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। অবমানিত, রুষ্ট দেবতা না জানি কী ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন! গ্রামবাসিগণ উদ্ধত দেবদ্বেষীকে শাস্তি প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হইল। সুন্ ইয়াট-সেন প্রাণভয়ে হংকং-এ পলায়ন করিলেন।

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে মাঞ্চুসরকার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আনাম প্রদেশ ফরাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। যে যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যের এই অঙ্গচ্ছেদ করা হইল তাহাতে চীনসৈন্যদল একটি সংঘর্ষেও ফরাসীবাহিনী কর্তৃক পরাজিত হয় নাই। সরকারের এই ক্লীবোচিত আচরণ জনসাধারণের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। সুনের মনোজগতেও এই সময় বিপ্লবের অনির্ব্বাণ শিখা জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং বিপ্লবের সাহায্যেই চীনের শৃঙ্খলমোচন হইবে।

স্বৈরতন্ত্র-শাসিত দেশে বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক দলগঠন সহজসাধ্য নহে। নিরাপদ ত নহেই। সুতরাং সুন্ ইয়াট-সেন সহসা কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ২১ বৎসর বয়সে তিনি হংকং মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এইখানে অধ্যয়ন কালে তিনি এবং তাঁহার তিন জন অন্তরঙ্গ বন্ধু 'চার দস্যু' (The Four Great Bandits) নামে অভিহিত হইতেন। ১৮৯২ সালে মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুন্ ক্যাণ্টনে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তিনি কেবল রোগ এবং রোগীর চিকিৎসাই করিতেন না। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করা তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য ছিল।

১৮৯৫ সালে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিমোনোসেকির সন্ধিতে চীন অত্যন্ত অপমানজনক কতকগুলি সর্ত্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। এই অবমাননা চীনের ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায়কে বিচলিত এবং ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল। ইঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে চীনের শাসন-ব্যবস্থা

একান্ত অনগ্রসর এবং মোটেই যুগোপযোগী নহে। তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে এই ব্যবস্থাই আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে চীনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহার আশু পবিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। মাঞ্চুরাজবংশকে অপসারিত কারয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বৎসরই ক্যাণ্টনে একটি বিপ্লবী সরকাব স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয।

এদিকে ডাঃ সুন্ হনুলুলুতে প্রত্যাবর্ত্তন কবিয়া 'সিং চুং হুই' (Hsing Chung Hui or Resurgent China Society) নামক একটি বাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন। মালয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিযা প্রভৃতি স্থানেব প্রবাসী চীনদেশীয়গণ চীনেব বিপ্লব-আন্দোলনের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। মুখ্যতঃ ইঁহাবাই এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ধনবল এবং জনবল জোগাইযাছেন। মাঞ্চুসরকাবেব নাগালের বাহিরে থাকিয়া ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিবাব জন্যই ১৮৯৬ সালে হংকং-এ সুনেব 'সিং চুং হুই'-ব কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় স্থাপিত হইল। এই সময়েই চীনেব বর্ত্তমান জাতীয পতাকার রূপ পরিকল্পিত হয়।

সুনের চরিত্রে কল্পনাপ্রবণতা এবং বাস্তববোধ এই দুই পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। একদিকে তিনি যেমন লোকায়ত্ত সরকার স্থাপিত করিয়া দেশ হইতে যাবতীয় অন্যায় এবং অবিচার দূর করিবার কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিতেন, তেমনই আবার ইহাও বুঝিতেন যে পাশ্চাত্য নীতি এবং কৌশলের সাহায্যেই মহাচীনকে বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব-মুক্ত করিতে হইবে। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"Chinese aspiration can be realised only when we understand that to regenerate the state......we must welcome the influx of

foreign capital on the largest possible scale, and also must attract foreign scientists and trained experts to develop our country and train us" অর্থাৎ আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে চীনের পুনরুজ্জীবনের জন্য যত বেশী সম্ভব বৈদেশিক মূলধন দেশে আসিতে দিতে হইবে এবং দেশের উন্নতি সাধন এবং দেশবাসীকে শিক্ষা দেওযাব কার্য্যে ভিন্নদেশীয বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদিগকে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

হনলুলুতে 'সিং চুং হুই'-র প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইবার পর ডাঃ স্থন্ প্রথমতঃ আমেরিকায় এবং সেখান হইতে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংরেজ সরকারের সাহায্য এবং সহানুভূতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই দুই দেশে গিয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে তত্রত্য চৈনিক রাজদূতের চক্রান্তে স্থন্‌কে অপহরণ করা হয়। তাঁহাকে চৈনিক দূতাবাসে বন্দী করিয়া রাখা হইল। সুযোগমত তাঁহাকে পিকিং-এ সম্রাটের নিকট পাঠাইযা দেওয়াই রাজদূতের উদ্দেশ্য ছিল। দূতাবাসের একজন দ্বার-রক্ষকের জন্য তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এই দ্বার-রক্ষক স্থনের ভূতপূর্ব্ব ইংরেজী শিক্ষক স্যর জেম্‌স্ ক্যাণ্টলিকে (Sir James Cantlie) সংবাদ দেয়। পরদিন লণ্ডনের সমস্ত খবরের কাগজে এই অপহরণ-কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র দফ্‌তর এই অপহরণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া চীন-দূতকে পত্র দিল। ইহার ফলে ডাঃ স্থন্ মুক্তিলাভ করেন। লণ্ডনের ৪৯, পোর্টল্যাণ্ড প্লেসের (49, Portland Place, London) ক্ষুদ্র একটি কক্ষে স্থন্‌কে বন্দী করিয়া রাখা হইযাছিল। সযত্নরক্ষিত এই কক্ষটি আজ পর্য্যন্ত ডাঃ স্থনের অপহরণ-কাহিনীর স্মৃতি বহন করিতেছে।

১৮৯৭ সালে স্থন্ যখন ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ চীনের বিভিন্ন অংশে স্ব-স্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল (Sphere

of influence) স্থাপন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল। বন্দী হইবার ভয়ে স্থন্ চীনে গেলেন না। তিনি প্রথমতঃ জাপানে যান এবং জাপানপ্রবাসী চীনদেশীয় ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি বিপ্লবী সমিতি গঠন করেন। এই সমস্ত সমিতিতে যে কেবল মাত্র ছাত্র-সভ্যই ছিলেন তাহা নহে। পববর্ত্তী কয়েক বৎসর স্থন্ অনবরত জাপান, হংকং, এবং আনামের মধ্যে যাতায়াত করেন এবং এই সমস্ত জায়গায় বহু গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন।

১৯০২ সালে বিপ্লববাদীগণ ক্যাণ্টন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হ'ন্। ১৯০৪ সালে হুনানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মাঞ্চুসরকার সহজেই তাহা দমন করেন। তরুণচীনের উপর স্থন্ ইয়াট-সেনের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া জাপান শঙ্কিত হইযা উঠিল এবং জাপান-প্রবাসী চীন-ছাত্রসম্প্রদাযের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। এখন হইতে আনাম ডাঃ স্থনের কর্ম্ম-কেন্দ্র হ্ইল। ১৯০৯ সালে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায ইউরোপ যাত্রা কবিলেন। বিপ্লব-আন্দোলন পরিচালনা এবং ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অর্থসাহায্য অত্যাবশ্যক হইয়া পডিযাছিল। শত দুর্য্যোগ, প্রতিকূলতা এবং বাধা-বিপত্তির মধ্যেও স্থন্ হাল ছাড়েন নাই। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অপূর্ব্ব সংগঠন-নৈপুণ্য এবং অদম্য অধ্যবসায়ের গুণে বিপ্লবী ভাবধারা এবং বিপ্লব-আন্দোলন ক্রমশঃই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়া চলিল। দেশময় সর্ব্বত্র মাঞ্চু রাজপুরুষ-গণেব হত্যা এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হইতে লাগিল।

সিংহাসন রক্ষার জন্য সম্রাট স্থয়ান্-টুং নূতন সৈন্যদল গঠন করিয়া সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই স্থযোগে বহু বিপ্লববাদী রাজসৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া সেনাবাহিনীকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিল। কিছুদিনের মধ্যেই মাঞ্চুবাহিনীর নবগঠিত অংশ বিপ্লববাদীদিগের অন্যতম প্রধান প্রচার এবং কর্ম্ম-কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

১৯১০ সালে এই নবগঠিত সৈন্যদল ক্যাণ্টন অধিকার করিবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই সময় জেচোয়াং-এ পিকিং-হ্যাঙ্কো-ক্যাণ্টন রেলপথের (Peking-Hankow-Canton Railway) একটি শাখা নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। জেচোয়াং-এর অধিবাসীদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই কাজ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ঋণসংগ্রহকার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর বৈদেশিক শক্তিসমূহের চাপে পড়িয়া দুর্ব্বল পিকিং-সরকার জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কের মালিকদিগকে জেচোয়াং রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। এই সরকারী আদেশের প্রতিবাদে জেচোয়াং-এ বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মাঞ্চুসরকারের রেলপথ সংক্রান্ত নীতি অবশ্য এই বিদ্রোহের উপলক্ষ্য মাত্র। ইহার প্রকৃত কারণ গভীরতর। জেচোয়াং-এ প্রজ্বলিত বিপ্লবের বহ্নি-শিখা ক্রমে ছড়াইয়া পড়িল। বণিক্ এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের সমর্থন বিদ্রোহীগণের শক্তিবৃদ্ধি করিল। ইহাদের ব্যাপক ধর্ম্মঘট এবং হরতালের ফলে জেচোয়াং-এর স্বাভাবিক জীবনধারা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষ কঠোরহস্তে বিদ্রোহ দমন করিলেন সত্য, কিন্তু বিপ্লবীদিগের আত্মোৎসর্গ একেবারে নিষ্ফল হয় নাই।

প্রায় এক মাস পরে হুপেই-র প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার প্রাণনাশের এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল। হুপেই-র বিপ্লববাদীদিগের নামের একটি তালিকা তাঁহার হস্তগত হইল এবং ইহাদিগের সকলের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় কালবিলম্ব না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করা ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না।

১৯১০ সালের ১০ই অক্টোবর উচাং-এ (Wuchang) গভর্ণরের বাসভবন আক্রান্ত হইলে তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহীদিগের অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কোন নেতা ছিলেন না। এক অভিনব কৌশলে

তাহারা এই অভাব দূর করিল। একদল বিদ্রোহী যখন গভর্ণরের প্রাসাদ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল, অপর একটি দল তখন লি ইউয়ান্-হাং (Li Yuan-hung) নামক উচাং-এর একজন বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষের বাসভবনে হানা দিল। নিদ্রিত লি-কে জাগাইয়া জানাইয়া দেওয়া হইল যে বিদ্রোহীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলে তাঁহার নিস্তার নাই। লি আর কি করেন। বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলেন। লি-র নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহী বাহিনী অতঃপর উচাং, হ্যাঙ্কো এবং হ্যানিয়াং অধিকার করিল।

বিপ্লবের যে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ প্রথম হুপেইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, অতি অল্পকালের মধ্যেই বর্দ্ধিতাকার হইয়া তাহা অবশেষে প্রলয়ঙ্করী গগনস্পর্শী শিখারূপে সমগ্র মহাচীনকে গ্রাস করিল। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বেই মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ১৪টি প্রদেশ বিদ্রোহে যোগদান করিল। সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিপ্লবী সরকারের শাসন-কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এমন কি রাজধানী পিকিং-এর উপকণ্ঠেও বিপ্লববাদিগণ নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না।

বিপ্লবের গতি, বেগ এবং জনপ্রিয়তা পিকিং-এর অন্তঃসারবিহীন মাঞ্চু সরকারকে ভীতি-বিহ্বল এবং বিচলিত করিয়া তুলিল। বিদ্রোহ দমন করিবাব জন্য সম্রাটের আদেশে ইউয়ান্ সি-কাই (Yuan Shi-Kai)-র নেতৃত্বে হ্যাঙ্কোতে একটি শক্তিশালী সৈন্যদল প্রেরিত হইল। অনভিজ্ঞ বিপ্লবীর দল ইউয়ানের অভিজ্ঞ এবং সুশিক্ষিত বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলনা। অনতিকালমধ্যে হ্যাঙ্কো অধিকৃত এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে অগ্নিদগ্ধ হইল। এই সময় হইতেই ইউয়ান্ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিপ্লবীদিগের সহিত একটা আপোষের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেন এতদিন দেশে ছিলেন না। বিপ্লবের সংবাদ অবশ্য তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল। বিপ্লবকে সফল পরিণতির পথে পরিচালিত

করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে তিনি ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন যে ইংল্যাণ্ড নিজে চীন-বিপ্লবে কোন পক্ষেই যোগদান করিবে না এবং তাহার মিত্র জাপানকেও নিরপেক্ষ থাকিতে সম্মত করিবে। সাংহাইতে পৌছিবার পর তিনি প্রস্তাবিত চীন সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ডাঃ সুন্ চীন-বিপ্লবের সর্ব্বজন-গৃহীত নেতা ছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁহারই সংগঠন-প্রতিভা, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি, অদম্য উৎসাহ এবং আপ্রাণ চেষ্টা মহাচীনের বিপ্লবের সঙ্কল্পকে রূপ দান করিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং প্রীতির ভাব পোষণ করিতেন। কিন্তু জনসাধারণের সহিত সুনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিলনা। অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। ডাঃ সুন্ মহাত্মা গান্ধী বা জবাহরলালের ন্যায় জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না। এই দিক্ হইতে ডাঃ সুন্ এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ভূতপূর্ব্ব কর্ণধার এবং বর্ত্তমানে ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মৌলানা আজাদের স্বদেশানুরাগ, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য, মণীষা এবং সংগঠন-প্রতিভা সন্দেহাতীত হইলেও ইংরাজীতে যাহাকে 'popular leader' অর্থাৎ জনপ্রিয় জননায়ক বলে তিনি তাহা নহেন।

চীনে পদার্পণ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুন্ ইয়াট-সেন বুঝিতে পারিলেন যে আরব্ধ বিপ্লবকে জয়শ্রীমণ্ডিত করিতে হইলে ইউয়ান্ সি-কাই-র সহিত একটা বোঝাপড়া না করিয়া উপায় নাই। তিনি গোপনে ইউযানের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে যদি তিনি (ইউযান্) বিপ্লবীদিগেব সহিত যোগদান করেন, তবে তাঁহাকেই চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি করা হইবে।

ইউয়ানের উচ্চাভিলাষ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি বরাবরই সুবিধাবাদী। ১৮৯৮ সালের সংস্কার-আন্দোলনের একজন প্রধান সমর্থক হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কারকদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন এবং সংস্কাব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে জু-সিকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি সহজেই স্থনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অতঃপর তিনি সম্রাট্‌কে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি (ইউযান্) জনমতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। এই পত্রেই তিনি সম্রাট্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সম্রাটের সমর্থকগণের মধ্যে ইউয়ান্‌ই যোগ্যতম এবং সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তিনি যখন বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান কবিলেন তখন সম্রাট্ এবং তদীয় সমর্থকবর্গ কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাঁহাদেব কর্ত্তৃত্বের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। ১৯১২ সালেব ১২ই ফেব্রুয়ারী শেষ মাঞ্চুসম্রাট্ সুয়ান্-টুং সিংহাসন ত্যাগ কবিলেন। চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহাব পব সর্ব্বপ্রথম যে জাতীয় পবিষদ্ গঠিত হয় তাহাকে সমগ্র জাতিব প্রতিনিধিস্থানীয মনে করা ভুল হইবে। এই পরিষদের দুইটি কক্ষ ছিল। কক্ষ দুইটির নাম 'সিনেট' (Senate) এবং 'হাউস অব বিপ্রেসেণ্টেটিভ্‌স্' (House of Representatives)। এই পরিষদে যাঁহারা স্থান পাইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই মহাচীনের বিপ্লবী শক্তিসমূহের প্রতিনিধি-স্থানীয ছিলেন। তখন চীনের যে অবস্থা তাহাতে এই ব্যবস্থাই বোধ হয় সর্ব্বোত্তম ছিল। জনসাধারণ তখন পর্য্যন্ত দেশেব সমস্যাসমূহেব প্রতি একান্তই উদাসীন এবং সেই সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল। জন-সাধারণেব রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে জাতীয় পবিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রদান করিলে কিছু উপকার হয়ত হইত; কিন্তু অপকারের সম্ভাবনাও যথেষ্টই ছিল।

জাতীয় পরিষদ্ কর্তৃক ইউয়ান্ সি-কাই নবজাত চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। হনুলুলুতে গঠিত ডাঃ স্থনের 'সিং চুং হুই' ইহার পূর্ব্বে পুনর্গঠিত হইয়া নূতন নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'চায়না লীগ' (China League)। এই সময় 'চায়না লীগ' কে ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া গঠন করা হইল। এখন হইতে ইহার নাম হইল 'ক্যুওমিন্টাং' (Kuomintang—The National People's Party অর্থাৎ জনগণের জাতীয় দল)। শ্রম-শিল্প এবং রেলপথনির্ম্মাণ সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করিবার জন্য ডাঃ স্থন্ অতঃপর জাপান গমন করেন।

স্থনের চীন হইতে চলিয়া যাওযার পর ইউয়ান্ নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে জাপানের প্ররোচনা ছিল। জাপান কোন দিনই চীন সাধারণতন্ত্রের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করে নাই। তাহার বরাবরই আশঙ্কা যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে চীন হয়ত একদিন একটি শক্তিশালী, শিল্পপ্রধান এবং আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইলে এশিয়াতে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতে, তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের সযত্নপোষিত আকাঙ্ক্ষা চিরতরে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

১৯১৩ সালে ইউয়ানের আদেশে 'ক্যুওমিন্টাং' দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। জাতীয় পরিষদে ইহাই ছিল বিরোধী দল। পর বৎসর ইউয়ান্ পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। বিপ্লবের পর অনেক ক্ষেত্রেই প্রতি-বিপ্লব (Counter-revolution) সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই এত অনায়াসে এবং এই প্রকার বিনা বাধায় প্রতি-বিপ্লব সংঘটিত হইতে দেখা গিয়াছে।

ইউয়ানের আচরণে ডাঃ স্থন্ হতাশ হইলেও একেবারে হাল ছাড়িলেন না। জাপানে বসিয়া তিনি ক্যুওমিন্টাং দলকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন।

তিনি ঘোষণা করিলেন যে, চীনের মুক্তির জন্য ইউয়ান্‌কে পদচ্যুত করিয়া নূতন করিয়া বিপ্লবী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এদিকে ইউয়ানের সমর্থক এবং অনুচরবর্গ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত মহাচীনের অতীত গৌরব এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা যাইবে না। এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা 'চৌ আন্ হুই' (Ch'ou An Hui) নামক একটি সমিতি স্থাপন করিলেন। সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াই ইউয়ান্ স্বীয় অনুগ্রহভাজন রণ-নায়কগণকে (Tuchun or War-lord) বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহারা এখন ইউয়ান্‌কে সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্ব্বাচিত জাতীয় পরিষদেব অধিকাংশ সদস্য রাজতন্ত্রের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন। 'কাউন্সিল অব ষ্টেট' অতঃপর ইউয়ান্ সি-কাইকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণচীনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইউযান্ ভয় পাইয়া গেলেন। তিনি সিংহাসনারোহণ স্থগিত রাখিলেন। পর বৎসর মার্চ্চ মাসে ইউয়ান্ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিবার ইচ্ছা নাই। ইহার কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর জাপানের সহায়তায় সিংহাসনত্যাগী সম্রাট সুয়ান্-টুংকে আবার চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল (১৯১৭)। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পিকিং-এর ওলন্দাজ দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এক্ষণে স্পষ্টই বোঝা গেল যে মহাচীনে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

১৯১৬ সালে ইউয়ান্ সি-কাইর মৃত্যু হইতে ১৯২৬ সালের দ্বিতীয় চীন-বিপ্লব পর্য্যন্ত পরস্পর যুধ্যমান বিভিন্ন প্রাদেশিক রণ-নায়কগণ চীনের ভাগ্য-বিধাতা ছিলেন। ১৯১১ সালের বিপ্লবের সময় মাঞ্চুসিংহাসন রক্ষার জন্য ইউয়ান্ 'নর্থ ওসেন আর্ম্মি' (North Ocean Army) নামে যে শক্তিশালী

সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন তাহারই পদস্থ কর্ম্মচারিগণ প্রায় ২০ বৎসর কাল পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ইউয়ানের জীবদ্দশায় ইঁহাদের দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ কোন সময়েই মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইতে পাবে নাই। কিন্তু ইউয়ানের মৃত্যুর পর সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব-মুক্ত হইয়া ইঁহারা সর্ব্বনাশা গৃহ-যুদ্ধে নিজেদের সমগ্র শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করিলেন। মহাচীনের ভাগ্য এবং কোটি কোটি নর-নারীর সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এই যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইল। জাতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৯১৬ হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত রণ-নায়ক মহাচীনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে দু'এক জন শক্তিমান্, প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইলেও সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইঁহারা প্রায় সকলেই দম্ভ এবং অজ্ঞতার মূর্ত্ত প্রতীক স্বরূপ ছিলেন। নিজেদের দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে ইঁহাদের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল একান্তই শোচনীয়। আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের গতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঁহাদের অজ্ঞতা ততোধিক শোচনীয় ছিল। পান-ভোজন এবং ইন্দ্রিয়সম্ভোগই ছিল ইঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। ইঁহাদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহে প্রজাবৃন্দ নিদারুণ করভারে প্রপীড়িত এবং অন্য নানা ভাবে উৎপীড়িত হইত। ইঁহারা কথায় কথায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিতে দ্বিধা করিতেন না। ইঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যদলসমূহে শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। ইহারা জনসাধারণের ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে রণ-নায়কগণ আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ইঁহাদের শাসনাধীন স্থানসমূহের শাসন-ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রকারে প্রগতিবিরোধী এবং জনসাধারণের মঙ্গল ও উন্নতির পরিপন্থী ছিল। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য রণ-নায়কগণ কোন চেষ্টা করিতেন না এবং শিল্প-প্রগতির পথ সর্ব্বপ্রযত্নে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া রাখিতেন।

এদিকে ডাঃ স্থন্ কিন্তু নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ক্যাণ্টনে আসিয়া তিনি 'ক্যুওন্‌মিটাং' দলকে নূতন ভাবে গঠন করিলেন। এখন হইতে এই দলের নাম হইল 'চুংক্যুও ক্যুওমিন্‌টাং' (Chung Kuo Kuomintang—Chinese National People's Party অর্থাৎ চীনের জনগণের জাতীয় দল)। ১৯২১ সালে ক্যাণ্টনে একটি বিপ্লবী সরকার স্থাপন করিয়া তিনি নিজে তাহার কর্ণধার নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সময় হইতেই সোভিয়েট রাষ্ট্র কর্ত্তৃক চীন-বিপ্লবের গতি এবং প্রকৃতি প্রভাবিত হইতে থাকে। ডাঃ স্থন্ সাম্যবাদী আদর্শে আস্থাবান্ ছিলেন না। সাম্যবাদী নীতি যে চীনের পক্ষে স্থফলপ্রসূ হইবে তাহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু সোভিয়েট ভূমিতে সাম্যবাদী আদর্শকে রূপ-প্রতিষ্ঠ করিবার প্রচেষ্টা এবং এই প্রয়াসের বিরাট সফলতা তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

১৯২৩ সালে সোভিয়েট এবং ক্যাণ্টন সরকারের এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইল যে ইঁহারা পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলিবেন। ক্যাণ্টন সরকারকে পরামর্শ এবং প্রয়োজনবোধে সহায়তা দিবার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বরোডিন (Borodin) এবং গ্যালেন্সকে (Galens) চীনে প্রেরণ করা হইল। বরোডিন ছিলেন বিপ্লবী সংগঠনে বিশেষজ্ঞ। পক্ষান্তরে গ্যালেন্স ছিলেন রাজনীতিবিশারদ অথচ নিপুণ যোদ্ধা। গ্যালেন্সের পরিচালনাধীনে ক্যাণ্টনের নিকটবর্ত্তী হোয়াম্পোয়া বা হুয়াংপু (Whampoa or Huang-P'u) দ্বীপে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই বিদ্যালয়ে চীনের বর্ত্তমান সর্ব্বাধিনায়ক, চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাই-শেকের (Chiang Kai-shek) তত্ত্বাবধানে এবং রুশীয় উপদেষ্টাগণের শিক্ষাধীনে ক্যাণ্টন সরকারের সৈন্যদলের শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। এই সময় বরোডিন স্থন্ ইয়াট-সেনকে বুঝাইলেন যে বিপ্লবী ভাবধারার প্রচারকদিগের যথোপযুক্ত শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি স্থন্ ইয়াট-সেনকে স্বীয়

আদর্শ এবং মতবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ এবং প্রচার করিতে সম্মত করাইলেন। ইহারই ফলে স্থন্ ইয়াট-সেনের বিখ্যাত 'সান্ মিন্ চু-ই' (San Min Chu I—Three Principles of the People অর্থাৎ জনগণের তিনটি নীতি) প্রকাশিত হয়। এই 'সান্ মিন্ চু-ই' আধুনিক চীনের জীবন-বেদ এবং ইহা কণ্ঠস্থ রাখা বিদ্যালয়গামী প্রত্যেক ছাত্র এবং ছাত্রীর অবশ্য প্রতিপাল্য কর্তব্য।

১৯২৪ সালে পিকিং সরকারের কর্ণধার জেনারেল উ পে-ফু (General Wu Pei-Fu) অপর দুইজন রণ-নায়ক[১] কর্তৃক পদচ্যুত হওয়ার পর সমগ্র চীনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ডাঃ স্থন্‌কে পিকিং-এ যাইতে অনুরোধ করা হইল। ঠিক এই সময়েই স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগের বিরোধিতার জন্য স্থনের কর্তৃত্বে পরিচালিত প্রগতিশীল ক্যাণ্টন সরকার পতনোন্মুখ হইযা উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও দুরারোগ্য কর্কট রোগে (Cancer) ভুগিতেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এই দুই কারণে বরোডিনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পিকিং যাত্রা করিলেন। কিন্তু প্রাথমিক আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ্চ পিকিং-এ ডাঃ স্থন্ ইয়াট-সেন প্রাণত্যাগ করেন।

১। জেনারেল চ্যাং সো-লিন্ (General Chang Tso-lin) এবং জেনারেল ফেং ইউ-সিয়াং (General Feng Yu-hsiang)।

সুন্ ইয়াট-সেনের সঙ্কল্প ও সাধনা

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর মার্কিণ যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি উইল্সনের (President Wilson) ঘোষণা এবং জাতি-সঙ্ঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠা বিশ্বের সর্ব্বত্র শোষিত, উৎপীড়িত জাতিসমূহের মনে আশা এবং আনন্দের দীপ জ্বালিয়াছিল। ইহার পর যখন আন্তর্জ্জাতিক শান্তিবৈঠকে যুদ্ধকালে জাপান চীনে যে সমস্ত জায়গা অধিকার করিয়াছিল সে সমস্ত স্থানের উপর তাহার (জাপানের) অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং জাতি-সঙ্ঘ জাতি-সাম্য সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না তখনও এই আশা-দীপ নির্ব্বাপিত হয় নাই।

অন্যান্য অনেকের ন্যায় সুন্ ইয়াট-সেন এবং তাঁহার অনুগামিগণ মনে করিলেন যে প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়াপন্থীদিগের এই জয় স্থায়ী হইবেনা। সুন্ বিশ্বাস করিতেন যে, বৈদেশিকগণ আর চীনকে শোষণ বা তাহার উপর জুলুমবাজি করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবেন। 'দি ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপ্-মেণ্ট অব্ চায়না' (The International Development of China) নামক গ্রন্থে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রম-শিল্পে উন্নত দেশ-সমূহের পক্ষে চীনে গণতন্ত্র স্থাপনে এবং তাহার শিল্পোন্নতিতে সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য; ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেরই উপকার হইবে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যাণ্ড ডাঃ সুন্‌কে কল্পনাবিলাসী উন্মাদ বলিয়া উপেক্ষা করিল। চীন সম্পর্কে ইহাদিগের নীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল।

ফলে সুন্ ইয়াট-সেন ক্রমে ক্রমে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে রুশিয়া চীনকে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তদুপযোগী মর্য্যাদা প্রদান করিতে প্রস্তুত। রুশিয়ার অন্তর্ব্বিপ্লব এই সময় সবেমাত্র শেষ

হইয়াছে। চীনের শিল্পোন্নতির জন্য মূলধন জোগাইবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। তথাপি সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে ক্যাণ্টন সরকারের সহায়তার জন্য রুশীয় উপদেষ্টা এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইল। কায়েমি স্বার্থের (Vested interests) প্রতিনিধিগণ জোরগলায় প্রচার করিতে লাগিলেন যে ক্যাণ্টন সরকার বল্‌শেভিকগণের সহিত হাত মিলাইয়াছেন।[১]

ডাঃ সুন্‌ এবং ক্যাণ্টনে প্রেরিত সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ জোফের (Mr. Joffe) একটি যুক্ত বিবৃতি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে ডাঃ সুন্‌ চীনে সাম্যবাদ বা সোভিয়েটতন্ত্রের প্রবর্ত্তন সম্ভব মনে করেন না এবং চীনের অবস্থা সাম্যবাদ বা সোভিয়েটতন্ত্র স্থাপনের অনুকূল নহে। মিঃ জোফও তাহাই মনে করেন। তাঁহার (মিঃ জোফের) মতে জাতীয় ঐক্য স্থাপন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চীনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। এই দ্বিবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি চীনকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন।[২]

ডাঃ সুনের স্বদেশানুরাগ এবং আন্তরিকতা সন্দেহাতীত। রুশিয়া কি কারণে চীনকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিল তাহা অনুমান করাও শক্ত নহে। রুশিয়া চীনের একান্ত নিকট প্রতিবেশী। সুতরাং চীন যদি

১। "Shanghai journalists, like Rodney Gilbert.. .. manufactured tales in which both Sun and his military lieutenant Chiang Kai-shek, were assailed daily as blood-stained anarchists, who had gone over to the enemy of mankind. Actually, nobody had gone over to any body."—*The Unfinished Revolution in China* by I Epstein, P. 41.

২। "Dr. Sun Yat-sen holds that the communistic order or even the Soviet system cannot actually be introduced into China, because there do not exist here the conditions for the successful establishment of communism or sovietism. This view is entirely shared by Mr. Joffe, who is further of the opinion that China's paramount and most pressing problem is to achieve national unification and attain full national independence, and regarding this task he has assured Dr. Sun that China.........can count on the support of Russia."

পূর্ব্বের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্রই থাকিয়া যায়, তবে অদূরভবিষ্যতে সোভিয়েটতন্ত্র-শাসিত রুশিয়ার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই রুশিয়া মনেপ্রাণে কামনা করিতেছিল যে চীন ঐক্যবদ্ধ এবং বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হইয়া একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হউক্। এই অবস্থায় উন্নীত চীন কোনদিনই স্বেচ্ছায় রুশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিবেনা। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ ডাঃ সুন্-প্রতিষ্ঠিত ক্যাণ্টন সরকারকে প্রগতিশীল বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্যই তাঁহারা ইহাকে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

ক্যাণ্টন সরকারকে অবশ্য কোনক্রমেই সাম্যবাদী মনে করা চলে না। বরোডিনের মতে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে অন্যান্য (পাশ্চাত্য) দেশে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য যে সংগ্রামের অবসান ঘটিয়াছিল, ক্যাণ্টন সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সেই সংগ্রাম সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল।[১]

ডাঃ সুনের চরমপত্র পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একমাত্র রুশিয়াই চীনকে সমকক্ষ রাষ্ট্রের মর্য্যাদা দান করিতে প্রস্তুত ছিল বলিয়া তিনি তাহার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। চীনকে এই মর্য্যাদা দান করিতে প্রস্তুত বা নিজে এই মর্য্যাদা লাভের জন্য সচেষ্ট যে কোন্ রাষ্ট্রের সহিতই তিনি মৈত্রী স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং তিনি চীনের সাম্যবাদী এবং অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়া-বিরোধীদিগের সহযোগিতা কামনা করিতেন।

সমসাময়িক রুশ-ইতিহাস হইতে ডাঃ সুন্ এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে মুক্তির জন্য জনসাধারণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ১৯২৩

১। 'Canton is not Communistic ; there is a hard struggle for political, economic and social progress such as other countries have gone through several hundred years ago."—*Borodin.*

সালে চীন-সোভিয়েট মৈত্রী স্থাপনের পর তিনি কুওমিন্‌টাং দলকে আবার ঢালিয়া সাজিলেন। প্রগতিপন্থী যে কোন ব্যক্তি এখন হইতে ইহার সদস্য হইতে পারিতেন। এই বৎসরই তাঁহার সহিত কম্যুনিষ্টগণের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে সাম্যবাদিগণ নিজেদের পৃথক্ সংগঠন বজায় রাখিয়া সদলবলে ক্যুওমিন্‌টাং দলে প্রবেশ করেন। তাঁহারা ইহার পূর্ব্বেই শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্যুওমিন্‌টাং-এর সহিত যুক্ত 'ফ্রন্ট' (United front) গঠন করিবার পর শ্রমিক এবং কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার বিশেষ দায়িত্ব কম্যুনিষ্টগণের উপর অর্পিত হইল। তাঁহারাও অযথা কালক্ষেপ না করিয়া রাজনৈতিক প্রচারের সাহায্যে কৃষক এবং শ্রমিকসম্প্রদায়কে শ্রেণী-সচেতন এবং সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং এই উভয় দলের গ্রাহ্য একটি কর্ম্মসূচী (programme) রচিত এবং গৃহীত হইল।

কেহ কেহ বলেন যে ডাঃ সুন্ মৃত্যুর পূর্ব্বে সাম্যবাদী নীতি এবং আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ কথা কিন্তু একেবারেই অর্থহীন। আসল কথা এই যে ডাঃ সুন্ কোনদিনই সাম্যবাদী ছিলেন না। তবে একথা সত্য যে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন করিয়া ইহাদিগের চিতাভস্মের উপর তিনি এক অভিনব সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেন। অন্যান্য দেশের সাম্যবাদিগণের ন্যায় চীনের সাম্যবাদিগণও ভাল করিয়াই জানিতেন যে প্রতিক্রিয়ার দুইটি প্রধান বাহন সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিতে না পারিলে মার্কসীয় আদর্শকে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না। ডাঃ সুন্ বুঝিয়াছিলেন যে বহুদিন পর্য্যন্ত ক্যুওমিন্‌টাং দলকে সাম্যবাদিগণের সহযোগিতায় কাজ করিতে হইবে। আদর্শের দিক্ হইতে ইহাদের বিরোধ যে শীঘ্র প্রবল আকার ধারণ করিবে না তাহাও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন।

১৯২৫ সালে ডাঃ সুন্ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন, সেই সময় চীন বিপ্লবের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেলেও তখন পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক আদর্শ জয়যুক্ত হয় নাই। তিনি নিজেও ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও তিনি নিরুৎসাহ হ'ন্ নাই বা হাল ছাড়েন নাই। তাঁহার অন্তিমপত্রে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—৪০ বৎসর কাল আমি গণ-বিপ্লব আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। চীনের স্বাধীনতা অর্জ্জন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত তাহার সমকক্ষতা স্থাপনই আমার উদ্দেশ্য। ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকে মহাচীনের গণ-চেতনা জাগ্রত করিয়া যে সমস্ত জাতি আমাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে তাহাদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগের সমর্থন এবং সহযোগিতায় সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে।

আজও বিপ্লবের অবসান হয় নাই। আমার সহকর্ম্মীবৃন্দ যেন আমি যে জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনার কথা বলিয়াছি তদনুসারে কার্য্য করেন। তাঁহারা যেন আমাদের দলের প্রথম জাতীয় অধিবেশন কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণা অনুযায়ী কার্য্য করিয়া এই ঘোষণা এবং জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হন। মহাচীনের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান এবং অসম সন্ধিবন্ধনসমূহ ছিন্ন করা সম্বন্ধে আমার সাম্প্রতিক ঘোষণাবলী যেন অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা হয়।[১]

১। 'For forty years I have devoted myself to the cause of the people's revolution with but one end in view; the elevation of China to a position of freedom and equality among the nations. My experience during these forty years has convinced me that to attain thi goal we must bring about an awakening for our own people and ally ourselves in a common struggle with those peoples of the world who treat us as equals.

The Revolution is not yet finished. Let all our comrades follow my plan for National Reconstruction and the Manifesto issued by the First National Convention of our party, and make every effort to carry them out. Above all, my recent declarations in favour of holding a National Convention of the people of China and abolishing the unequal treaties should be carried into effect as soon as possible".

ডাঃ স্থনের জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনায় সরকারকে জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য দায়ী করা হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং যাহাতে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হইতে না পারে সেই জন্য তিনি প্রত্যেক জেলায় নির্ব্বাচনমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের এবং জেলার কর্তৃপক্ষের হাতে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করিবার কথা বলিয়াছিলেন। ডাঃ স্থন্ জাতীয় মূলধন নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বপ্নও দেখিতেন এবং রেলপথ, সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান শ্রম-শিল্পগুলির উপর রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন।

ডাঃ স্থনের 'সান্ মিন্ চু-ই' অথবা জনগণের তিনটি নীতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মহাচীনের জাতীয়তাবোধের বিকাশ, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সৌকর্য্য সাধন এই তিনটি নীতির উদ্দেশ্য। এই শেষোক্ত কথাটিকে ডাঃ স্থন্ কখনও কখনও সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজ্ম্-এর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিতেন যে সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধিতা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহ দান করিয়া 'সান্ মিন্ চু-ই-র আদর্শকে বাস্তবে পরিণত কবিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

চীনের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিকে একতাবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে বাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন ডাঃ স্থন্ পরিকল্পিত জাতীয়তার উদ্দেশ্য। জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত মহাচীনের অধিবাসী-বৃন্দ চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কেবল মাত্র স্ব-স্ব পরিবার এবং গোষ্ঠির প্রতি অনুগত না থাকিয়া সমগ্র জাতির প্রতি তাহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং সেই কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হইবে। ডাঃ স্থন্ বুঝিয়াছিলেন যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হইলে চীন বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জের চাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

লোকায়ও রাষ্ট্র এবং সরকারের প্রতিষ্ঠা ডাঃ সুন্-পরিকল্পিত গণতন্ত্রের লক্ষ্য। একমাত্র এই ধরণের রাষ্ট্র এবং সরকারই জনকল্যাণে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ।

জীবনযাত্রার সৌকর্য্যসাধন বলিতে সুন্ বুঝিতেন দেশের শ্রমিক এবং অপরাপর বিত্তহীন সম্প্রদায়কে শোষণ এবং অন্যায় উৎপীড়ণের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা। তিনি বলিতেন যে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনপূর্ব্বক শ্রমিক এবং কৃষকদিগের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শক্তিশালী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে কৃষককে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে ("The land must belong to the tillers.")।

১৯২৪ সালে জাতীয় সম্মেলনের (The First National Convention) প্রথম অধিবেশনে চীনেব মুক্তির জন্য 'সান্ মিন্ চু-ই'-র ভিত্তিতে কার্য্যসূচী গৃহীত হয। এই অধিবেশনেই ক্যুওমিন্টাং এবং সাম্যবাদী দলেব মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত এবং সুগম হইয়াছিল।

'সান্ মিন্ চু-ই'-র সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার আদর্শ সাম্যবাদ-বিরোধী নহে। বিনা প্রয়োজনে বৈদেশিকগণের বিরুদ্ধাচরণ করাও ইহার উদ্দেশ্য নহে। চীনে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে অন্যান্য প্রগতিশীল এবং প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের সমকক্ষ করিযা তোলাই ইহার লক্ষ্য।

ডাঃ সুন্ বলিতেন যে অভিনব চীনরাষ্ট্র গঠন করিবার পথে পর পর তিনটি স্তর অতিক্রম করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীকে দেশে ঐক্য স্থাপনের জন্য সংগ্রাম করিতে এবং বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে সেই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার পর প্রচার

এবং সংগঠনে অভিজ্ঞ ক্যুওমিন্টাং সদস্যদিগকে ক্যুওমিন্টাং সৈন্যদলের অধিকৃত অঞ্চলসমূহে পাঠাইয়া জনসাধারণকে স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি শিক্ষাদান করিতে হইবে। এই শিক্ষাদান সমাপ্ত হইয়া যাইবার পর প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিয়া স্থানীয় রীতি-নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন করিতে এবং গণ-ভোট দ্বারা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সমগ্র চীনের অর্দ্ধেকের বেশী প্রদেশে যখন এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে তখন গণ-পরিষদ্ আহ্বান করা হইবে। এই পরিষদ্ সমগ্র চীনের জন্য একটি রাষ্ট্র-বিধি প্রণয়ন করিয়া দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তন করিবে।

স্থন্ ইয়াট-সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিকল্পিত প্রণালীতে কাজ হয় নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কোন কাজই যে হয় নাই এমন কথাও বলা চলে না। একদিক্ হইতে দেখিতে গেলে ডাঃ স্থন্-উল্লিখিত প্রথম স্তর অর্থাৎ যুদ্ধের যুগ এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। দ্বিতীয় চীন-বিপ্লবের যুগে (১৯২৬-২৭) রণ-নায়কগণের সহিত সংগ্রাম শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রতি-বিপ্লবী শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ফলে কম্যুনিষ্ট ও ক্যুওমিন্টাং দল আত্মঘাতী মরণমহোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। আবার ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্টাং এই দুই বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চীনের সহিত জাপানের জীবন-মরণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। প্রায় এক দশক স্থায়ী বিরতিহীন যুদ্ধজনিত ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ হইতে না হইতেই আবার কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং বিরোধের অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা গৃহ-যুদ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জন্যই স্বীকার করিতে হয় যে ডাঃ স্থন্-কথিত সংগ্রামের অধ্যায় এখনও শেষ হয় নাই।

কিন্তু তাহা হইলেও ইহার মধ্যেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং বিরোধ এবং সঙ্ঘর্ষের প্রথম হইতেই

এই দুই বিরোধী দল ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে রাজনীতির দিক্ হইতে সচেতন এবং সক্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জাপ-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন এই দুই দলের মধ্যে একটা আপোষ হয়, তখন শাসন-ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আংশিক কর্ত্তৃত্বের নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সময় গঠিত 'পিপল্স্ কাউন্সিল' (People's Council)-এর সহায়তায় জনসাধারণকে কার্য্যতঃ না হইলেও কাগজে কলমে শাসনকার্য্যসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে গৃহীত চীন রাষ্ট্র-বিধি পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক না হইলেও ইহা যে চীন-ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন যুগের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক তাহা অস্বীকার কারবার উপায় নাই।

ডাঃ সুনের চরমপত্রের একটি প্রধান কথা এই যে, "The revolution is not yet finished" অর্থাৎ "আজ পর্য্যন্তও বিপ্লব শেষ হয় নাই"। ১৯২৫ সালের ন্যায় আজ ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগেও এই উক্তির সত্যতা অনস্বীকার্য্য। বিগত ত্রয়োবিংশতি বৎসরে জাতীয় জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আবার অবস্থার অবনতিও ঘটিয়াছে। জাপ-যুদ্ধকালে এবং ইহারই ফলে চীন আইনের দৃষ্টিতে আন্তার্জ্জতিক ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমকক্ষতা লাভ করিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে এই সমকক্ষতা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় নাই; অদূরভবিষ্যতে যে স্বীকৃত হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছেনা। সুনের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা চীনের কোন কোন অঞ্চলে বাস্তবে রূপায়িত হইলেও অধিকাংশ স্থানে ইহা এখনও কল্পলোকেই রহিয়া গিয়াছে। তিনি যে ধরণের জাতীয় মহাসম্মেলন আহ্বান করিবার কথা বলিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত সেই প্রকার সম্মেলন আহূত হয় নাই। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেক

শাসন-বিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে পরিষদ্ আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা কোনক্রমেই জাতির সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সুন্ ইয়াট্-সেনের স্বপ্ন আজ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই

সাধারণতন্ত্র

১৯১২ সালে মহাচীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্র চীনে স্ব-স্ব প্রভাবাধীন অঞ্চলে (Sphere of influence) বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ যাহাতে অন্য কাহারও অপেক্ষা বেশী সুযোগ-সুবিধা না পায় সেই দিকে প্রত্যেকেরই সজাগ দৃষ্টি ছিল। ইহাদিগের পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত সুদূরপ্রাচ্যে শক্তি-সাম্য (Balance of Power) রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধকালে জার্ম্মানী, রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ম যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, তখন এই শক্তি-সাম্য নষ্ট হইয়া গেল। ইউরোপীয় প্রতিযোগিগণের বিপদের সুযোগে জাপান সুদূরপ্রাচ্যে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইল। যুধ্যমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কাহারও এই সময় জাপানের শক্তিবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করিবার, এমন কি প্রতিবাদ করিবার, ক্ষমতা পর্য্যন্ত ছিল না। অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু জাপানকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র যে অস্ত্রধারণ করিবে না জাপান তাহা ভাল করিয়াই জানিত। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের অরণ্যে রোদনই সার হইল; তাহার প্রতিবাদ উপেক্ষিত হইল।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই চীন নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়া সংগ্রামরত শক্তিসমূহকে জানাইয়া দিল যে, তাহার অধিকারের মধ্যে যেন কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত না হয়। এদিকে ১৯১১ সালের ইঙ্গ-জাপান সন্ধির সর্ত্তানুসারে

জাপান জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া সান্টুং প্রদেশের অন্তর্গত জার্মান-কর্তৃত্বাধীন কিয়াও-চাও (Kiao-chow) অধিকার করিল, এবং চীনের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া জার্মান এলাকার বাহিরে শতাধিক মাইল পরিমিত স্থান গ্রাস করিয়া বসিল। জাপানের এই দস্যুবৃত্তিতে সুদূর-প্রাচ্যে মোতায়েন ইংরেজ বাহিনী তাহার সহায় হইয়াছিল।

ইহার পর জার্মানী চীন হইতে তাহার সমুদয় সৈন্য অপসারিত করিল। পিকিং সরকার এখন দাবী করিলেন যে, ইংল্যাণ্ড এবং জাপান সদ্য-অধিকৃত অঞ্চল হইতে ইঙ্গ-জাপ বাহিনী সরাইয়া লইয়া তাহা চীন সাধারণতন্ত্রকে প্রত্যর্পণ করুক্। তদনুসারে ইংল্যাণ্ড তাহার সৈন্যদল সরাইয়া নিল। জাপান সৈন্যাপসারণ ত করিলই না, পক্ষান্তরে চীনের নিকট কুখ্যাত 'একবিংশতি দাবী' (Twentyone Demands) উপস্থিত করিল। এই দাবীগুলিকে নিম্নলিখিত পাঁচ দফায় ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় চীনের যে সমস্ত জায়গা জার্মানীর অধিকারে ছিল, জাপানকে তাহা দিতে হইবে। উপরন্তু সান্টুং প্রদেশে জাপানের রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

(২) দক্ষিণমাঞ্চুরিয়া এবং পূর্ব্বমঙ্গোলিয়াতে জাপান যাহা যাহা দাবী করে পূরণ করিতে হইবে।

(৩) চীনের সর্ব্ববৃহৎ লৌহকারখানা এবং লৌহ ও কয়লার খনি-সমূহের উপর চীন এবং জাপানের যৌথ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

(৪) চীনের উপকূল এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে জাপান ব্যতীত অপর কাহাকেও কোন বন্দর, উপসাগর বা দ্বীপের অধিকার দেওয়া চলিবে না।

(৫) চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহে জাপ উপদেষ্টা নিযুক্ত করিতে হইবে। এই দাবীগুলি গৃহীত হইলে

চীনের সার্ব্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইত এবং চীন প্রকৃত-প্রস্তাবে একটি জাপ-তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইত।[১]

ইউয়ান্ সি-কাই এই সময় চীন সাধারণতন্ত্রের কর্ণধার। জাপানের দাবী প্রত্যাখ্যান করিবার মত শক্তি বা সাহস তাঁহার ছিল না। ইচ্ছাও ছিল কিনা সন্দেহ। ১৯১৫ সালের ২৫শে মে সামান্য রদ-বদল এবং সংশোধনের পর পিকিং সরকার জাপানের দাবী মানিয়া লইলেন। পঞ্চম দফায় উত্থাপিত দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা ভবিষ্যতের জন্য মুল্‌তবি রাখা হইল।

১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে চীন মিত্রশক্তিপুঞ্জের পক্ষে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে যোগদান করে। চীনের নিরপেক্ষতার সুযোগ লইয়াই জাপান সান্টুং প্রদেশে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া চীনে তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিল। একাধিক কারণে চীন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিল। এই কারণগুলির মধ্যে মিত্রপক্ষের চাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীন মিত্রশক্তিগণের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ইহাদের পক্ষে চীন হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে শ্রমিক সংগ্রহের এবং চীনের বিভিন্ন বন্দরে অন্তরীণ শত্রুপক্ষীয় জাহাজগুলিকে নিজেদের কাজে লাগাইবার পথে কোন বাধাই থাকে না। এই জন্যই ইহারা চীনকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিতেছিল। ইউয়ান্ সি-কাই-এর সহকারী

১। "......Would have virtually deprived the Chinese Government of the substance of control over its own affairs. The employment of effective Japanese advisers in political, financial and military affairs; the joint Chino-Japanese organisation of the police forces in important places; the purchase from Japan of a fixed amount of munitions of war—50 per cent or more; and the establishment of Chino-Japanese jointly worked arsenals, were embraced in these demands. The latter involved effective control over the armament and military organisation of China."—*American Diplomat in China* by P. S. Reinsel, P. 134.

টুয়ান্ চি-জুই (Tuan Chi-jui)-এর মতলব ছিল অন্য প্রকার। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, যুদ্ধঘোষণা করিয়াই তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যয় করিবার অজুহাতে জাপানের নিকট হইতে টাকা ধার করিবেন এবং সেই টাকা দ্বারা প্রতিক্রিয়াপন্থী পিকিং সরকারের পক্ষ হইতে প্রগতিশীল দক্ষিণচীনের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। যুদ্ধঘোষণা করিবার পর জাপান সানন্দে টুয়ান্ চি-জুইকে প্রত্যাশিত ঋণ দিয়াছিল। বিনিময়ে তিনি জাপানকে সান্টুং-এ রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। যে কোন উপায়ে চীনের গৃহ-যুদ্ধ জিয়াইয়া রাখা ছিল জাপানের উদ্দেশ্য। খণ্ড, ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত চীনে জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

মিত্রপক্ষের চাপ ব্যতীত চীনের যুদ্ধে যোগদান করিবার আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। চীন আশা করিয়াছিল যে, যদি সে মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে যুদ্ধান্তে আহূত শান্তি-বৈঠকে জাপানকে সান্টুং এবং দক্ষিণমাঞ্চুরিয়া হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু চীনের এই আশা সফল হয় নাই। রাষ্ট্রপতি উইল্সন প্রথম প্রথম চীনের দাবী সমর্থন করিলেও, যুদ্ধের পূর্ব্বে সান্টুং-এ জার্ম্মানীর যে সমস্ত অধিকার ছিল ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯) অনুসারে শেষ পর্য্যন্ত তাহা জাপানকেই দেওয়া হইল। ক্ষুব্ধ এবং নিরাশ চৈনিক প্রতিনিধিগণ সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন।

মনের অগোচর পাপ নাই। ভার্সাই সন্ধিতে যে চীনের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে মিত্রবর্গের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। এই অন্যায়ের আংশিক প্রতীকারের উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে ওয়াশিংটনে নবশক্তি-সম্মেলন (Nine Power Conference) আহূত হইল। চীন, জাপান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, পর্ত্তুগাল, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম এবং যুক্তরাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল। পরবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে এই সমস্ত রাষ্ট্র এক সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধিতে ভবিষ্যতে চীনের

সার্ব্বভৌমিকতা, স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করিবার এবং তাহার শাসন-ব্যবস্থায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল ("to respect the sovereignty, the independence and the territorial and administrative integrity of China.")।

এদিকে চৈনিক প্রতিনিধিদলের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তাবলী প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। অক্ষম পিকিং সরকারের অনাচার এবং অব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ-মানসের দীর্ঘকাল-সঞ্চিত ক্রোধ এবং বিরক্তি আর বাঁধ মানিল না। এই অন্যায় এবং অপমানজনক সন্ধি দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল। এই সময় একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলন একাধারে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। "৪ঠা মে'র আন্দোলন" নামে পবিচিত এই আন্দোলন বিদ্যুৎগতিতে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার ফলে একদিকে যেমন ক্যুওমিন্‌টাং দলের অন্তর্ভুক্ত বিপ্লবী শক্তিগুলি প্রবলতর হইয়া উঠিল, অপর দিকে তেমনই আবার চৈনিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সূচনাও হইল।

ক্যুওমিন্‌টাং দলভুক্ত নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় এবং বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহযোগিতায় পিকিং-এ "৪ঠা মে'র আন্দোলন" আরম্ভ হইল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া ছাত্রসমিতি গঠিত হইল। এই সমস্ত সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া "৪ঠা মে'র আন্দোলনের" সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান পিকিং ছাত্রসমিতি গঠিত হইল। আধুনিক চীনেব ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবিয়া সরকারী নীতি এবং ব্যবস্থার গলদ দূর কবিবাব চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং দলের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য চীনের ছাত্রসমাজ আজও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। জাতির রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ মহাচীনের ছাত্রসমাজের পক্ষে অবশ্য

নূতন নহে। হান্, স্থং এবং মিং যুগেও চীনের ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় কলুষিত শাসন-ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছে।

মহাচীনের ছাত্রসমাজের প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির কথা জাপানের খুব ভাল করিয়াই জানা আছে। সেইজন্যই বিগত জাপ-যুদ্ধকালে জাপান বোমাবর্ষণ করিয়া চীনের যাবতীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

পিকিং-এ "৪ঠা মে'র আন্দোলনের" সূত্রপাতেই পররাষ্ট্রসচিব চ্যাং স্থং-সিয়াং (Chang Tsung-hsiang)-কে আক্রমণ করা হইল। লাঠি, লোহার ডাণ্ডা, পেট্রল ইত্যাদি লইয়া প্রায় ৩,০০০ ছাত্র চ্যাং-এর বাড়ীতে হানা দিল। তিনি তখন তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে ছিলেন। খোঁজ পাইয়া ছাত্রগণ সেইখানে উপস্থিত হইল। চ্যাংকে ধরিয়া বেদম প্রহার করা হইল। যে বাড়ীতে তাঁহাকে পাওয়া গেল তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনার জন্য কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ছাত্রগণের গ্রেপ্তার এবং সরকারী পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদে দেশময় ব্যাপক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইল। এই ধর্ম্মঘটে পিকিং-এর ছাত্রসমাজই অগ্রণী হইয়াছিল। দোকানদার এবং বণিক্‌গণও ছাত্রদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ইহার পর রেলের কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মঘটের হুম্‌কি দেওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের হুঁস হইল। চ্যাং এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের মধ্যে অনেকে পদচ্যুত হইলেন।

সঙ্ঘবদ্ধ ছাত্রশক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের এই সফলতা সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় এতদিন অন্ধভাবে কনফ্যুসিয়াসের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আসিতেছিলেন। এইবার তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে এতকাল তাঁহারা ভুল পথে চলিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে না পারিলে চীন কোন দিনই শক্তিশালী হইবেনা বা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবে না।

শক্তি এবং আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদালাভের জন্য রাজনৈতিক সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই সময় চীনে একটি অভিনব সংস্কৃতি-আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলন "সাহিত্যিক পুনরুজ্জীবন" (Literary Renaissance) বা "অভিনব সভ্যতা আন্দোলন" (New Civilisation Movement) নামে পরিচিত। আমরা পূর্ব্বেই এই আন্দোলনের কথা বলিয়াছি। টলষ্টয় (Tolstoy), ইব্‌সেন (Ibsen), মোপাসাঁ (Maupassant), বায়রণ (Byron), শেলি (Shelly), মার্ক্‌স্ (Marx), এঙ্গেল্‌স্ (Engels) প্রভৃতি সাহিত্য-রথী এবং চিন্তা-গুরুদিগের রচনাবলীর চীনভাষায় অনুবাদ এই আন্দোলনের একটি প্রধান ফল।

"সাহিত্যিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের" প্রবর্ত্তক এবং প্রধান নেতা ডাঃ হুসি (Dr. Hu Shih) যে কেবলমাত্র বৈদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে উৎসাহ দিয়াছেন এমন নহে। চীনভাষায় জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টি করিবার কৃতিত্ব এবং গৌরবও তাঁহারই প্রাপ্য। এই আন্দোলনের ফলে কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল। ফলে কেবলমাত্র জনসাধারণই উপকৃত হয় নাই, চীনের সাহিত্যও সরস, সমৃদ্ধ, এবং প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। আন্দোলনের ফলে কেবল অনুবাদ-সাহিত্যই রচিত হয় নাই। আধুনিক যুগে চীনভাষায় রচিত উচ্চাঙ্গের মৌলিক সাহিত্যও "সাহিত্যিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের" দান। অভিনব প্রাণের প্রাচুর্য্যে তরুণচীন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। দেশময় এক ভাব-বন্যার প্লাবন বহিয়া গেল।

মহাচীনের নারী-প্রগতি "সাহিত্যিক পুনরুজ্জীবন" বা "অভিনব সভ্যতা আন্দোলনের" প্রথম এবং অপর একটি প্রধান ফল। ইহার ফলে মানুষের সৃষ্ট যাবতীয় অন্যায় এবং অস্বাভাবিক বিধি-নিষেধের বন্ধন হইতে নারী মুক্তিলাভ করিয়াছে। নারী এতদিন গৃহ-কোণে বদ্ধ ছিল। অন্তঃপুরের প্রাচীর নারী এবং বাহির-বিশ্বের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছিল।

ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা হইতেই দেশে সহ-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং কোন কোন আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুল-কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের মধ্যে দূরত্বের প্রাচীরকে বহুদিন পর্য্যন্ত সযত্নে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের বেগ ক্ষিপ্রতর এবং প্রভাব বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িল। জাতীয় জীবনে নারী আসিয়া পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইল। পুরুষের "যামিনীর নর্ম্ম-সহচরী" নারী তাহার "দিবসের কর্ম্ম-সহচরী"তে রূপান্তরিতা হইল। বিগত জাপ-যুদ্ধকালে চীন-নারী কারখানায় শ্রমিকের কাজ করিয়াছে, গীত, অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং অক্ষর-জ্ঞানবর্জ্জিত কৃষকদিগের মধ্যে যুদ্ধের অনুকূলে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। বহু নারী চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারিণীর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বহু আশ্রয়-কেন্দ্র পরিচালনা করিয়াছে। গোরিলা যুদ্ধেও চীন-নারী একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

অভিনব ভাবধারার নিষেকে জাতি-মানস সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবার পর প্রগতিশীল প্রত্যেক চীন নাগরিক উপলব্ধি করিলেন যে, বলপ্রয়োগ ব্যতীত প্রতিক্রিয়াশীল পিকিং সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যাইবে না। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিলেন যে বলপ্রয়োগে শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহায্য পাইলেই চলিবে না। জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন এবং সহযোগিতাও লাভ করিতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত কৃষক এবং শ্রমিকদিগের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারার প্রচার বা তাহাদিগকে বিপ্লবের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন চেষ্টা করা হয় নাই। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় শ্রমিক এবং কৃষকদিগের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার এখন অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

১৯২৪ সালে কুয়োমিন্‌টাং দলের সহিত সাম্যবাদীদিগের একটা আপোষ হইল। উভয় দলই যাহাতে প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই আপোষ করা হইয়াছিল। ইহাদের যুক্ত নেতৃত্বে চীনের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-আন্দোলন এবং অন্যত্র কৃষক-আন্দোলন প্রসার লাভ করিল। শ্রমিক-আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত হইল। বিনা রক্তপাতে এই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল মনে করিলে খুবই ভুল করা হইবে। অন্যান্য দেশের ন্যায় চীনেও শ্রমিক-আন্দোলনের অগ্রদূতগণের মধ্যে কয়েকজনকে শ্রেণী-স্বার্থের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল।

১৯২৫ সালের মে মাসে সাংহাই বন্দরের একটি সুতার কলের আট জন শ্রমিক তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা কলের জাপানী মালিককে জানায়। সামান্য শ্রমিকের এই অবাধ্যতা (!) এবং বেয়াদবি (!) ম্যানেজারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইল। তিনি প্রতিনিধিদলের নেতা কু চেংহুং (Ku cheng-hung)-কে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলেন এবং বাকী সাত জনকে সাংহাই-র ইংরেজ পুলিসের হস্তে সমর্পণ করেন। এই সংবাদে স্থানীয় ছাত্র এবং শ্রমিকদিগের মধ্যে অতিশয় উত্তেজনার সঞ্চার হইল। উপরোক্ত শ্রমিকদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ছাত্র এবং শ্রমিকদিগের একটি বিরাট জনতা সাংহাই-র ইংরেজ উপনিবেশের প্রধান রাস্তাগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। তত্রত্য শিখ পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শন-কারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। সাত জন ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হইল।

এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়িবার পর দেশময় এক প্রবল ইঙ্গ-জাপ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইহারই নাম "৩০শে মে'র আন্দোলন" (May 30th Movement)। চীনের ছাত্রসমাজ এই আন্দোলন পরিচালনা

করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। বড় বড় সহরের অনেকগুলিতেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই সময়ে ক্যাণ্টনে অনুষ্ঠিত শ্যামিন হত্যাকাণ্ড (Shameen massacre) সভ্য মানুষের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় অপকীর্ত্তি। ক্যাণ্টনের পার্ল নদীতে অবস্থিত ইংরেজ, ফরাসী এবং জাপ যুদ্ধজাহাজ হইতে তত্রত্য বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। এই অগ্নিবৃষ্টির ফলে ৫২ জন নিহত এবং তাহার অনেক বেশী লোক আহত হয়।

এই ভাবে ইংল্যাণ্ড এবং চীনের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়, দুই বৎসর পর হ্যাঙ্কো এবং কিউ-কিয়াং-এ ইংরেজ এবং চীনদেশীয় লস্করদিগের মধ্যে সংঘর্ষের পর তাহার অবসান হয়। ইংরেজগণ কোন কোন বিষয়ে চীনকে সামান্য সুবিধা দিতে সম্মত হইলেন। ক্যুওমিনটাং নেতৃবৃন্দ মনে করিলেন যে বিবাদে চীন জয় লাভ করিল।

কম্যুনিষ্টগণ একেবারে প্রথম হইতেই সাম্রাজ্যাধিকারী জাতিগুলির সহিত কোন আপোষ-নিষ্পত্তি করা বা তাহাদিগকে কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিরোধী। এইখানেই কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিনটাং দলের মধ্যে আদর্শ-গত একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯৩৫ সালে সাংহাইতে সঙ্ঘটিত ঘটনাবলীর বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহাদিগের নীতি এবং আদর্শগত পার্থক্য ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিয়া কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিনটাং গৃহ-যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল। ১৯২৭ সালেই এই দুই দল পরস্পরের সহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল। ইহার পর ইহাদিগের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবেই শত্রুতা আরম্ভ হইয়া গেল। প্রায় ১০ বৎসরকাল চিয়াং কাই-শেক-পরিচালিত ক্যুওমিনটাং সরকার অভিযানের পর অভিযান প্রেরণ করিয়া কম্যুনিষ্টদিগকে পিষিয়া মারিবার বৃথা চেষ্টায় যথেষ্ট শক্তির অপচয় ঘটান। ক্যুওমিনটাং দলের নীতি দিনের পর দিন প্রগতি-বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯২৭ সাল হইতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের

পদলেহন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সংশ্রব বর্জ্জন ক্যাওমিন্টাং নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্যাওমিন্টাং পররাষ্ট্রনীতির এই ধারা আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। এদিকে কম্যুনিষ্টগণ সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন বা সহযোগিতা করিতে একান্তই অনিচ্ছুক। কম্যুনিষ্ট এবং ক্যাওমিন্টাং দলের নীতি এবং আদর্শের এই মৌলিক পার্থক্য দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের যুগে উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক মৈত্রী সত্ত্বেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে সজীব এবং সক্রিয় ছিল।

কম্যুনিষ্ট-ক্যাওমিন্টাং বিরোধ রাজনীতিক্ষেত্রে অশুভ ফল প্রসব করিলেও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যে এই বিরোধ সুফলপ্রসূ হইযাছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কম্যুনিষ্টগণ সোভিয়েট-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাহার অনুকরণের পক্ষপাতী। সাংহাই এবং অন্যান্য বহু স্থানে কম্যুনিষ্টদিগের উৎসাহে সর্ব্বহারাদের সুখ-দুঃখ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল। আধুনিক রুশীয় লেখকদিগের এবং সর্ব্বহারাদিগের সম্বন্ধে লিখিত মার্কিণ গ্রন্থকারদিগের রচনাবলী চীনভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। তরুণ ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত লেনিন (Lenin), ট্রট্স্কি (Trotsky), পুখালিন (Pukhalin), প্লেখানভ্ (Plekhanov), বোগ্ডানভ্ (Bogdanov), আপ্টন সিন্ক্লেয়ার (Upton Sinclair)-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে এবং চীনের সর্ব্বহারাদের কাহিনী অবলম্বনে মৌলিক গল্প ও উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিল তাহা চীনের সাধারণ মানুষের জীবনের আলেখ্য স্বরূপ এবং প্রকৃত গণ-সাহিত্য পদবাচ্য। পূর্ব্বে যে 'সাহিত্যিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের' কথা বলা হইয়াছে এই ভাবে তাহার পূর্ণ পরিণতি সাধিত হইল।

এই সাহিত্যিক আন্দোলনের ফলে অনেক তরুণ কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিলেন। অনেকে আবার এই দলভুক্ত না হইয়াও সাম্যবাদী আদর্শের

প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। জাগ্রত তরুণচীনের তারুণ্যের নিকট সাম্যবাদের অভিনবত্বের এবং তাহার মানবতার নিকট সাম্যবাদের মূল আদর্শের আবেদন ব্যর্থ হইল না।[১] এদিকে রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ক্যুওমিন্‌টাং দলের কবলিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে কিছুকাল পর্য্যন্ত ক্যুওমিন্‌টাং সরকার সাম্যবাদের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না। কিন্তু সরকার একবার যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সাম্যবাদী ভাবধারা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে এবং চীনের জনসাধারণ ক্রমেই সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তখন চণ্ডনীতির সহায়তায় সাম্যবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সরকারী আদেশে কয়েকটি পুস্তকের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কয়েকজন অবাঞ্ছিত (!) গ্রন্থকারকে গ্রেপ্তার করা হইল। অনেকে দেশত্যাগ করিয়া সাময়িকভাবে জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সরকারী রুদ্রনীতি এইভাবে জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টাকে বহুলাংশে ব্যাহত করিয়া দিল। গণ-সাহিত্য সৃষ্টি-প্রচেষ্টার পাল্টাজবাবে ক্যুওমিন্‌টাং সরকারের উৎসাহ ও সমর্থনে এই সময় একটি নূতন আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলন 'থ্রি পিপ্‌ল্‌স্‌ লিটারেচার' (Three People's Literature) নামে অভিহিত।

কম্যুনিষ্ট-অধিকৃত অঞ্চলে নূতন নূতন সামাজিক প্রচেষ্টার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। এই যুগের প্রগতিশীল এবং জনসাধারণের কল্যাণসহায়ক যাবতীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কৃতিত্ব সাম্যবাদীদিগের প্রাপ্য। সাম্যবাদের প্রসার এবং সাম্যবাদিগণের দলপুষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে এই সময়ে 'নবজীবন আন্দোলনের' (New Life Movement) সূচনা হয়। চিয়াং

১। "Its novelty appealed to their youth and its basic principle to their humanity."—*A Short History of Chinese Civilisation* by Tsui Chi, p. 263.

কাই-শেকের কথায় বলিতে গেলে জাতীয়-চেতনাব জাগরণ ঘটাইয়া অভিনব গণ-মনোভাব সৃষ্টি করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।[১] শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, ন্যায়পরায়ণতা এবং সততার আদর্শে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা এই আন্দোলনের লক্ষ্য। 'নবজীবন আন্দোলনের' ভাবধারা প্রসার লাভ করিবার ফলে আধুনিক চীনসমাজে অহিফেন এবং তাম্রকূটসেবন দূষণীয় বলিয়া মনে করা হয়।[২] এই আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর কিছু দিনের মধ্যেই প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য নিষিদ্ধ হইয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগকে অনাড়ম্বর পোষাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করা হইল। সবকারী কর্মচারীদিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি দূর্নীতিমূলক আচরণ বহুলাংশে দূরীভূত হইল। দবিদ্র ব্যক্তিদিগের গৃহে যাইয়া সেগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার এবং তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তাবেব চেষ্টা চলিতে লাগিল। এদিকে চিয়াং কাই-শেকের অধীনে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকাব স্থাপিত হওয়ার ফলে দেশে মোটামুটি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসাধারণের একাংশের জীবনযাত্রাব মানও পূর্ব্বের তুলনায় উন্নত হইয়া উঠিল।

১। "..........to promote a new national consciousness, and mass psychology."

২। *A Short History of Chinese Civilisation* by Tsui Chi, P. 264.
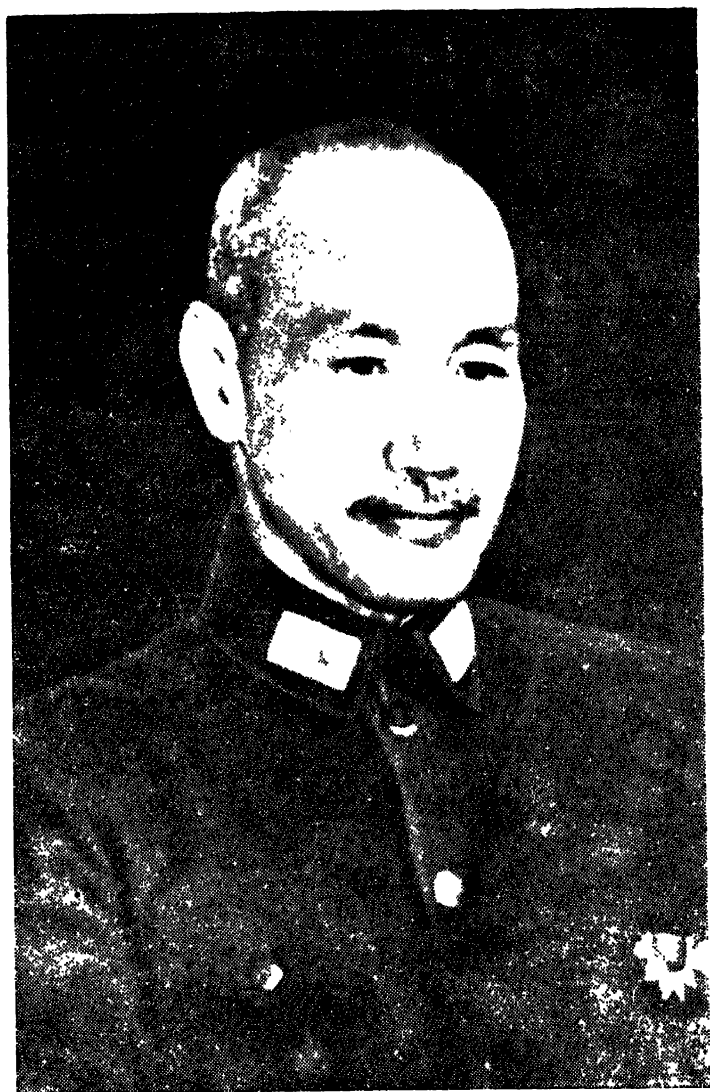
জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেক

চিয়াং কাই-শেক

১৯২৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত চীন এবং তাহার বর্ত্তমান ভাগ্য-বিধাতা চিয়াং কাই-শেকের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই জন্যই চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে হইলে চিয়াং কাই-শেক সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

চিয়াং কাই-শেকের অন্যতম জীবন-চরিত লেখক জাপান দেশীয় ইশিমুরা টোটারো (Ishimura Totaro) বলেন, "Chiang Kai-shek is really great. He is greater than the two European dictators. Although he is the leader in resisting Japan and in recovering Manchuria, and thus offers an obstacle to the advance of Japanese influence, no Japanese could refuse to acknowledge his greatness" অর্থাৎ চিয়াং কাই-শেক প্রকৃতই মহান্। ইউরোপের দুই জন এক-নায়ক (হিট্‌লার এবং মুসোলিনী) অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ। যদিও তিনি জাপানকে প্রতিরোধ করিয়া মাঞ্চুরিয়ার পুনরুদ্ধার সাধন করিতেছেন এবং জাপপ্রভাব বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন তথাপি কোন জাপানবাসীই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিতে পারে না।

১৮৮৭ সালে দক্ষিণচীনের চেকিয়াং (Chekiang) প্রদেশের অন্তর্গত ফেং-হুয়া (Feng-hua)-তে চিয়াং কাই-শেক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে চিয়াং পিতৃহীন হ'ন। তাঁহার মাতা শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও এই মহীয়সী নারী পুত্রের শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। পিতৃবিয়োগের বৎসরই চিয়াং বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। তখনও মাঞ্চু রাজবংশের পতন হয় নাই এবং দু'একটি শিক্ষা-কেন্দ্র ব্যতীত

কোথাও যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। চিয়াং প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই চিয়াং সৈন্যদলে যোগদান করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি পাওটিং (Paoting) সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি ইউয়ান্ সি-কাই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পাওটিং বিদ্যালয়ে চিয়াং-এর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের ফলে চিয়াং ইউয়ানের পরিকল্পনা, তাঁহার প্রসাদপ্রার্থিগণের ষড়যন্ত্র এবং মাঞ্চু দরবারের দুর্নীতির কথা জানিতে পারেন। এই বিদ্যালয়ে অবস্থানকালেই তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে স্বদেশ এবং স্বজাতির মঙ্গল ও উন্নতির জন্য বিপ্লব অপরিহার্য্য।

১৯০৭ হইতে ১৯১০ সাল এই চারি বৎসরকাল চিয়াং জাপানে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে প্রথম চীন-বিপ্লব আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্রোহীদিগের দলে যোগদান করেন। তাঁহাকে একটি বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রথম প্রথম তৎপরিচালিত বাহিনী সর্ব্বত্র জয়লাভ করে। অবশেষে তাঁহার প্রাক্তন শিক্ষাগুরু ইউয়ান্ সি-কাই এই বাহিনী ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন।

১৯২১ সালে ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেন কর্ত্তৃক ক্যাণ্টনে ক্যুওমিন্টাং সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চিয়াং কাই-শেক সুনের শরীররক্ষী বাহিনীর অধ্যক্ষ, ক্যাণ্টন সরকারের সামরিক পরামর্শদাতা এবং ডাঃ সুনের সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে সুনের প্রতিনিধিত্ব করিবার ভারও এই সময় তাঁহার উপর অর্পিত হয়। তিনি সুন্‌কে পিতা এবং গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯২২ সালে চেন্ চিউং-মিং (Chen Chiung-ming) নামক বিপ্লবী বাহিনীর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বিদ্রোহী হইলেন। ডাঃ সুন্‌কে হত্যা করিবার

উদ্দেশ্যে তিনি ক্যাণ্টনে তাঁহার আফিসে হানা দেন্। এই বিপদের সময় চিয়াং কাই-শেকের অধীন সৈন্যদলের সহায়তায় স্নেব প্রাণরক্ষা হয়। তিনি প্রথমে ক্যাণ্টনের পার্ল নদীতে নোঙ্গর কবা একখানা বৈদেশিক জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ জাহাজে কবিযাই তিনি হংকং যান এবং পরে তাহা অপেক্ষাও নিরাপদ সাংহাই বন্দবেব আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশে চলিয়া যান।

১৯২৪ সালে ক্যাণ্টনের বণিক্‌গণেব বিরোধিতা বিপ্লব-আন্দোলন এবং বিপ্লবী সরকারকে বিপন্ন কবিযা তুলিল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ডাঃ স্নেব অনুসৃত প্রগতিশীল নীতির ফলে সেখানকাব প্রতিক্রিয়াপন্থী বক্ষণশীলগণ বিরক্ত এবং ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এদিকে ডাঃ স্নেব স্বাস্থ্য তখন ভাঙ্গিযা পড়িয়াছে। ঠিক এই সমযেই উত্তব চীনের বণ-নাযকগণ বিপ্লবী-দিগের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী জেনাবেল উ পে-ফু-ব শক্তি চূর্ণ কবেন। ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ চীনেব মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবাব সম্ভাবনা দেখা দিল। সমগ্র চীনের জন্য একটি কেন্দ্রীয সবকাব প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইযা ডাঃ স্নন্ পিকিং যাত্রা করিলেন। এইখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পবিত্যাগ কবেন।

পিকিং-এ ডাঃ স্নন্ যখন মৃত্যু-শয্যায় শাযিত, চিয়াং কাই-শেক তখন দক্ষিণচীনে ক্যাণ্টন সরকারের বিরোধীদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই যুদ্ধ সংক্রান্ত সত্য মিথ্যা বহু গুজব রাষ্ট্র হইতেছিল। একবার শোনা গেল যে বিরোধী দলের হাতে চিয়াং কাই-শেক নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া স্নন্ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পডিযাছিলেন। অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি বলিযাছিলেন যে চিযাং কাই-শেকের মৃত্যু অপেক্ষা একটি সমগ্র বাহিনীর বিনাশ অধিকতর বাঞ্ছনীয়।[১] অতি

১। "Alas! I would rather have lost a hundred thousand troops than this Kai-shek of mine."

অল্পকালের মধ্যেই দক্ষিণচীনের বিদ্রোহ দমন করা হইল। এই বিদ্রোহ দমনে চিয়াং প্রধানতঃ ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হোয়াম্পোয়া সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিকগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান চীনের খ্যাতিমান্ সেনানায়কদিগের মধ্যে অনেকেই এই হোয়াম্পোয়ার প্রাক্তন ছাত্র। ১৯২৩ সালে সামরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য চিয়াং মস্কোতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ডাঃ সুনের নির্দ্দেশে তিনি হোয়াম্পোয়া বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হ'ন।

ডাঃ সুনের মৃত্যুর পর বৎসর (১৯২৬) ক্যাণ্টন সরকার চিয়াং কাই-শেককে বিপ্লবী গণ-বাহিনীর (People's Revolutionary Army) অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই চীনে 'দ্বিতীয় বিপ্লব-যুগের' (Second Revolution) সূচনা হইল। চীনের মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যাধিকারী বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জের সহিত সংগ্রাম এবং রণ-নায়ক, কুসীদজীবী ও বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের শক্তি চূর্ণ করিয়া আমলাতন্ত্রের বিলোপ সাধন এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্যাণ্টন সরকার গণ-বাহিনী গঠন, সমদর্শী রাষ্ট্র-বিধি প্রবর্ত্তন, জাতীয় শিল্প-সংরক্ষণ এবং কৃষক ও শ্রমজীবী-সংগঠন সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য বিবিধ প্রস্তাব করিলেন।

চীনের এই দ্বিতীয় বিপ্লবে প্রবাসী চৈনিকগণের সাহায্যের পরিমাণ মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। অর্থসাহায্য এবং রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ দ্বারা তাঁহারা ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তায় প্রগতিশীল ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া মহাচীনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিপুষ্টি এবং পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

প্রবাসী ভারতীয়গণের ন্যায় পূর্ব্বে প্রবাসী চৈনিকদিগের প্রতিও সর্ব্বত্রই বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইত। এখনও কোন কোন দেশে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইঁহাদিগের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ ইহারই ফলে তাঁহাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে চীন প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়া শক্তিমান্ না হইলে বিশ্বের দরবারে তাহার মর্য্যাদার আসন স্বীকৃত হইবে না। দেশে ফিরিয়া ঘুণধরা রাজতন্ত্র এবং মান্ধাতার আমলের সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে বাস করিতে ইঁহাদিগের ঘোরতর আপত্তি ছিল। চীনের প্রচলিত অর্থনৈতিক সংগঠনের আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত তাঁহাদের প্রবাসে উপার্জ্জিত অর্থ এবং অর্জ্জিত শিল্পকৌশল ও যান্ত্রিক জ্ঞানের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। আজও কি তাহা সম্ভব?

১৯২৬ সালেব জুলাই মাসে চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে ক্যুওমিন্-টাং বাহিনীব উত্তবচীনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কোয়ান্‌টুং-এব উত্তবে অবস্থিত কিয়াংসি এবং হুনান অধিকার কবিলেন। স্বন্-প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সরকাবের রাজধানী এবং বিপ্লবের প্রাণ-কেন্দ্র ক্যাণ্টন কোয়ান্‌টুং-এরই প্রধান নগর। এই কোয়ান্‌টুং ববাবরই বিপ্লবে বিশ্বাসী এবং বৈপ্লবিক আদর্শেব প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হুনান হইতে চিয়াং কাই-শেক হুপে প্রদেশে প্রবেশ করেন। হ্যাঙ্কোর অনতিদূরে উ পে-ফু'ব সৈন্যদলেব সহিত চিয়াং-এর চারদিন অবিরাম যুদ্ধ হয়। ইয়াংসি উপত্যকার রণ-নায়কগণের মধ্যে উ-ই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। হ্যাঙ্কোর যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যদল প্রায় সমূলে ধ্বংস হইল। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের সীমা নির্দ্দেশক ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে অবস্থিত প্রায় সমস্ত শহরই ক্যুওমিন্‌টাং জাতীয় বাহিনীর হস্তগত হয়।

ইতোমধ্যে মহাচীনের জাতীয় জীবনে এক ভয়াবহ দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। উ পে-ফু-র সহিত শক্তি পরীক্ষার পূর্ব্বেই কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং দলের মতান্তর মনান্তরে এবং মনান্তর শত্রুতায় পরিণত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা।

বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব

১৯২০ সালে চীনে সাম্যবাদের গোড়াপত্তন হয়। সমাজতন্ত্রবাদ এবং মার্ক্‌স্‌বাদ আলোচনার জন্য ঐ বৎসর বুদ্ধিজীবীদিগের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে ক্যাণ্টনে আহূত 'সমাজতান্ত্রিক যুব-সঙ্ঘের' (Socialist Youth League) তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন এই সঙ্ঘকে 'থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের' (Third International) শাখায় পরিণত করিয়া 'চীনের সাম্যবাদী দল' (Chinese Communist Party) নাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা এই সময় পাঁচ-ছয় শতের অধিক ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও সাম্যবাদী দলেব প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৯২৩ সালে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের সাম্যবাদী দল গঠিত হওয়ার এক বৎসব পূর্ব্বে যখন স্থন্ ইয়াট-সেন সোভিয়েট রাষ্ট্রেব সহিত মৈত্রী স্থাপন কবেন, তখনই মহাচীনের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী দল একটি অনুপেক্ষণীয় শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং এই উভয় দলই তখন চীনে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে সমান আগ্রহশীল। ১৯২৪ সালে বরোডিনের পরামর্শে স্থন্ ক্যুওমিন্‌টাং দলকে রুশীয় আদর্শে একেবারে নূতন কবিয়া গঠন করেন। এতদিন ক্যুওমিন্‌টাং দল কম্যুনিষ্টগণের আদর্শ এবং কার্য্যকলাপের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করিত না। কিন্তু এই সময় ইহাদের মধ্যে মতানৈক্যের অবসান ঘটে। স্থন্ ইয়াট-সেনের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সাম্যবাদিগণ নিজেদের পৃথক্ সংগঠন বজায় রাখিয়া ক্যুওমিন্‌টাং দলে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় চীন-বিপ্লব নামে পরিচিত যে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান পিকিং-এর স্বেচ্ছাচারী এক-নায়কত্বের অবসান ঘটাইয়াছিল তাহার সংগঠন এবং পরিচালনায় কম্যুনিষ্টগণ একটি বিশিষ্ট গৌরবময় এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাঃ স্নন্ ইয়াট-সেন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ক্যুওমিন্টাং দল চীনের সাম্যবাদী দলের দুইটি প্রধান বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ার ফলেই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং মিলন সম্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণ করিয়া ইহাকে জয়যুক্ত না করা পর্য্যন্ত চীনের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক সার্ব্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত। আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র এবং রণ-নায়কদিগের বিরুদ্ধে অভিযান এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতারই অপরিহার্য্য অঙ্গ। ভূস্বামী এবং রণ-নায়কদিগের ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে মহাচীনের রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন এই নীতির লক্ষ্য।

অন্যান্য দেশের সাম্যবাদিগণের ন্যায় চীনের সাম্যবাদী দলও বিশ্বাস করে যে সাম্যবাদী আদর্শকে রূপ-প্রতিষ্ঠ করিবার পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত-পরিচালিত গণতান্ত্রিক বিপ্লব অপরিহার্য্য। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া চীনের সাম্যবাদী দল কোনক্রমেই স্বীয় আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। সাম্যবাদিগণের এই আন্দোলনে যোগদান বরং ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সহায়কই হইয়াছে।

মহাচীনের পরম দুর্ভাগ্য যে ১৯২৫ সালে ডাঃ স্নের মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও তিনি যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। আজ ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগেও তাঁহার সাধনা অসিদ্ধই রহিয়া গিয়াছে। তিনি যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন আজও তাহাতে পূর্ণাহুতি দেওয়া হয় নাই। স্নের মৃত্যুর দুই বৎসর পর ১৯২৭ সালে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ক্যুওমিন্টাং-এর দক্ষিণ শাখা (Right Wing) তখন সম্পূর্ণরূপে প্রগতি-বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিয়াছে। স্নন্

ইয়াট-সেনের মৃত্যুর পর হইতেই ক্যুওমিন্‌টাং-এর রক্ষণশীল দক্ষিণ শাখা এবং প্রগতিশীল বাম শাখার (Left Wing) মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ চলিতে থাকে। কখনও বামপন্থী কখনও বা আবার দক্ষিণপন্থীগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেন। ১৯২৬ সালে চিয়াং কাই-শেকের ক্যাণ্টন সরকারের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চিয়াং বরাবরই দক্ষিণপন্থী। ক্ষমতা লাভ করিবার পর তিনি খোলাখুলি ভাবেই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ঈর্ষ্যা সত্বেও কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং দল আরও কিছুকাল পরস্পরের সহযোগিতা করিয়াছিল। এই বৎসরই রণ-নায়ক সম্প্রদায়ের শক্তি চূর্ণ করিয়া সমগ্র চীনকে বিপ্লবী সরকারের শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া সমগ্র চীনের জন্য একটিমাত্র জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ক্যাণ্টনবাহিনীর উত্তরাভিমুখীন অভিযান আরম্ভ হইল। সমগ্র বিশ্বের শক্তিহীন, নিপীড়িত ও শোষিত মানবতার সশ্রদ্ধ এবং সাম্রাজ্যাধিকারী, পররাজ্যলোলুপ রাষ্ট্রপুঞ্জের ঈর্ষ্যা এবং ভীতি মিশ্রিত দৃষ্টি অতি অল্পকালের মধ্যেই জাগ্রত চীনের এই বিস্ময়কব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ কিন্তু খুব সামান্যই হইয়াছিল। বিপ্লবী বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। আত্ম-কলহে বিব্রত, শতধাবিভক্ত, খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত উত্তরচীনের জাতীয় বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করিবার ক্ষমতা ছিল না। চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত জাতীয় বাহিনীর শক্তির উৎস ছিল কৃষক এবং শ্রমিক সম্প্রদায়। তাহাদিগের মধ্যে এই বাহিনী অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। অভিযানকারী বাহিনীর সঙ্গে সাম্যবাদী প্রথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সাম্যবাদী দলভুক্ত বহু রাজনৈতিক সংগঠক এবং প্রচারক ছিলেন। ইঁহারা জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করিতে করিতে চলিলেন। জাতীয় সৈন্যদল কোন অঞ্চলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ইঁহারা যাইয়া কৃষক এবং

শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শ্রেণী-চেতন করিবার চেষ্টা করিতেন। জাতীয় সরকার ইঁহাদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা করিবেন তাহাও এই সমস্ত প্রচার এবং সংগঠন-কর্ম্মী বলিতেন। ফলে জনসাধারণ এই অভিযানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। জাতীয় বাহিনী প্রায় সর্ব্বত্রই সাদরে অভ্যর্থিত হইতে লাগিল। স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট হইতে সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় সাহায্য পাইতেও এই বাহিনীর কোন অসুবিধা হয় নাই। ইহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদল অনেক ক্ষেত্রেই একেবারে যুদ্ধ না করিয়া বা নামমাত্র যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করিত। ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই দক্ষিণচীনের রণ-নায়কগণ স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেলেন।[১]

১৯২৬ সালের মধ্যেই ক্যাণ্টন-বাহিনী চীনের অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিয়া ইয়াংসিকূলে অবস্থিত হ্যাঙ্কো অধিকার করিল। যে সমস্ত বৈদেশিক রাষ্ট্র চীনে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে তাহারা প্রথম হইতেই চীনের জাতীয়তা বোধেব বিকাশ এবং বিজয়ের ঘোরতর বিরোধী ছিল। চিয়াং কাই-শেক-পরিচালিত জাতীয় বাহিনী যখন ইয়াংসিতীরে বৈদেশিক প্রভাবাধীন অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন এই বিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করিল। বৈদেশিকগণের সহিত জাতীয় বাহিনীর সংঘর্ষের ফলে অল্পসংখ্যক বৈদেশিক প্রাণ হারাইলেন। বিদেশীয়দিগের কিছু সম্পত্তি লুন্ঠিত, অগ্নিদগ্ধ এবং অন্যভাবে বিনষ্ট হইল। কিন্তু এই সংবাদ যতটা ফলাও করিয়া প্রচার করা হইয়াছে, বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া নির্ব্বিচারে সহস্র সহস্র চৈনিককে হতাহত কবিবার সংবাদ তাহার শতাংশের একাংশও করা হয় নাই।

১। "In an incredibly short time the South China war-lords had disintegrated like a puff of smoke."
—*The Unfinished Revolution in China* by I. Epstein, p. 46.

হ্যাঙ্কো অধিকৃত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইহার নিকটবর্ত্তী উচাং এবং হ্যানিযাংও জাতীয় বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। হ্যাঙ্কো, উচাং এবং হ্যানিয়াং এই তিনটি নগর সম্মিলিতভাবে উহান নামে পরিচিত। উহানের পতনের পর ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনী ইয়াংসি নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইযা চলিল।

উহান চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প-কেন্দ্র। শিল্প-কেন্দ্র হিসাবে সাংহাই'র পরেই উহানের স্থান। চীনের সর্ব্ববৃহৎ লৌহকারখানা সমূহ হ্যানিয়াং-এ অবস্থিত। ক্যুওমিন্‌টাং দলভুক্ত সাম্যবাদী এবং তাঁহাদের রুশীয় উপদেষ্টাগণ দেখিলেন যে, হ্যানিয়াং-এর সহস্র সহস্র বিত্তহীন শ্রমিকের মধ্যে নিজেদেব আদর্শ এবং মতবাদ সহজেই জনপ্রিয় করিয়া তোলা যাইবে এবং হ্যানিয়াংকে কেন্দ্র করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করিবার খুব সুবিধা হইবে। এদিকে ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেক যখন ইয়াংসিতীরে সংগ্রামরত ছিলেন তখন ওয়াং চিং-ওয়াই'র (Wang Ching-wei) নেতৃত্বে ক্যুওমিন্‌টাং-এর বামপন্থী সদস্যদিগের সহায়তায় কম্যুনিষ্টগণ জাতীয় সরকারের রাজধানী ক্যাণ্টন হইতে হ্যাঙ্কোতে স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে চীনের জাতীয় সরকার উহান সরকার নামে অভিহিত হইতে থাকে। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে উহান সরকাব কর্ত্তৃক হ্যাঙ্কোব ইংরেজ উপনিবেশ অধিকার করা উপলক্ষ্যে ইহার সহিত ইংরেজদিগেব মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। চতুর ইংরেজ বুঝিতে পারিয়াছিল যে উনবিংশ শতাব্দীব 'জোর যার, মুল্লুক তার' নীতি বিংশ শতাব্দীর চীনে অচল। সুতরাং ইংরেজ আপোষে এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিল।

উত্তরচীনের রণ-নায়কগণ একের পর এক চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয় বাহিনী কর্ত্তৃক পরাস্ত হইতে লাগিলেন। সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রগুলি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ মুক্তিকামী চীনের শক্তির পরিচয়

পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। জাগ্রত মহাচীন আর শক্তিমানের ভ্রুভঙ্গীতে বিচলিত না হইয়া গর্ব্বোদ্ধত পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সহিত সমকক্ষতার দাবী করিতে লাগিল।

চীনের বৈদেশিক কর্ত্তৃত্বাধীন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সাংহাই হ্যাঙ্কো হইতে খুব বেশী দূরে নহে। এইখানে বিপুল বৈদেশিক মূলধন বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হইয়াছে। ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনী সাংহাই'র নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে সাংহাইতে স্থবিধাভোগকারী বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি ভয় পাইয়া গেল এবং সাংহাই বন্দরে সৈন্য ও রণতরী প্রেরণ করিল। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ সাংহাইতে ইংরেজদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করিলেন।

চীনের গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহার ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতাকে অস্বীকার করিয়া সাংহাই বন্দরে সৈন্য ও রণতরী সমাবেশ করিয়াছিল। ভীতি প্রদর্শনে চীনকে বশীভূত করিয়া স্ব-স্ব স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। সাংহাই-প্রবাসী শ্বেতাঙ্গ বণিক্ এবংসৈন্যাধ্যক্ষগণ বার বার যুদ্ধঘোষণার কথা বলিলেও প্রধানতঃ আমেরিকার জন্যই যুদ্ধ বাধিতে পারে নাই।

হ্যাঙ্কো বা উহান সরকারকে এই সময় এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। জাতীয় বাহিনী সাংহাই অধিকার করিতে অগ্রসর হইবে কিনা স্থির করিতে না পারিয়া উহান সরকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। উত্তরাভিমুখীন অভিযান আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত এই বাহিনীর অবাধ অগ্রগতি এবং স্বল্পায়াসলব্ধ বিজয় জাতীয়তাবাদিগণের সাহস এবং উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে নববলে বলীয়ান্ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সাংহাই'র আকর্ষণও ছিল দুর্নিবার। জাতীয় সম্পদের একটা প্রধান অংশ তখন সাংহাইতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। সাংহাই হস্তগত করিতে পারিলে এই

সম্পদ এবং পশ্চিমে উহান পর্য্যন্ত সমগ্র ইয়াংসি-উপত্যকার উপর জাতীয় সরকারের নিঃসপত্ন কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত। এই গেল এক দিক্। পক্ষান্তরে জাতীয় বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত অঞ্চলের ৫০০ মাইলেরও বেশী জায়গায় তখন পর্য্যন্ত জাতীয় সরকারের কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সাংহাই আক্রমণ করিলে সুবিধাভোগী বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্ভাব্য সংঘর্ষের ফলে এই বিজিত অঞ্চল হস্তচ্যুত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। বরোডিন উহান সরকারকে খুব সতর্কতার সহিত নীতি নির্দ্ধারণ করিবার পরামর্শ দিলেন। সাংহাই আক্রমণ করা অনুচিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিলেন এবং উহান সরকারকে সর্ব্বাগ্রে দক্ষিণচীনে স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজনৈতিক প্রচারের সহায়তায় উত্তরচীন বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করা হইলে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও অদূরভবিষ্যতে সাংহাই অধিকার করিয়া পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হইবার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইবে। বিপ্লবী বরোডিন বাস্তববাদী ছিলেন বলিয়াই উহান সরকারকে এই বাস্তবানুগ নীতি অনুসরণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ক্যুওমিন্টাং-সদস্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই মত সমর্থন করিলেন। তাঁহাদিগের অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল যে আপাততঃ যথেষ্ট লাভ হইয়াছে এবং এইবার অর্জ্জিত অধিকারের দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্ব সম্পাদনে মনোনিবেশ করা উচিত।

দক্ষিণপন্থী ক্যুওমিন্টাং নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করিয়া চিয়াং কাই-শেকের, কিন্তু বরোডিনের পরামর্শ মনঃপূত হইল না। কি কারণে তাঁহারা এই সময় সাংহাই অধিকার করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে ক্যুওমিন্টাং দল দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যাইবার পর তাহা স্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল। জাতীয় বাহিনীর অগ্রগতি এবং বিপ্লবের সাফল্য সমগ্র দেশে গণ-চেতনা জাগ্রত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃষক এবং শ্রমিক-সংস্থাগুলি দিনের পর

দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। ক্যুওমিন্‌টাং-এর দক্ষিণ শাখা এই জাগরণ এবং কৃষক ও শ্রমিক-সংগঠনগুলির ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে সুদৃষ্টিতে দেখিত না। জাতীয় বাহিনীর সেনানায়কদিগের মধ্যে অনেক ভূস্বামীও ছিলেন। তাঁহারা কৃষক এবং শ্রমিক-সংস্থাগুলির ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন হইলে জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু এবং ক্যুওমিন্‌টাং দলকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিতেও তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সাংহাই চীনের দেশীয় এবং বৈদেশিক পুঁজির একটি প্রধান নিয়োগ-কেন্দ্র। ক্যুওমিন্‌টাং-এর দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের আশা ছিল যে এই দলের প্রগতিশীল অংশের, বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্টগণের, বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁহারা সাংহাই হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যবিধ সাহায্য পাইবেন। সাংহাই'র বৈদেশিক ব্যাঙ্ক এবং পুঁজির মালিক শিল্পপতিগণের নিকট হইতেও তাঁহারা সাহায্য পাইবার আশা পোষণ করিতেন।

১৯২৭ সালের ২২শে মার্চ্চ সাংহাই'র চৈনিক-কর্ত্তৃত্বাধীন অঞ্চলের পতন হইল। জাতীয় বাহিনীর এই বিজয়ে চীনেব অন্যতম কম্যুনিষ্ট নেতা চৌ এন্‌-লাই (Chou En lai) একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাংহাই'র পতনের পূর্ব্বে তিনি ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া এক ব্যাপক ধর্ম্মঘট সংগঠন করিলেন। এই ধর্ম্মঘট সাংহাইতে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ইহার পতন অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল। জাতীয় বাহিনী নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই স্থানীয় জনসাধারণ নগররক্ষী সৈন্যদলকে চৈনিক-কর্ত্তৃত্বাধীন অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই নান্‌কিংও ক্যুওমিন্‌টাংবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ডাঃ সুন্‌ ইয়াট-সেন নান্‌কিং-এ জাতীয় সরকারের রাজধানী স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এই অজুহাতে চিয়াং কাই-শেক এবং তাঁহার অনুগামিগণ উহান সরকারের সহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নান্‌কিং-এ জাতীয় সরকারের রাজধানী স্থাপন

করিলেন। চিয়াং-এর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উহান সরকার ইহার জবাব দিলেন। ক্যুওমিন্‌টাং দলের অন্তর্ব্বিরোধ এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই দল তথা চীনেব বিপ্লবী শক্তিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া দিল। বিপ্লবের অবসানে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

যে সমস্ত বৈদেশিক রাষ্ট্র চীনের দুর্ব্বলতার সুযোগে সেখানে জাঁকিয়া বসিয়াছে, জাগ্রত চীনের সচেতন গণ-মানসের দুর্জ্জয় বিপ্লবী শক্তিকে ব্যর্থ এবং বিভ্রান্ত করিয়া দিবার জন্য তাহারা এই সময় ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ক্যুওমিন্‌টাং দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপদলের নীতি এবং লক্ষ্যেব পারস্পরিক বিরোধ সাম্রাজ্যাধিকারী বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য-সিদ্ধিব সহায়ক হইয়াছিল।

চীনের শিল্পপতিগণ জাতীয় দলের পৃষ্ঠপোষক এবং বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব বিলোপের পক্ষপাতী হইলেও বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ, শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক সম্প্রদায়কে তাঁহারা অনেক বেশী ভয় করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পর্য্যন্ত অবশ্য সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। পুঁজির মালিক শিল্পপতিগণ এবং ক্যুওমিন্‌টাং-এর বহু পদস্থ কর্ম্মচারী কৃষক সম্প্রদায়ের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী মনোভাবকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তথাপি এতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু বিপ্লব যখন সার্থক পরিণতির পথে কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছে এবং মহাচীনের বিপ্লবী গণ-চেতনার অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস পাওয়া গিয়াছে তখন ইঁহারা ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। জনসাধারণ তাঁহাদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করুক্ ইহাই তাঁহারা চাহিতেন। কিন্তু সংগ্রামের ফলে লব্ধ ক্ষমতা এবং সুবিধার অংশ সংগ্রামকে যাহারা জয়যুক্ত করিল তাহাদিগকে দেওয়ার ইচ্ছা ইঁহাদিগের ছিল না। ক্যুওমিন্‌টাং-এর দক্ষিণপন্থী সদস্য এবং সমর্থকগণের

এই মনোভাবের সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রগুলি চীনে স্ব-স্ব স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থা করিল। সৈন্যাধ্যক্ষ চিয়াং কাই-শেক চীনের গণ-অভ্যুত্থান দমনে বৈদেশিক পুঁজিপতিগণের এবং সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্র সমূহের ক্রীড়নক-রূপে ব্যবহৃত হইতে সম্মত হইলেন।

উহান সরকারের বহু সদস্যের মতের বিরুদ্ধে চিয়াং সাংহাই বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চিয়াং-এর সমর্থক এবং বিরোধী দল পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। বিরোধী দল এই সময় সৈন্যগণের উপর চিয়াং-এর প্রভাব নষ্ট করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। নান্‌কিং-এ স্বতন্ত্র সরকার স্থাপন করিয়া চিয়াং ইহার পাল্টা জবাব দিলেন। ক্যুওমিন্‌টাং-এর অধিকাংশ সদস্য এবং সাম্যবাদিগণ মনে করিলেন যে এই কার্য্য সম্পূর্ণ প্রতি-বিপ্লবাত্মক (Counter-revolutionary)। অতঃপর চিয়াং কাই-শেক সাম্যবাদী এবং শ্রমিক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। যে শ্রমিক সম্প্রদায় তাঁহার সাংহাই বিজয় সহজসাধ্য করিয়াছিল তিনি তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিতে কৃতযত্ন হইলেন। বৈদেশিক পুঁজিপতিগণের প্ররোচনায় সাংহাই'র গুণ্ডাসর্দ্দার টু ইউয়ে-সেন (Tu Yueh-sen)-এর সহযোগিতায় এবং চিয়াং-এর অনুমোদনক্রমে সাংহাইতে শ্রমিকনিধন যজ্ঞ আরম্ভ হইল। জাতীয়তা-বাদী প্রচারকগণের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে সাংহাইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল।[১] এই সময়েই নান্‌কিং সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীন অন্যান্য অঞ্চলেও সহস্র সহস্র শ্রমিক ও কৃষক-নেতা, প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং বহু সাম্যবাদী নেতা প্রাণ হারাইলেন। সেনাবাহিনীর যে যে অংশকে প্রগতিশীল মনোভাবসম্পন্ন বলিয়া সন্দেহ করা হইল সেগুলিকে নিরস্ত্র করা

১। 'The freedom that the nationalists were supposed to have brought to Shanghai, was soon converted into a bloody terror".
—*Glimpses of World History* by Pandit Jawaharlal Nehru, P. 812.

হইল। গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংস সাধন করা হইল। পিকিং এবং সাংহাই'র সোভিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত হইল। চিয়াং কাই-শেক এই সময় খুব সম্ভব উত্তরচীনের রণ-নায়ক চ্যাং সো-লিনের সহিত একযোগে প্রগতিপন্থীদিগকে নির্ম্মূল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিকিং-এও সাম্যবাদী এবং অন্যান্য বামপন্থীদিগকে কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত অথবা হত্যা করা হইতে লাগিল। ক্যাণ্টনেও সৈন্যবাহিনীব সহায়তায় অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে শ্রমিক-বিক্ষোভ দমন করা হইল। সোভিয়েট দূতাবাসের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে দূতাবাস হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হত্যা করা হইল। ইঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন। নারী-অঙ্গের ভিতর কাষ্ঠখণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিয়া ইঁহাদিগকে হত্যা করা হয়। চীন এইভাবে নূতন করিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রসমূহ পুলকিত হইয়া উঠিল। তাহারা নানা উপাযে চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য করিতে লাগিল। এই সময়েই চীন-সোভিয়েট মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

এইভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে চীন-ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তিত হইল। সর্ব্বত্র বিজয়ী সমগ্র জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় ক্যুওমিন্‌টাং পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সাম্রাজ্যাধিকারী শক্তিসমূহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এক দলের বিরুদ্ধে অপর দলকে সাহায্য করিয়া তাহারা এই সর্ব্বনাশা গৃহ-বিবাদের অগ্নিতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিল। আজ পর্য্যন্তও চীনে এই খেলাই চলিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদিগের এবং তাঁহাদিগের মিত্র ক্যুওমিন্‌টাং-এর দক্ষিণ শাখার শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আক্রোশ ছিল।

চীনে সংঘটিত ঘটনাবলীর জন্য সোভিয়েট সরকার বরোডিনকে দায়ী করিলেন। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই উহানের বামপন্থী ক্যুওমিন্‌টাং দল আত্মকলহে শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই উহান সরকারের

অন্তর্ভুক্ত সাম্যবাদী দল ইহার অনুষ্ঠিত কোন কোন কার্য্যের জন্য ক্যুওমিন্‌টাং দলীয় স্বীয় সহযোগীদিগের এবং জনসাধারণের একাংশের বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িতেছিল। ধর্ম্মঘটের পর ধর্ম্মঘট এবং কৃষক-বিক্ষোভের ফলে উহান সরকারের শাসনাধীন মধ্যচীনে অশান্তি এবং উত্তেজনা স্থায়ী হইয়া রহিল। সাম্যবাদী-প্রভাবিত 'পিপল্‌স্ কোর্ট' (People's Court) কুশীদজীবী এবং ধনকুবেরদিগকে লঘু অপরাধে এমন কঠোর—অনেকক্ষেত্রে প্রতিহিংসামূলক—দণ্ডে দণ্ডিত করিত যে জনসাধারণ দিনের পর দিন সাম্যবাদীদিগের সততা এবং ন্যায়নিষ্ঠায় আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিল। হুনান প্রদেশে মোতায়েন উহান সরকারের সৈন্যদল অভিযোগ করিল যে সাম্যবাদীগণ দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছেন। সাম্যবাদী-পরিচালিত বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী কৃষকদিগের একটি জনতাকে এই বাহিনী একবার বল প্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল।

বরোডিনের উহান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কো-মিণ্টার্ণ (Com-Intern) হইতে জমিদারদিগের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট এক পরোয়ানা আসে। এই সময় মানবেন্দ্রনাথ রায় (M. N. Roy) কো-মিণ্টার্ণের প্রতিনিধিরূপে চীনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই পরোয়ানার একখণ্ড অনুলিপি উহান সরকারের কর্ণধার ওয়াং চিং-ওয়াইকে দেখান। ইহারই ফলে সাম্যবাদীদিগকে ক্যুওমিন্‌টাংদল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

ক্যুওমিন্‌টাং-এর দক্ষিণ শাখা প্রথমাবধিই সাম্যবাদিগণকে দলভুক্ত করিতে অনিচ্ছুক ছিল। সুন্ ইয়াট্-সেনের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং অপূর্ব্ব নেতৃত্ব গুণেই এই আপত্তি সাময়িকভাবে খণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই এই দুই দলের আদর্শ এবং নীতিগত বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়া ইহাদিগকে আবার বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

বহুদিন হইতেই বরোডিন ও তাঁহার রুশীয় সহকর্ম্মীবৃন্দ এবং ওয়াং চিং-ওয়াই ও তাঁহার সমর্থকগণের পারস্পরিক সম্পর্ক দিনের পর দিন তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিতেছিল। পরিষ্কার বোঝা গেল যে সাম্যবাদী এবং ক্যুওমিন্‌টাং এই দুই দলের নীতি এবং আদর্শের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এবং অনুত্তীর্য্য ব্যবধান বিদ্যমান এবং ইহাদিগের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। উহান সরকারের কোন কোন সদস্যের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইলযাছিল যে সাম্যবাদিগণ সোভিয়েট দূতাবাস-প্রদত্ত উৎকোচের বশীভূত হইয়া দেশ-দ্রোহিতা করিতেছেন। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিলেন যে সাম্যবাদিগণ ক্যুওমিন্‌টাং দল ভাঙ্গিয়া দিযা উহানে একটি পূর্ণমাত্রায় সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন।

বরোডিনের হ্যাঙ্কো পরিত্যাগেব পূর্ব্বে এবং পরে বহু সাম্যবাদীকে গ্রেপ্তার করা হইল। নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ মস্কোতে পলায়ন কবিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। উহান-সোভিয়েট মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এই ভাবে ক্যুওমিন্‌টাং এর বাম এবং দক্ষিণ শাখার মধ্যে পুনর্মিলনের পথ প্রশস্ত হইল। এই মিলন ঘটাইবার জন্য চিয়াং কাই-শেক নান্‌কিং সরকারের সৈন্যাধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রপতির পদ পরিত্যাগ করিলেন। ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে চিযাং কাই-শেক জাপানে চলিয়া গেলেন। ক্যুওমিন্‌টাং-এর বাম শাখা অতঃপর নানকিং সরকারের সহিত যোগদান করিল।

কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে-তুং (Mao Tse-Tung) বলেন যে ১৯২৭ সালে কম্যুনিষ্ট দলের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের জন্য এই দলের তদানীন্তন নেতা চিন্‌ টু-সিউ'র (Chiu Tu-Shiu) ভ্রান্ত এবং সুবিধাবাদী নীতিই প্রধানতঃ দায়ী।

চীনে সাম্যবাদী দল গঠিত হইবার পর প্রথম ছয় বৎসর পিকিং-এর অধ্যাপক চিন্‌ টু-সিউ ইহার প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি এই

দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কম্যুনিষ্টগণ মনে করেন যে মহাবিপ্লব অর্থাৎ দ্বিতীয় চীন-বিপ্লবের যুগে চিন্ ধনিকশ্রেণীর, বিশেষ করিয়া চিয়াং কাই-শেকের, নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন।

১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসে একখানি যুদ্ধ-জাহাজের অধ্যক্ষ কম্যুনিষ্ট বলিয়া চিযাং কাই-শেকেব আদেশে গ্রেপ্তার হ'ন। এই সময় চিয়াং ঘোষণা করিলেন যে, সৈন্য বাহিনীব পদস্থ কর্ম্মচারী এবং বাজনৈতিক কর্ম্মীদিগের মধ্যে যাঁহারা কম্যুনিষ্ট তাঁহাদিগকে ছাঁটাই করিতে হইবে। কম্যানিষ্টগণের মধ্যে অনেকেই চিয়াং-এব কম্যুনিষ্ট-বিতাড়ণ নীতির বিরোধিতা করিতে চাহিযাছিলেন। কিন্তু চিন্ এই মত অগ্রাহ্য করিয়া তোষণের পথ ধরিলেন। ইহাব তিন মাস পব ৫ই মে যাবতীয় ক্যুওমিন্টাং-সংস্থাব নেতৃস্থানীয পদ হইতে সাম্যবাদীদিগকে বিতাড়নের যে সিদ্ধান্ত ক্যুওমিন্টাং দল কর্ত্তৃক গৃহীত হইল, চিন্ টু-সিউ বিনা প্রতিবাদে তাহা মানিয়া লইলেন। এই সমস্ত সংগঠনের অধিকাংশই কিন্তু কম্যুনিষ্টদিগের নিজহাতে গড়া।

এই নীতির ফলে পরে ১৯২৭ সালের ফেব্রুযারী মাসে সাংহাই শহরে চিযাং-অনুষ্ঠিত শ্রমিক-নিধনযজ্ঞের ভিতর দিযা যখন প্রতি-বিপ্লবী শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল তখন সাম্যবাদিগণ প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া প্রতি-বিপ্লবের গতিরোধ করিতে পাবিলেন না। চেষ্টা করিলে উহানে এই প্রতি-বিপ্লবকে তখনও ব্যর্থ করা যাইত। প্রাদেশিক ক্যুওমিন্টাং-এব কেন্দ্রীয় কমিটিব অর্দ্ধেকেরও বেশী সভ্য তখন পর্য্যন্ত উহান সরকাবেব কম্যুনিষ্ট সদস্যগণের সহিত সহযোগিতা করিতেছিলেন। ইহা সত্ত্বেও চিন্ পিছাইযা গেলেন। উহান সরকারের অধীন বিভিন্ন শহরে শ্রমিক স্বেচ্ছা-সৈনিক-দিগের নিরস্ত্রীকরণে তিনি আপত্তি করিলেন না। তিনি কৃষক-বিপ্লবেরও বিরোধিতা করিযাছিলেন। তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিপ্লব সংঘটিত হইল। চাংশায় সামন্তদিগের সামরিক এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার

পর এক লক্ষ সশস্ত্র কৃষক শহর ঘেরাও করিয়া জনসাধারণের হাতে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবার দাবী জানায়। উহান সরকারেব ক্যুওমিন্‌টাং দলীয় সভ্যগণ ইহাতে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কৃষকদিগকে নিরস্ত্র করিবার দাবী জানাইলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই দাবী মানিয়া লইল। সাম্যবাদী দল এইভাবে পিছাইয়া আসিবার ফলে সে সময় শ্রমিক-কৃষকেরা নেতৃত্বহীন হইয়া পড়ে এবং তাহারই ফলে ঐ বৎসর জুলাই মাসে উহানে প্রতি-বিপ্লব সম্ভব হইয়াছিল।

উহান হস্তচ্যুত হইবার পর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিবর্ত্তন আসিল। চিন্ টু-সিউ'ব জায়গায় পরপব কয়েকজন পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। চীনেব সাম্যবাদিগণ আজ মনে করেন যে এই সময় চিন্‌কে সরাইয়া দিয়া তাঁহারা ভুল করিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট দলের নীতি এবং কার্য্যকলাপে এখন হইতে অত্যুগ্র বামপন্থী (Ultra-leftist) বিচ্যুতি দেখা দিল। বামপন্থিগণ মহাবিপ্লবের ব্যর্থতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে চীনের বিপ্লব 'নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব'। তাঁহারা মনে করিতেন যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব অতি দ্রুত গতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্য্যায উন্নীত হয় এবং চীনে সেই অবস্থান্তর ইতোমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিযাছে। শিল্পের ক্ষেত্রে বামপন্থী কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক নীতির ফলে শহরের ছোট ছোট ব্যবসাযীরা পর্য্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। পরে ১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসে কম্যুনিষ্ট দল এই নীতি সংশোধিত করিয়াছিল।

মহাবিপ্লবের যুগে সাম্যবাদী দল একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যুক্ত 'ফ্রণ্ট' (United front) গঠন করিবার জন্য কম্যুনিষ্টগণ এই সময় ধনিকশ্রেণীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। যুক্ত 'ফ্রণ্ট' গঠিত হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ধনিকশ্রেণীর বিরোধিতা করিবার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু কম্যুনিষ্টগণ ধনিকদিগের সহিত একতাই স্থাপন করিয়াছিলেন, সংগ্রাম চালাইয়া যান নাই। ফলে ধনিকদিগের

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও কম্যুনিষ্টগণের মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই। ১৯২৭ সালের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর আবার কম্যুনিষ্ট দল ইহার ঠিক বিপরীত পথে চলিয়াছিল। এই যুগে ধনিকদিগের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সংগ্রামই করা হইয়াছিল। এমন কি শহরের ছোট ছোট ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে পর্য্যন্ত ঐক্য স্থাপন করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে বিগড়াইয়া দেওযা হইয়াছিল।

১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে চিয়াং কাই-শেকের জাপান যাইবার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেনের কনিষ্ঠা শ্যালিকা মাই-লিং সুং (Mei-ling Soong)-এর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময চিযাং-এব বয়স ৪০ বৎসর এবং মাই-লিং-এর ২৫ বৎসর। বিবাহেব পর স্ত্রীর প্রভাব এবং পরামর্শে চিযাং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মাদাম চিযাং মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অনুরাগিণী হইলেও তিনি চীনের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। স্ত্রীর সাহচর্য্য এবং প্রভাব চিয়াংকে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণাগুণ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সহায়তা করিয়াছে।

বিপদে আপদে এবং ঘোরতর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যেও মাদাম চিয়াং কাই-শেক ছায়ার ন্যায় স্বামীর পার্শ্বচারিণী। চিয়াং যখন কোন বিশিষ্ট বিদেশীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন মাদাম চিযাং তাঁহার দোভাষী এবং কূটনৈতিক উপদেষ্টার কাজ করেন। তিনি স্বামীর সেক্রেটারির কাজও করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর জীবন-সঙ্গিনী—তাঁহার গৃহিণী, সচিব এবং সখী।

কিছুদিনের মধ্যেই নান্‌কিং সরকার বুঝিতে পারিলেন যে চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্ব ব্যতীত রাষ্ট্র-তরণী রানচাল হইযা যাইবে। আবার তাঁহার নিকট নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান আসিল। তিনি পুনরায় নান্‌কিং সরকারের

সৈন্যাধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি উত্তরচীনের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত অভিযান আরম্ভ করিলেন। সাংহাই অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত জাগ্রত মহাচীনের বিপ্লবী গণ-চেতনা ক্যুওমিন্টাং-এর শক্তির প্রধান উৎস ছিল। কিন্তু চীনে সুবিধাভোগকারী বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং চীনের সামন্ত সম্প্রদায়ই এইবারকার অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিল। ১৯২৮ সালের মধ্যেই চীনের জাতীয় জীবনের দুর্গ্রহ রণ-নায়কগণের প্রায় সকলেরই শক্তি চূর্ণ হইয়া যায়। প্রধানতঃ জাপানের প্ররোচনায় পিকিং তখনও আত্মসমর্পণ করিল না। জাপানের ভয় যে সমগ্র চীনে জাতীয় সরকারের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে সান্টুং এবং মুক্‌ডেনে তাহার স্বার্থ বিপন্ন এবং মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। ১৯২৮ সালে মে মাসের প্রথম ভাগে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক্ হইতে একই সময়ে ক্যুওমিন্টাং বাহিনী পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এদিকে সান্টুং-এর বন্দর সিংটাও'র পথে জাপানী সৈন্যের একটি শক্তিশালী দল চীনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রেল লাইন ধরিয়া পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পিকিং-এর অল্প দক্ষিণে উভয় বাহিনীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে ক্যুওমিন্টাং বাহিনী পরাজিত হইয়া সাময়িক ভাবে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল।

এই বিপর্য্যয়ের অল্প কিছুকাল পরেই পিকিং-এর রণ-নায়ক চ্যাং সো-লিন্ নানকিং সরকারের সহিত সুবিধাজনক সর্ত্তে আপোষ করিবার আশায় জাপানের সহিত তাঁহার যে মৈত্রী-বন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন করিয়া সসৈন্যে মাঞ্চুরিয়ায় চলিয়া যান। সীমান্ত অতিক্রম করিবার পরই যে ট্রেণে তিনি যাইতেছিলেন বিস্ফোরণের ফলে তাহা ধ্বংস হয়। খুব সম্ভব জাপান কর্ত্তৃক এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র চ্যাং সুয়ে-লিয়াং (Chang Hsueh-liang) জাপানের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নান্‌কিং সরকারের সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

জুলাই মাসে পিকিং আত্মসমর্পণ করিল। পিকিং-এর নূতন নাম হইল পিপিং (Peiping)।

এই ভাবে বাহ্যতঃ চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রকৃত ঐক্য কিন্তু আজ পর্য্যন্তও স্থাপিত হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বেই দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনে একটি পৃথক্ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্যাণ্টন সরকার নান্‌কিং সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। এদিকে আবার পিকিং-এর পতনের পরও উত্তরচীনের কোন কোন রণ-নায়ক নানকিং সরকারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতেন আবার কখনও বা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। কাগজে কলমে নান্‌কিং সরকার ক্যাণ্টন ব্যতীত সমগ্র চীন শাসন করিতেন। প্রকৃতপক্ষে দেশের বহু অংশেই কিন্তু ইহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইত না। এই প্রসঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কম্যুনিষ্ট-শাসিত বিরাট একটি অঞ্চলের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রগুলির পরামর্শ এবং প্ররোচনায় নান্‌কিং সরকার প্রথম হইতেই সোভিয়েট-বিরোধী নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১৯২৯ সালে সরকারের ইঙ্গিতে মাঞ্চুরিয়ার সোভিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত হয়। অতঃপর 'চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলপথের' (Chinese Eastern Railway) রুশীয় কর্ম্মচারীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতে থাকে। রুশিয়া এবং চীন এই রেলপথের সমান অংশীদার। নান্‌কিং সরকার-অনুষ্ঠিত এই অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য সোভিয়েট সরকার মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কয়েক মাস শত্রুতা চলিবার পর নান্‌কিং সরকার 'চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলপথের' পরিচালনায় প্রচলিত ব্যবস্থা বহাল রাখিতে সম্মত হইলেন।

নানকিং সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্যুওমিন্‌টাং দলের বাম এবং দক্ষিণ শাখার মধ্যে বিরোধ মিটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কম্যুনিষ্টগণের সঙ্গে ক্যুওমিন্‌টাং দলের যে বিরোধ তাহা রহিয়াই গেল

এবং দিনের পর দিন এই বিরোধ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নান্‌কিং সরকারের আদেশে সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচার করা এবং সাম্যবাদী দলভুক্ত হওয়া প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হইল। চীনের জাতীয়তাবাদের প্রধান দুইটি আদর্শ—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং গণ-বিপ্লব—প্রকৃত প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। সরকার-অনুসৃত প্রতিক্রিয়াপন্থী নীতির জন্য যাঁহারা এই সময় চীন হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মাদাম সুন্ ইয়াট-সেনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য নানকিং সরকারকে প্রধানতঃ সাংহাই বন্দরের ধনকুবের ব্যাঙ্কারগণের উপর নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং ইঁহাদিগের অসন্তোষ উৎপাদন করিবার সাহস বা সামর্থ্য এই সরকারের ছিল না। ইহার অনুগত বিভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনস্থ বিশাল বাহিনীগুলি অসহায় কৃষকগণের রক্তশোষণ করিতে লাগিল। বহু প্রাক্তন সৈনিক জীবিকার অন্বেষণে দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিরুপায় হইয়া দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রণ-নায়কগণের স্থানে অভিনব রণ-নায়ক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিল। নান্‌কিং সরকার গৃহ-যুদ্ধ এবং ক্রমবর্দ্ধমান কৃষক-আন্দোলন দমনে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। সহস্র সহস্র সাম্যবাদী এবং কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রাক্তন নেতা প্রাণ হারাইলেন। সর্ব্বপ্রকার বিরোধিতার মূলোচ্ছেদ করিয়া একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব (Totalitarian Dictatorship) স্থাপনের চেষ্টা করা হইতে লাগিল।

চিয়াং কাই-শেকের সর্ব্বাধিনায়কত্বে পরিচালিত নান্‌কিং সরকার ক্রমশঃই বৈপ্লবিক নীতি এবং আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মানের অতি দ্রুত অবনতি ঘটিতে লাগিল। পিপিং হইতে প্রকাশিত 'ডেমোক্রেসি' নামক দৈনিকের ১৯৩৭ সালের ১৫ই মে তারিখের একটি সংবাদে দেখা

যায় যে এই সময় চীনের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সেন্‌সিতে ৪০০,০০০-এর অধিক, কান্‌সুতে ১,০০০,০০০-এর অধিক, হোনানে প্রায় ৭,০০০,০০০ এবং কিয়াও-চাওতে ৩,০০০,০০০ বুভুক্ষু খাদ্যান্বেষণে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই প্রকাশিত অপর একটি সংবাদে দেখা যায় যে কিয়াও-চাও প্রদেশে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবে ৬০টি জেলা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং গত ১০০ বৎসরের মধ্যে এইপ্রকার প্রলয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায় নাই। সরকারী সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি' (The Central News Agency) কর্তৃক এই সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

মার্কিণ সাংবাদিক ও গ্রন্থকার এড্‌গার স্নো (Edgar Snow)-র বহুল-প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রেড্ ষ্টার ওভার চায়না' (Red Star Over China) ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে জেচোয়াং ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে পরবর্ত্তী ৬০ বৎসর বা তাহারও অধিক দিনের জন্য রাজস্ব আদায় করা হইয়া গিয়াছে এবং রাজস্ব ও সুদের হার খুব বেশী বলিয়া বহু কর্ষণযোগ্য জমি মালিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অকর্ষিত পড়িয়া রহিয়াছে।

একদিকে পল্লী-অঞ্চলের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত অধিবাসিগণ যেমন দিনের পর দিন দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনই আবার দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি এবং নগদ টাকা মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারী এবং কুসীদজীবীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। ফলে সমাজ হইতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অতিশয় বিত্তবান্ ধনকুবের এবং একান্ত নিঃস্ব দরিদ্র-এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আধুনিক চীনে অপরিজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাম্যবাদী নেতা মাও সে-টুং (Mao Tse-tung)-এর ১৯২৬ সালে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে প্রকাশ যে সমগ্র চীনের মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ৭০

ভাগই জমিদার, সম্পন্ন কৃষক, সরকারী কর্ম্মচারী এবং কুসীদজীবী সম্প্রদায়ের কবলিত হইয়াছে অথচ পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রতি শতে ৬৫ জনই দরিদ্র কৃষক, রায়ত এবং ক্ষেত-মজুর হইলেও মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ১৫ ভাগের বেশী তাহাদিগের অধিকারে নাই। নান্‌কিং সরকার কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা পরিত্যক্ত হইবার ফলেই পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে। কম্যুনিষ্টগণও এই কথাই বলেন।

এদিকে নান্‌কিং সরকার যখন স্বীয় ক্ষমতার দৃঢ়তা সম্পাদনে ব্যাপৃত, সাম্যবাদিগণ তখন নিষ্ক্রিয় বসিয়া ছিলেন না। ক্যুওমিন্‌টাং দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবার পর তাঁহারা ইয়াংসি উপত্যকায় কিয়াংসি প্রদেশে প্রধান কর্ম্ম-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে চীনে সর্ব্বপ্রথম সোভিয়েট সবকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কোয়ান্‌টুং প্রদেশের অন্তর্গত হাইফেং জেলাতে স্থাপিত এই সরকার হাইফেং সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র (Haifeng Soviet Republic) নামে পবিচিত। ৪ বৎসর পর ১৯৩১ সালে চীন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র (Chinese Soviet Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিয়াংসি প্রদেশেব সীমান্তে অবস্থিত জুই-চিন (Jui-chin) ইহার রাজধানী হইল। সোভিয়েট-শাসিত অঞ্চল ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইতে থাকে। ১৯৩২ সালের মধ্যভাগে মহাচীনের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ পরিমিত স্থান সোভিয়েট-ব্যবস্থায় শাসিত হইত। এই সময় ইহার আয়তন ২৫০,০০০ বর্গমাইল এবং জন-সংখ্যা ৫০,০০০,০০০ ছিল।

১৯২৮ সালে চীনে সর্ব্বপ্রথম লালফৌজ (Red Army) গঠিত হয়। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তখন ২,০০০-এর অধিক ছিল না। চু টে (Chu Teh) ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধকালে ইনিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'এইট্‌থ্ রুট্ আর্ম্মি' (Eighth Route Army)-র অধ্যক্ষ ছিলেন। চু টে গেরিলা যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সংগঠন-নৈপুণ্যে

১৯৩০ সালের মধ্যে লালফৌজের সংখ্যা ১০ গুণ বর্দ্ধিত হয়। ইহার ২ বৎসর পর ১৯৩২ সালে চীনের লালফৌজের সংখ্যা আরও বাড়িয়া ৪০০,০০০ হইয়াছিল। লালফৌজের সৈনিকদিগকে সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয়বিধ শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে।

চীন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের শাসনাধীন অঞ্চলে নূতন করিয়া জমি বণ্টন করা হইল। কৃষকদিগের করভার লাঘব করিয়া অনেক যৌথ কৃষি এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ১৯৩৩ সালে একমাত্র কিয়াংসি প্রদেশেই ১,০০০-এরও অধিক সোভিয়েট সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছিল। অহিফেনসেবন, বেশ্যাবৃত্তি, শিশুদিগের দাসত্ব এবং বাধ্যতামূলক বিবাহপ্রথার বিলোপ সাধন করা হইল। শিক্ষাবিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইল এবং চীনের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা লালচীনে (Red China) অধিকতর দ্রুত গতিতে শিক্ষার প্রসার ঘটিতে লাগিল।[১] যে সমস্ত অঞ্চলে যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া পড়ে নাই সে সমস্ত স্থানে শ্রমিক এবং কৃষকদিগের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইল।

১৯৩০ সালের জুলাই মাসে কম্যুনিষ্টগণ হুনান প্রদেশ আক্রমণ করিযা ইহার রাজধানী অবরোধ করেন। নান্‌কিং অধিকার করিবার জন্য তাঁহারা এই সময় বিভিন্ন দিক্ হইতে আক্রমণ চালাইতেছিলেন। চিয়াং কাই-শেকের বুঝিতে বাকী রহিল না যে কম্যুনিষ্ট দল ক্যুওমিন্‌টাং-এর প্রতিস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নান্‌কিং সরকারকে সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া কম্যুনিষ্ট দলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

১। "Mass education made much progress in the stabilized Soviets. In some counties the Reds attained a higher degree of literacy among the populace in three or four years than had been achieved anywhere else in rural China after centuries. This did not exclude even the Rockfeller-backed de luxe mass education experiment at Ting Hsien, run by 'Jimonic' Yen In Hsin Kuo, the Communists' model hsien there was a populace nearly 80 percent literate—much higher than in the famous Rockfeller County."
—*Red Star Over China* by Edgar Snow, pp. 183-84.

১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে নান্‌কিং সরকার চীন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরপর ৬টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু এত করিয়াও চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না। কম্যুনিষ্টগণের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযানের সময় নান্‌কিং বাহিনী তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। খাদ্য এবং লবণের অভাবে কিয়াংসি সরকার এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তথাপি কম্যুনিষ্টগণ আত্মসমর্পণ না করিয়া কিয়াংসি হইতে অধিকতর নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কিয়াংসি হইতে কম্যুনিষ্টগণের অপসরণ 'লং মার্চ্চ' (Long March) নামে প্রসিদ্ধ। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে ১৮৩৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র (Boer) কৃষকগণের উত্তরাভিমুখীন অভিযানের[১] সহিত এই 'লং মার্চ্চের' খুব নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়েব মধ্যে তুলনায় প্রথমোক্তটি নিঃসন্দেহে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

১৯৩৪ সালের ১৬ই অক্টোবর কম্যুনিষ্টগণ কিয়াংসি হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। মানুষের লিখিত ইতিহাসে এই অভিযানের তুলনা নাই। এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দলে যে কেবল মাত্র সৈন্যগণই ছিল তাহা নহে। সহস্র সহস্র কৃষকও সৈন্যদলের সঙ্গে যাত্রা করিল। নারী এবং পুরুষ, শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলের সমবায়ে এই অভিযাত্রীর দল গঠিত হইয়াছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে সকলেই কিছু কম্যুনিষ্ট ছিলেন না। কিয়াংসি পরিত্যাগ করিবার কালে কম্যুনিষ্টগণ অস্ত্রাগার হইতে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। কারখানাসমূহ হইতে যাবতীয় যন্ত্রপাতি খুলিয়া লইযা গাধা এবং খচ্চরের পিঠে চাপাইয়া দেওয়া হইল। এক কথায় বলিতে

১। "They set forth in small parties, with their families and belongings in tented wagons, driving their cattle before them, and thus began the most extraordinary and heroic Odyssey in modern history"—*A Short History of the British Commonwealth of Nations, Vol. II*, by Ramsay Muir, pp. 429-30.

গেলে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায় এমন কিছুই পরিত্যক্ত হইল না। পরে অবশ্য অনেক কিছুই পথের ধারে ফেলিয়া যাইতে হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টগণ বলেন যে কিয়াংসি হইতে কান্সু'র পথে বিভিন্ন স্থানে পথিপার্শ্বে হাজার হাজার রাইফেল ও মেশিনগান, প্রচুর সমরোপকরণ, যন্ত্রপাতি এবং রৌপ্য ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে।

সাম্যবাদিগণ মহাচীনের জাতীয়তার নবমন্ত্র—'চীনের অধিবাসিগণের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করা অবিধেয়,' 'জাপানকে বাধা দাও'—প্রচার করিতে করিতে চলিলেন। বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে, কখনও বা আবার শত্রুর আক্রমণ এড়াইয়া স্বীয় আদর্শে আস্থাবান্ এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল প্রথমে পশ্চিমদিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া সুদূর পশ্চিমে তিব্বত সীমান্তে উপস্থিত হইল। এখান হইতে আবার পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া এই দল অবশেষে সেন্‌সি (Shensi) প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিল। সাম্যবাদিগণ এই অঞ্চল অধিকার করিয়া তথায় সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন। ইয়েনানে (Yenan) এই সদ্যোজাত রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হইল। সেন্‌সি'র উত্তরাঞ্চল মোটেই সমৃদ্ধ নহে। ইহার ভূমি অনুর্ব্বর এবং অর্থনীতির দিক্ হইতেও ইহা একান্তই অনগ্রসর। কিন্তু রণনীতির দিক্ হইতে ইহার গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষা করিবার মত নহে। ইহার পশ্চিমেই চীনের একটি প্রধান মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চল। সংখ্যালঘু হইলেও এখানকার মুসলমানগণ বেশ শক্তিশালী। সেন্‌সি'র উত্তরে বিরল-বসতি অন্তর্মঙ্গোলিয়া (Inner Mongolia)। ইহার রক্ষণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। জাপানের মোটরারূঢ় বাহিনী অল্পায়াসেই এই প্রদেশ অধিকার করিতে পারিত। সেন্‌সি'র পূর্ব্বদিকে গিরিশ্রেণী-পরিবেষ্টিত সান্‌সি প্রদেশ অবস্থিত। সান্‌সি'র খনিজ সম্পদ গ্রাস করা জাপানের চীন-অভিযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

সেন্‌সি'র ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত সিয়ানের (Sian) বিশাল প্রান্তর চীনের একটি অতিশয় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

দুঃখ-দুর্গম পথের এই অভিযাত্রী দল প্রায় ৮,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যখন সেন্‌সিতে উপস্থিত হইল, তখন যাত্রা যাঁহারা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর বাঁচিয়া ছিলেন না। কিয়াংসি, কোয়ান্‌টুং, কোয়াংসি এবং হুনানের ভিতর দিয়া চলিবার সময় কম্যুনিষ্ট বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[১] মার্কিণ মহিলা সাংবাদিক অ্যানা লুই ষ্ট্রং প্রদত্ত একটি হিসাবে দেখা যায় যে কিয়াংসিতে থাকার সময় চীনের কম্যুনিষ্ট ও লালফৌজের মোট সংখ্যা ছিল ৩০০,০০০; কিন্তু ইয়েনানে আসিয়া যখন সকলে একত্র হইল তখন এই সংখ্যা কমিয়া ৪০,০০০-এ দাঁড়াইয়াছিল।

কম্যুনিষ্টগণ এই ভাবে কিয়াংসি হইতে সরিয়া যাওয়ার ফলে নান্‌কিং সরকার স্বীয় ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কি ভাবে তাহা বলিতেছি। কোন কোন প্রাদেশিক রণ-নায়ক ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্য্যন্ত নান্‌কিং জাতীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। ইঁহাদিগের অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর দিয়া যখন কম্যুনিষ্ট বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তখন এই সমস্ত রণ-নায়ক আত্মরক্ষার জন্য অনন্যোপায় হইয়া নান্‌কিং সরকারের নিকট হইতে সামরিক সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে পরে তাঁহাদিগকে অর্থনৈতিক এবং শাসনকার্য্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নান্‌কিং-এর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

এদিকে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধে চীনকে বিব্রত দেখিয়া জাপান মনে করিল এই তাহার চীনে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন এবং কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ। ১৯৩১ সালে চিয়াং কাই-শেক যখন কিয়াংসি'র

১। *Red Star Over China* by Edgar Snow, pp. 183-208 দ্রষ্টব্য।

কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন জাপান তখন মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া লইল। চিয়াং আশা করিয়াছিলেন যে জাতি-সঙ্ঘ এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া কোন বুদ্ধিমানই প্রবলের সঙ্গে শত্রুতায় প্রবৃত্ত হ'ন না। এক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের অন্যথা হইল না। জাতি-সঙ্ঘ প্রবল জাপানকে ঘাঁটাইতে সাহস করিল না। নান্‌কিং সরকার নিজেও মাঞ্চুরিয়ার উপর তাহার হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা করিলেন না। ফলে জনমত সরকারের প্রতি কিছুটা বিরূপ হইয়া উঠিল।

এই সময় হইতেই চিয়াং কাই-শেক জাতীয় কেন্দ্রীয় বাহিনী (National Central Army) অর্থাৎ নান্‌কিং সরকারের সৈন্যদলের আধুনিকতা সম্পাদন করিয়া তাহার শক্তিবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক সৈন্যদল এতদিন পর্য্যন্ত স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধীনে শিক্ষা লাভ করিত এবং তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইত। প্রাদেশিক বাহিনীগুলি জানিত যে স্ব-স্ব অধ্যক্ষের নির্দ্দেশে নিজ-নিজ প্রদেশের জন্য যুদ্ধ করিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। জাতীয় সরকার এবং সমগ্রভাবে দেশের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহারা অবহিত ছিল না। চিয়াং কাই-শেক এই বিচ্ছিন্ন সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সুসংহত করিলেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাদেশিক সৈন্যদলের সমবায়ে একটি বিশাল জাতীয় বাহিনী গঠন করিলেন। মাতৃভূমির মর্য্যাদা এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিবার পবিত্র এবং গুরুভার কর্ত্তব্য যে সৈন্যগণের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে এ ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক চৈনিককে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইত। পরবর্ত্তী যুগে চীনে সামরিক শিক্ষা আর বাধ্যতামূলক ছিল

না। সরকারী আদেশে এখন আবার বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল। মার্কিণ এবং ইউরোপীয় উপদেষ্টার সহায়তায় অল্পদিনের মধ্যেই আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত বিরাট একটি বাহিনী গড়িয়া উঠিল। রাজনৈতিক প্রয়োজনে রেলপথ এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে যাতায়াতের অসুবিধা বহুলাংশে দূরীভূত হইল। সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অত্যাবশ্যক বিবিধ পণ্যের উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ এবং অন্যবিধ সাহায্য করা হইতে লাগিল।

সুসজ্জিত বিমান-বহর এবং সুশিক্ষিত বৈমানিক আধুনিক সমর-যন্ত্রেব অপরিহার্য্য অঙ্গ। চিয়াং কাই-শেকের আদেশে বিমান-বহরেব উন্নতিব জন্য একটি ত্রি-বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইল। বিদেশ হইতে বিমান ক্রয় করিয়া সুশিক্ষিত বৈমানিক এবং বিমান-বহরেব অভাব দূব করিবাব ব্যবস্থা হইল। যুক্তরাষ্ট্রেব কর্ণেল চিনল্ট (Colonel Chennault) নান্‌কিং সবকারের বিমান-বহবের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন।

চিযাং-এর সমর্থকবৃন্দ জোরগলায় প্রচাব করেন যে ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধেব সময় কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত এবং আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। নান্‌কিং সরকারের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে কিন্তু এই মতের সমর্থন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সমব-বিভাগের আধুনিকতা সম্পাদন, সৈন্যদলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিবিধ শ্রম-শিল্পের উন্নতি সাধন, জাতীয় অর্থনীতিক কাঠামোর সংস্কার, বাণিজ্য-বিস্তার, বেকার-সমস্যার সমাধান, জনসাধারণের রাজ-নৈতিক চেতনার উদ্বোধন—ইহাদের প্রত্যেকটিই সময়সাপেক্ষ। যুদ্ধ-জয়ের জন্য ইহাদের কোনটিই অনাবশ্যক নহে। চিয়াং-এর সমর্থকগণ বলেন যে এই জন্যই প্রতিকূল সমালোচনা এবং জাপানের তরফ হইতে

পৌনঃপুনিক উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি জাপানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ন নাই। চিয়াং নিজেও একাধিকবার বলিযাছেন যে চীনের দুর্ব্বলতার জন্যই তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াইয়া চলিতে চাহেন।[১] কিন্তু দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ অন্তর্ব্বিরোধ দূর করিবার কোন চেষ্টা করা দূরের কথা, তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—আজও তাঁহার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত জাতীয় সরকার সেই নীতিই অনুসরণ করিতেছেন—তাহাতে এই বিরোধ মিটিবার কোন সম্ভাবনাই ছিলনা।

কম্যুনিষ্ট দলকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে চিয়াং কাই-শেকের চেষ্টার বিরাম ছিলনা, অথচ এক ১৯৩৬ সালেই জাপানের সহিত আপোষের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে সাত বার আলোচনা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। জাপানের তদানীন্তন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ হিরোটা (Mr. Hirota) চীন কর্ত্তৃক তাঁহার 'তিনটি নীতি'র (Three Principles) স্বীকৃতিকে আপোষের অপরিহার্য্য সর্ত্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই তিনটি নীতি অনুসারে জাপান দাবী করিল যে—

১। চীনকে জাপ-বিরোধী যাবতীয় সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিতে এবং পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জকে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবিবার নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২। মাঞ্চুক্যুও (মাঞ্চুরিয়ার জাপান-প্রদত্ত নাম) এবং জিহলকে (Jehol) স্বাধীন (!) কিন্তু জাপ-তাঁবেদার রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৩। চীনে মোতায়েন জাপানের সৈন্যদলকে 'কম্যুনিষ্ট দস্যু'দিগকে (Communist bandits) শায়েস্তা করিবার কাজে সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে।

১। "We are still a weak people, and we dare not provoke a war. But if we are forced to fight, we shall not stop until the last man has fallen, or until we are victorious"—*Chiang Kai-shek.*

কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষী এবং প্রগতি-বিরোধী হইলেও নান্‌কিং সরকারের পক্ষে এই সর্ত্তগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। আপোষের যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়া গেল তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে চীন-জাপান সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং একেবারে আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে নান্‌কিং-এর সরকারী নীতির প্রতিকূল সমালোচনায় চীনের জনসাধারণ দিনের পর দিন মুখর হইয়া উঠিতেছিল। ইহার বিরুদ্ধে জনমতই ক্রমশঃ দানা বাঁধিতেছিল। চীনের ছাত্র সম্প্রদায় বরাবরই বৈদেশিক আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে রহিয়াছে। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে ছাত্রগণ মাঞ্চুরিয়া এবং সাংহাইতে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাকে সহায়তা করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশময় জাপানী পণ্যবর্জ্জনের একটি শক্তিশালী আন্দোলন গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিবর্গ নান্‌কিং-এ সমবেত হইয়া সরকার-অনুসৃত জাপ-তোষণ নীতির পরিবর্ত্তন দাবী করিলেন। পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ সি. টি. ওয়াং (Dr. C. T. Wang) একদল প্রতিনিধি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিবার জন্য নিজের আফিসের মধ্যেই প্রহৃত হইলেন। ভয় পাইয়া ওয়াং পদত্যাগ করিলেন। ছাত্র-আন্দোলন দমন করিবার জন্য চিয়াং কাই-শেক চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চীনের ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে প্রচারিত একটি বিবৃতিতে দেখা যায় যে ১৯২৭ হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে সরকারী আদেশে ৩০০,০০০ তরুণকে গ্রেপ্তার এবং হত্যা করা হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া দাবী করিলেন যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইবে এবং অবিলম্বে সোভিয়েট প্রথায় শাসিত চীনের বিরুদ্ধে গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ করিয়া চীনের সমগ্র সামরিক সামর্থ্যকে জাতি এবং রাষ্ট্রের শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত করিতে হইবে।

১৯৩৭ সালের প্রারম্ভে দেশমধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয় শত্রু জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মনোভাব সমগ্র সমাজ-দেহে পবিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজের সর্ব্বস্তর হইতেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার দাবী উত্থাপিত হইল। জাপানী মালিকদিগের কাপড়ের কলসমূহের সহস্র সহস্র চৈনিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিল। ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উদার রাজনৈতিক মতাবলম্বী বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। কালবিলম্ব না করিয়া সরকার সাংহাইতে এই কমিটির সাতজন বিশিষ্ট সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়া "সাধারণতন্ত্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করিবার" ("Undermining the safety of the Republic") অজুহাতে অভিযুক্ত করিলেন। এদিকে 'ন্যাশনাল স্যালভেশন এ্যাসোসিয়েশন' (National Salvation Association)-ও আভ্যন্তরীণ অনৈক্য দূর করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। জাতীয় সবকারের সৈন্যদলও সরকারী নীতির ফলে ক্রমশঃ বিরক্ত এবং বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সৈন্যগণ খুব ভাল করিযাই জানিত যে জাতির অস্তিত্ব, স্বার্থ এবং মর্য্যাদা রক্ষা করাই তাহাদিগেব প্রধান এবং একমাত্র কর্ত্তব্য। ফলে ক্যুওমিন্টাং সৈন্যদল কম্যুনিষ্টগণের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ গা লাগাইয়া যুদ্ধ কবিতনা। কখনও বা আবার যুদ্ধ না করিয়াই তাহাদের দলে যোগদান কবিত। পক্ষান্তরে জাপানের সহিত সংঘর্ষে ইহারা জয়লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। ১৯৩৩ সাল হইতে চাহার (Chahar) প্রদেশে মোতায়েন নান্‌কিং-এর সৈন্যদল সরকারী আদেশের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া জেনারেল ফেং ইউ-সিয়াং (General Feng Yu-hsiang), জেনারেল ফ্যাং চেন্‌-উ (General Fang Chen-wu) এবং জেনারেল চি হাং-চাং (General Chi Hung-chang)-এর নেতৃত্বে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। এই অপরাধে (!) জেনারেল চি নিহত হইলেন। জেনারেল ফ্যাং প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ১৯৩৬ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর চ্যাং সো-লিনের পুত্র চ্যাং সুয়ে-লিয়াং মাঞ্চুরিয়ার ভাগ্য-বিধাতা হইযাছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি। চ্যাং সুয়ে-লিয়াং 'ইয়ং মার্শাল' (Young Marshal) নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। নান্‌কিং জাতীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিবার পর তাঁহাকে সাধারণতন্ত্রেব উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার অধীন সৈন্যগণের প্রায় সকলেই মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসী ছিল। ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিবার পর হইতে তাহারা জাপানের হাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়া মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য অধীর হইয়া পডিয়াছিল। কিন্তু নান্‌কিং সরকার তাহাদিগকে জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত না করিয়া কম্যুমিষ্ট দলনে এবং কম্যুনিষ্ট-শাসিত অঞ্চল পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিবার কার্য্যে নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা চ্যাং-এব সৈন্যদলে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার করিয়াছিল। এদিকে কম্যুনিষ্টগণেব সংস্পর্শে আসিযা চ্যাং-এর সৈন্যগণ ক্রমশঃ সাম্যবাদী ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহাব অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন এবং ইহার আদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিযাছিল। চ্যাং-এর সৈন্যদল এবং কম্যুনিষ্ট বাহিনীর মধ্যে ভাবেব আদানপ্রদান হইতে লাগিল। চ্যাং-এর সৈন্যগণ বুঝিতে পারিল যে সাম্যবাদিগণ রক্তপিপাসু, হিংস্র দস্যুমাত্র নহেন। তাঁহারা ধীর, স্থির এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধিমত্তা এবং বাস্তবানুগামিতার সুস্পষ্ট ছাপ বর্ত্তমান। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি এবং দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা চীনের মঙ্গলামঙ্গলকেই তাঁহারা বড় মনে করেন।

এদিকে ১৯৩১ সাল হইতে কম্যুনিষ্টগণ পুরাতন নীতি পরিত্যাগ করিয়া অভিনব নীতি এবং কৌশলের সাহায্যে সাম্যবাদী আদর্শকে রূপ-প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা ক্যুওমিন্‌টাং দল এবং

বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই এই দুই প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হইবার পর কম্যুনিষ্টগণ ক্যুওমিন্টাং-বিরোধিতার পরিবর্ত্তে জাপ-বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্যুওমিন্টাং সরকারকে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিলেন। ইতিহাসের একটি প্রধান শিক্ষা এই যে, গৃহ-যুদ্ধ দ্বারা দেশের পরস্পর-বিরোধী মতবাদ এবং দলের মধ্যে মিলন বা সমন্বয় সাধিত হয় না। অন্তর্ব্বিরোধের ফলে বহু জাতি দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রমাণের জন্য বেশীদূর যাইতে হইবে না। বলপ্রয়োগে আভ্যন্তরীণ বিরোধ দূর করিবার চেষ্টার ফলেই ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ণাহুতির মুখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গিযাছে। তথাপি কিন্তু মতবিরোধের অবসান হয় নাই; বরং দিনের পব দিন গৃহ-যুদ্ধের কৃষ্ণচ্ছায়া দীর্ঘতর হইতেছে। চীনের কম্যুনিষ্টগণ ইতিহাসের উপরোক্ত শিক্ষাটি বিস্মৃত হ'ন নাই। তথাপি মহাচীন গৃহ-যুদ্ধের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

১৯৩৬ সালে চীনের জনমত জাপান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল। গোড়ায যাঁহারা সাম্যবাদ-বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও বুঝিয়াছিলেন যে জাপানই চীনের প্রধান শত্রু। কম্যুনিষ্টগণ তখন দেশের কেন্দ্রস্থল হইতে বহুদূরে সীমান্তের দিকে সরিয়া যাওয়ার জন্য এক হিসাবে পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইযা পড়িয়াছেন। ভৌগোলিক বা সামরিক যে কোন দিক্ হইতেই দেখা যাক্ না কেন, তাঁহাদেব পক্ষে তখন আর সমগ্র দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে জাপান উত্তরচীন আক্রমণ করিলে কম্যুনিষ্টগণ তাঁহাদিগের অগ্রগতি প্রতিহত করিতে পারিতেন।

চ্যাং সুয়ে-লিয়াং-এর বাহিনী সেন্‌সি এবং কান্‌সু প্রদেশের কম্যুনিষ্ট-দিগকে চতুর্দ্দিক হইতে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। অবরোধকারী

বাহিনী অবরুদ্ধগণের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করিত। স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় বাহিনীর পদস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে একটা অলিখিত অনাক্রমণ-চুক্তিও সম্পাদিত হইয়াছিল।[১] ফলে সামরিক শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করা একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সংবাদে বিচলিত হইয়া ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেক উত্তরচীনের সিয়ান্ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তিনি কয়েকদিনের জন্য সিযানের উপকণ্ঠে চলিয়া গেলেন। এখানে আসিবার পরদিন প্রাতঃকালে তিনি অধ্যয়নরত আছেন এমন সময় বাড়ীর দরজায একটা গোলমাল শুনিতে পাইলেন। কতকগুলি লোক হল্লা করিতে করিতে ফটকের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ববলে তিনি খিড়কির দরজা দিয়া পলায়ন করিয়া নিকটবর্ত্তী 'ব্ল্যাক হর্স হিল' (Black Horse Hill)-এ আরোহণ করেন। শত্রুগণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া সিয়ানে লইয়া আসে (১২ই ডিসেম্বর)। নান্‌কিং হইতে যে সমস্ত সেনানী তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই বন্দী হইলেন। চ্যাং সুয়ে-লিয়াং-এর আদেশেই চিয়াং এবং অন্যান্য সকলকে বন্দী করা হইয়াছিল। চ্যাং দাবী করিলেন যে চিয়াং কাই-শেক্‌কে

(১) কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(২) নান্‌কিং জাতীয় সরকারকে নূতনভাবে গঠিত করিতে হইবে।

(৩) জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

১। "A sort of non-aggression agreement was negotiated between the highest officers of 'suppressors' and prospective suppressees."
—*The Unfinished Revolution in China* by I. Epstein, P. 62.

চ্যাং-এর প্রস্তাব মানিয়া লওয়া দূরের কথা, চিয়াং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাও বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বামীর বিপদের সংবাদে মাদাম্ চিয়াং বন্ধু-বান্ধবগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নান্‌কিং হইতে বিমানযোগে সিয়ানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি স্বামীকে সঙ্গে লইয়া বিমানযোগে নান্‌কিং-এ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চিয়াং-এর মুক্তিলাভের পূর্ব্বে যে দীর্ঘ এবং বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা চলে তাহাতে কম্যুনিষ্টগণের পক্ষ হইতে চৌ এন্‌-লাই চিয়াং-এর মুক্তি দাবী করেন। এই দাবী স্বীকৃত হইল। 'লাল দস্যু' (Red Bandits) অর্থাৎ সাম্যবাদিগণের মধ্যস্থতায় চিয়াং এবং চ্যাং-এর মধ্যে একটা আপোষ হইল। চ্যাং-এর পক্ষ হইতে ছাত্র ও শ্রমিকগণের এবং "ন্যাশনাল স্যাল্‌ভেশন এ্যাসোসিয়েশনের" দাবী সমর্থন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইল। এই দাবীগুলি নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইবে।

(২) গৃহ-যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে হইবে।

(৩) জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে।

(৪) চীনের অধিবাসীদিগকে পৌর স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে।

চিয়াং কাই-শেককে এই দাবীগুলি পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। এই সময় হইতে সাম্যবাদিগণও ভূস্বামী এবং বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার নীতি পরিত্যাগ করিলেন। সাময়িকভাবে হইলেও সমগ্র চীন এতদিনে একতাবদ্ধ হইল। চিয়াং-এর সঙ্গে এই সময় সাম্যবাদীদিগের এই মর্ম্মে এক চুক্তি হইল যে সাম্যবাদিগণ জাপ বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন এবং কৃষকদিগের প্রতিরোধ-শক্তিকে সংগ্রামশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত করিবেন। চিয়াং আশা করিয়াছিলেন যে ইহার ফলে সাম্যবাদিগণ জাপানীদের হাতে কচুকাটা হইবেন। এই কাজ ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনীর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু

পরবর্ত্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করিয়াছে যে চিয়াং ভুল বুঝিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধকালে শত্রু যতই চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সাম্যবাদিগণও ততই ছড়াইয়া পড়িয়া আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ-শক্তিকে সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। চীনের বিশাল একটি অংশ যে আজ সাম্যবাদিগণের অধিকারে রহিয়াছে ইহাই তাহার আসল কারণ।

সিয়ানের ঘটনার পর চীন একতাবদ্ধ হওয়ায় জাপানের দীর্ঘকাল পোষিত চীন জয়ের আশালতার মূল ছিন্ন হইয়া গেল। এই ঐক্য যাহাতে চীনের শক্তিবৃদ্ধিতে নিয়োজিত হইতে না পারে সেই জন্য কয়েক মাসের মধ্যেই জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল।

জাপানের অভ্যুদয়

এশিয়ার পূর্ব্ব উপকূলের অনতিদূরে অবস্থিত জাপান কতকগুলি আগ্নেয়গিরি-বহুল দ্বীপের সমষ্টি। সংখ্যায় ইহারা ৪০৭২টি। ইউরোপের মানচিত্রে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের যে স্থান, এশিয়ার মানচিত্রে জাপানের স্থানও তদনুরূপ।

জাপানীদের কথায় জাপানের নাম 'নিপ্পন' (Nippon) অর্থাৎ 'উদীয়মান সূর্য্যের দেশ'। জাপানের অধিবাসিগণ বলেন, 'ডাই নিপ্পন' (Dai Nippon) অর্থাৎ 'উদীয়মান সূর্য্যের গৌরবময় দেশ'।

জাপানের আদিম অধিবাসিগণ ওস্যানিক (Oceanic) জাতীয়। ইহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ আইনু (Ainu) নামে পরিচিত। আধুনিক জাপ জাতি ওস্যানিক এবং মঙ্গোল (Mongol) রক্তের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। জাপানের জাতীয় চরিত্র এই উভয় পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়াছে। ওস্যানিক রক্তধারার গুণে জাপানের নিকট সমুদ্রের আকর্ষণ দুর্ণিবার হইয়াছে। এইজন্য সে চায় প্রশান্ত মহাসাগরের কর্ত্তৃত্ব। মঙ্গোলীয় রক্তধারা

জাপ জাতিকে এশিয়া মহাদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনে উন্মুখ করিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার মূলে অবশ্য অন্যান্য কারণও রহিয়াছে। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব।

খ্রীষ্টোত্তর ২য় এবং ৩য় শতকে জাপান সর্ব্বপ্রথম সভ্যতার আলোক লাভ করে। রাণী জিঙ্গো (Jingo)-র রাজত্বকালে কোরিয়া-অভিযান জাপানের একটি প্রথম জাতীয় প্রচেষ্টা। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীন জাপান আক্রমণ করে। চৈনিক আক্রমণের ফলে জাপানের রূপান্তর সংঘটিত হয়। জাপানের বর্ণমালা, শিল্প এবং সাহিত্য, এক কথায়, তাহার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি, চীনের নিকট হইতে প্রাপ্ত। চৈনিক বিজেতাগণ জাপানে বর্ণমালা, চিত্রকলা, মৃৎশিল্প, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং কন্‌ফ্যুসীয় মতবাদ প্রবর্ত্তিত করেন।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মার্কো পলো (Marco Polo) এবং মেণ্ডেজ পিণ্টো (Mendez Pinto)-র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে পাশ্চাত্য জগৎ সর্ব্বপ্রথম জাপানের অস্তিত্বের কথা অবগত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে এই দু'য়ের প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগের একখানা জাহাজ জাপান-উপকূলেব অদূবে জলমগ্ন হয়। ইহার পর হইতে ইংরেজ, ওলন্দাজ, স্পেনীয প্রভৃতি জাতির জাহাজ বাণিজ্যোপলক্ষে জাপানে আসিতে আরম্ভ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং সশস্ত্র বৈদেশিক সৈন্যদলের আমদানি হইল। জেস্থইট্ (Jesuit), ডমিনিক্যান্ (Dominican) এবং ফ্রান্সিস্ক্যান্ (Franciscan) সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্ম-প্রচারকগণ বহু জাপানবাসীকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। জাপানে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে পর্ত্তুগীজ যাজক সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিযার (St. Francis Xavier)-এর নামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাগাধুনিক জাপান সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় শাসিত হইত। এই যুগে গৃহ-যুদ্ধ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে

যাবতীয় রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব সোগুনদিগের (Shogun) হস্তগত হয়। সোগুনদিগের সহিত মধ্যযুগীয় ফরাসী দেশের 'মেয়র অব্ দি প্যালেস' (Mayor of the Palace)-এর তুলনা চলিতে পারে। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পেশোয়া এবং আধুনিক নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সহিতও ইঁহাদের আংশিক সাদৃশ্য আছে। সোগুনদের অধীনে ছিলেন ডাইমিয়ো (Daimyo) অর্থাৎ সামন্তগণ। ডাইমিয়োদিগের অনুচরগণ সামুরাই (Samurai) নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদিগের অসাধারণ সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সোগুনের পদ বংশগত হইয়া যায়। সোগুন আইয়েয়াস্থ (Iyeashu) সামন্তদিগের ক্ষমতা কমাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধি করেন। আইয়েয়াস্থর বংশধরগণ টাইকুন (Tycoon) উপাধি গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় জাপানের শিল্প এবং সাহিত্য উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাপানেব বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানগণ পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। বিরক্ত হইয়া সোগুনগণ ইউরোপীয়দিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নাগাসাকির অনতিদূরে ডোসমাতে অতি ক্ষুদ্র একটি ওলন্দাজ উপনিবেশ মাত্র রহিয়া গেল। বৈদেশিকদিগের জাপানে আগমন ও জাপানীদিগের দেশত্যাগ নিষিদ্ধ এবং সমুদ্রগামী পোত নির্ম্মাণ চরমদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল।

এইভাবে ২০০ বৎসরেরও অধিক কাটিয়া যাইবার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কমোডোর পেরি (Commodore Perry) ১৮৫৩ সালে ইযেডো উপসাগরে (The Gulf of Yedo) উপস্থিত হ'ন। পর বৎসর তিনি জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে

বাধ্য করেন। আমেরিকার দেখাদেখি ইংল্যাণ্ডও জাপানে প্রবেশাধিকার দাবী করিল। ১৮৬৩ সালে সম্মিলিত ইংরেজ ও মার্কিণ নৌ-বহর জাপানের উপকূলভাগে গোলাবর্ষণ করে। একান্ত অনিচ্ছায় জাপানকে রুদ্ধ দ্বার খুলিতে হইল। এইভাবে রক্ত-রঞ্জিত বিরোধের মধ্য দিয়া জাপান আধুনিক বিশ্বের আন্তর্জ্জাতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। এই জন্যই কি জাপানের অভ্যুদয় এবং পতনের ইতিহাস প্রত্যেক পর্ব্বেই শোণিত-সিক্ত হইয়া রহিয়াছে ?

জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে বৈদেশিকগণের হাতে পরাজয় এবং তাহারই ফলে দ্বার উন্মুক্ত করিতে বাধ্য হওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দেশময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৬৮ সালে এই বিদ্রোহের অবসানে সোগুনের পদ তুলিয়া দেওয়া হইল এবং মিকাডো (Mikodo) অর্থাৎ সম্রাটের হাতে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হইল। ইহাই আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা 'মেইজি রেষ্টোরেশন' (Meiji Restoration)।

তারপর আসিল সংস্কারের যুগ। সামন্ততন্ত্রের বিলোপ সাধন করিয়া ডাইমিয়োদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম আর রাজ-ধর্ম্ম (State-religion) রহিল না। সিণ্টোধর্ম্ম (Shintoism) তাহার স্থান গ্রহণ করিল। সামন্তগণের কুলক্রমাগত অধিকারসমূহ সঙ্কুচিত করা হইল। সমাজের নিম্নতর শ্রেণীসমূহের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ এবং অক্ষমতা বিলোপ করা হইল। নাগরিকগণের ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। অভিনব জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হইল। এই নব-পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে জাপানের ব্যবহারশাস্ত্র রচিত হইল।

পৃথিবীর ইতিহাসে জাপানের দ্রুত উন্নতির তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৮৬৬ সালে যে জাপানের মধ্যযুগ চলিতেছিল, কিঞ্চিদধিক ৩০ বৎসরের ব্যবধানে ১৯০০ সালে সে জাপানই সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক এবং প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ের জাপান সমসাময়িক ইউরোপের যে কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সমকক্ষ এবং রুশিয়া অপেক্ষা উন্নত ছিল।

১৮৯৪-৯৫ সালের প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের পর জাপানের রাজ্যবিস্তারের সূচনা হয়। এই যুদ্ধে চীন সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। সিমোনোসেকির সন্ধি অনুসারে চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে এবং মাঞ্চুরিয়ার লিয়াওটুং(Liaotung) অন্তরীপ এবং ফরমোশা ও পেস্কাডোর দ্বীপ জাপানের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এতদ্ব্যতীত চীন জাপানকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছিল। এই সময় রুশিয়া কোরিযার প্রতি শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। ফরাসীগণ ইতঃপূর্ব্বেই আনাম এবং টংকিনে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণীও দূরপ্রাচ্যে কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। জাপানের শক্তি-বৃদ্ধি ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থের পরিপন্থী। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় জাপান যুদ্ধজয়ের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিল না। উল্লিখিত ত্রি-শক্তির চাপে পড়িয়া তাহাকে ৩০,০০০,০০০ টায়েলের (Tael) বিনিময়ে লিয়াওটুং ছাড়িয়া দিতে হইল। এশিয়ার ভূভাগে জাপানের অধিকার স্বীকৃত হইয়াও স্থাপিত হইতে পারিল না; কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে বিশ্বের দরবারে জাপানের মর্য্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই রুশিয়ার সহিত জাপানের মনোমালিন্য চলিতেছিল। যুদ্ধের পর রুশিয়া লিয়াওটুং অধিকার করিয়া পোর্ট্স্মাউথ (Portsmouth) পর্য্যন্ত ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ (Trans-Siberian Railway) বিস্তৃত

করে। ১৯০০ সালের মধ্যেই রুশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে জাঁকিয়া বসিল। জাপান স্বভাবতঃই শঙ্কিত হইয়া পড়িল। ফলে ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ (Russo-Japanese War) আরম্ভ হইল। স্থল এবং জলপথে রুশীয় সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। রুশিয়ার বাল্টিক বহর সুসিমা প্রণালীতে বিধ্বস্ত হইল। আভ্যন্তরীণ অশান্তির জন্য জার (Tsar) জাপানের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯০৫ সালে স্বাক্ষরিত পোর্ট্‌স্‌মাউথ সন্ধির (Treaty of Portsmouth) সর্ত্তানুযায়ী রুশিয়া ১৮৭৫ সালে অধিকৃত সাখালিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণার্দ্ধ এবং লিয়াওটুং জাপানকে ছাড়িয়া দিল। মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়াতে রুশীয় আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। কোরিয়াতে জাপানের 'বিশেষ রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ' ('Paramount political, military and economic interests') স্বীকৃত হইল। রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হইল। ইহার পর ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া গ্রাস করে। জাপ-অধিকৃত কোরিয়ার নূতন নাম হইল চোজেন (Chosen)।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধকালে (১৯১৪-১৮) জাপান সাময়িকভাবে সুদূরপ্রাচ্যে একাধিপত্য লাভ করে। এই সময় তাহার শিল্প ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হয়। জাপানের রপ্তানি বহু গুণ বাড়িয়া যায় এবং আমদানি হ্রাস পায়। জাতীয় ঋণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে শোধ করিয়া দেওয়া হয়।

এদিকে ১৯১৫ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত তখন জাপান পিকিং সরকারের নিকট কুখ্যাত 'একবিংশতি দাবী' উপস্থিত করিল। সামান্য রদবদল করিয়া চীনকে জাপানের অন্যায় দাবীসমূহ পূরণ করিতে হইল। ফলে চীনের আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে জাপানের কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইল। মাঞ্চুরিয়া এবং সান্টুং-এ জাপান কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করিল। ১৯১৭ সালের ইঙ্গ-জাপ সন্ধিতে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধের পর শান্তি-বৈঠকে বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত জার্ম্মানীর

অধিকৃত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সান্‌টুং-এর উপর জাপানের দাবী সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই বৎসরই অনুরূপ সর্ত্তে ফ্রান্স এবং ইটালীর সহিতও জাপানের সন্ধি হয়। ভার্সাই সন্ধি-বৈঠকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সমস্ত সন্ধির কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। ইহার পর সুদূরপ্রাচ্যে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার সর্ত্তে রুশিয়া এবং জাপানের মধ্যেও একটি সন্ধি হয়। এই ১৯১৭ সালেই 'ল্যান্‌সিং-ইসিয়াই চুক্তি' (Lansing-Ishii Agreement) দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র চীনে জাপানের বিশেষ স্বার্থ আছে বলিয়া স্বীকার করে ("Japan because of geographical propinquity has special interests in China.")।

১৯২১ সালের পূর্ব্বেই সুদূরপ্রাচ্যে জাপানের স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় দিকের সমুদ্রপথে তখন তাহার কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরে সাখালিন (জাপানী নাম কারাফুটো), কুরাইল দ্বীপের কিয়দংশ এবং হোক্কাইডো অধিকৃত হওয়ায় ওখোটস্ক সাগরে প্রবেশ-পথের কর্তৃত্ব তখন তাহার করতলগত। সাখালিন, হোক্কাইডো এবং কোরিয়া তাহার আয়ত্তে বলিয়া কাহাকেও জাপান সাগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া না দেওয়া তাহার ইচ্ছাধীন। ফুকিয়েন প্রদেশ হইতে চীন এবং সাইবেরিয়ায় গমনাগমন পথের নিয়ন্ত্রণাধিকারও তখন তাহারই হাতে। মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ এবং নির্গমন-পথও তখন তাহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

এই অবস্থায় পৌছিতে জাপানকে প্রতি দশ-দশ বৎসরের ব্যবধানে ১৮৯৪-৯৫ (প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ), ১৯০৪-৫ (রুশ-জাপান যুদ্ধ) এবং ১৯১৪-১৮ (প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ) সালে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জাপান নূতন নূতন ভূখণ্ড জয় করিয়া বিজিত অঞ্চলে বাণিজ্য-বিস্তার এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের সুযোগ করিয়া লইয়াছে।

কাঁচামালের অনটন, দেশে উৎপন্ন শিল্পজ পণ্য বিক্রয়ের উপযোগী বাজারের অভাব, দ্রুতবর্দ্ধনশীল জন-সংখ্যার মাথা গোঁজার জন্য স্থান

সংগ্রহের প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক কারণ বরাবর জাপানের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে।

জাপানের কাঁচামালের অপ্রাচুর্য্যকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা গুরুতর বলিয়া মনে হয় প্রকৃত প্রস্তাবে এই অপ্রাচুর্য্য ততটা গুরুতর নহে। ১৯৩১ সালে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া এবং তাহার পর চীনের বিশাল একটা অংশ গ্রাস করিবার পর এই সমস্যা আর মোটেই মারাত্মক ছিল না। খাদ্যোৎপাদনের দিক্ হইতে জাপান স্বয়ং-সম্পূর্ণ। নিজের প্রয়োজনীয় কয়লার শতকরা ৯৫ ভাগ এবং গ্র্যাফাইট (Graphite), গন্ধক ও অন্যান্য কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের প্রায় সমস্তটাই তাহার নিজের দেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহার অসুবিধাও আছে যথেষ্ট। নিজের প্রয়োজনীয় নিকেল, পারা এবং পেট্রোলের প্রায় সমস্তটাই তাহাকে বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। জাপানের প্রয়োজনীয় লৌহ এবং ইস্পাতের শতকরা ৬৫ ভাগ বাহির হইতে আসে। সীসা, দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম, তামা, তুলা এবং রবারের জন্যও জাপান পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু শিল্পজ পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের সমস্যাই অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও জাপানের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই জাপান পররাজ্য গ্রাসকরিবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রম-শিল্পে উন্নত, পুঁজিবাদী জাপানের বাঁচিবার আর কোন পথও ছিল না।

দ্রুতবর্দ্ধনশীল জন-সংখ্যার জন্য মাথা গুঁজিবার ঠাঁই সংগ্রহ করা জাপানের পক্ষে সত্যই জীবন-মরণ সমস্যা। জাপানে প্রতি বর্গ মাইলে ২৭৫০ জন লোকের বাস। পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই মনুষ্য-বসতি এত ঘন নহে। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে জাপানে প্রতি মিনিটে চারিটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই হারে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে ১৯৬০ সালে জাপানের জন-সংখ্যা ৯৯,০০০,০০০-তে দাঁড়াইবে।

১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত জাপান নিজেকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি বলিয়া মনে করিত। সে বিশ্বাস করিত যে সে পূর্ব্বএশিয়ার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট

অভিভাবক। এশিয়া মহাদেশে রুশিয়া অপেক্ষা অধিকতর শক্তিমত্তা অর্জ্জন এবং চীন হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করা জাপানের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল। এই রাজনৈতিক কারণের পশ্চাতে অবশ্য অর্থনৈতিক কারণ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

জাপানের পররাষ্ট্র দফ্‌তর বরাবরই রাজ্যবিস্তার-নীতি অনুসরণ করিয়াছে। ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই নীতি সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত হইয়াছে। ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিযা গ্রাস করে। আয়তনে মাঞ্চুরিয়া জার্ম্মানীর দ্বিগুণ (৫০৩,০০০ বর্গমাইল)। ইহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০,০০০। ইহার পর জাপান জাতি-সঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে জাপান জার্ম্মাণীর সহিত কো-মিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তিতে (Anti-Com-Intern Pact) বদ্ধ হয়। এদিকে হিট্‌লার এবং মুসোলিনি 'রোম-বার্লিন অক্ষ' (Rome-Berlin Axis) গঠন করেন। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে ইটালী কো-মিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এইভাবে 'রোম-বার্লিন-টোকিও ত্রিভুজ' (Rome-Berlin-Tokyo Triangle) এবং 'ফ্যাসিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল' (Fascist International)-এর অভ্যুদয় ঘটিল।

চীন ও জাপান

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভ হইতে বিশ্বব্যাপী দুর্য্যোগের যে ঘনঘটা আরম্ভ হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত তাহার অবসানের কোন লক্ষণই চোখে পড়িতেছে না। প্রচলিত অর্থনীতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই দুর্য্যোগের শেষ হইবে না।

১৯৩০ সালে চীনে দ্বিতীয় বিপ্লবের অবসানে সবেমাত্র নান্‌কিং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তরচীন এবং মাঞ্চুরিয়া তখন

নান্‌কিং সরকারের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে ইহার ফলে চীনের যাবতীয় সমস্যার স্থায়ী অথবা সাময়িক সমাধান হইয়াছিল, তিনি খুবই ভুল করিবেন।

এই সময় ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরে কিয়াংসি প্রদেশে কম্যুনিষ্টগণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৯২৭ সালে চীনে প্রথম সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা এবং পর বৎসর চৈনিক লালফৌজ গঠিত হওয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৯৩১ সালে নান্‌কিং সরকার কর্ত্তৃক কিয়াংসি'র কম্যুনিষ্টদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে নান্‌কিং সরকারের মর্য্যাদা এবং প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পায়।

কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং এই দুই দলের রাজনৈতিক মতানৈক্যই চীনের একমাত্র সমস্যা ছিল না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের বিরোধও দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিয়াং কাই-শেকের ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠা অনেকেরই চক্ষুশূল ছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে ওয়াং চিং-ওয়াই'র নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৭ সালে এই ওয়াং চিং-ওয়াই-ই কম্যুনিষ্টদিগের সহিত একযোগে উহান সরকার স্থাপন করিযাছিলেন। ১৯৩৯ সালে ইনি ফ্যাসিষ্টদিগের সহিত যোগদান করেন। নান্‌কিং-এর পতনের পর তিনি জাপ-তাঁবেদার নান্‌কিং সরকারের রাষ্ট্রপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে ওয়াং চিং-ওয়াই চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। উত্তরচীনের প্রধান দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়াং চিং-ওয়াই'র সহিত যোগদান করিয়া নান্‌কিং জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই বিদ্রোহ খুব প্রবল আকার ধাবণ করিলেও চিয়াং কাই-শেক ইহা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এদিকে দক্ষিণচীনে আবার ক্যুওমিন্‌টাং দল এবং কোয়াংসি'র রণ-নায়কগণের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি লইয়া মতবিরোধের ফলে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

জাপান শ্যেনদৃষ্টিতে চীনের অন্তর্ব্বিরোধের গতি এবং প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছিল। সুযোগ উপস্থিত হইলেই চীনের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া তাহার বহুদিনের সঙ্কল্প। উত্তরচীনের যে তিনটি প্রদেশ—হেইলুংকিয়াং (Heilungkiang), লিয়াওনিং (Liaoning) এবং চিলিন বা কিরিণ (Chilin or Kirin)—বৈদেশিকগণের নিকট মাঞ্চুরিয়া নামে পরিচিত তাহা গ্রাস করিবার জন্য জাপান খুবই উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জাপান এই অঞ্চলে স্বীয় প্রভাব বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছিল। মাঞ্চুরিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার এবং অধিকার স্থাপনের প্রয়াস ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। পরাজিত রুশিয়া পোর্ট্‌স্‌মাউথের সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী মাঞ্চুরিয়াতে রেলপথ সংক্রান্ত তাহার যে অধিকার ছিল তাহা জাপানের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। আর ইহারই ফলে রুশিযাকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঞ্চুরিয়া হইতে তল্পিতল্পা গুটাইতে হয়।

কালক্ষেপ না করিয়া জাপান এই নবলব্ধ গ্রাসকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বেষ্টন করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। পোর্ট্‌স্‌মাউথ সন্ধির সর্ত্তানুসারে সমগ্র দক্ষিণমাঞ্চুরিয়া রেলপথ (South Manchurian Railway) সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত হইল। মাঞ্চুরিয়াতে অনেক জাপানী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। জাপান হইতে দলে দলে ভাগ্যান্বেষী আসিয়া মাঞ্চুরিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উপনিবেশ হিসাবে মাঞ্চুরিয়া কোনদিনই জাপানের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে নাই।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মাঞ্চুরিয়ার ভূমি অতিশয় উর্ব্বর। দুর্ভিক্ষ এবং অজন্মার সময় প্রতি বারই মহাচীনের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করিয়া হোপেই, সান্টুং এবং হোনান হইতে বহু দুর্গত কৃষক পরিবার জীবিকার অন্বেষণে মহাপ্রাকার অতিক্রম করিয়া মাঞ্চুরিয়াতে আগমন

করিত। ফলে ১৯০৫ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে মাঞ্চুরিয়ায় জন-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।

একদিকে মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছিল এবং অপর দিকে দলে দলে বারবণিতা, দস্যু, ভবঘুরে ইত্যাদি অপরাধপ্রবণ শ্রেণীর লোক জাপান হইতে চীনে আসিয়া উপস্থিত হইল।[১] চীনে যে সমস্ত জিনিসের আমদানি নিষিদ্ধ ছিল, ইহাদিগের সহাযতায় এবং অন্যবিধ উপায়ে তাহা গোপনে আমদানি করা হইতে লাগিল। অহিফেন এবং নার্কটিক জাতীয় মাদক দ্রব্যের বিক্রয় এবং ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা বৰ্দ্ধিত হইল। যৌন ব্যাধিতে জাপ-অধিকৃত অঞ্চল ছাইয়া গেল।

কিছুদিন পরে জাপান হইতে আগন্তুকদিগের মধ্যে কেহ কেহ মাঞ্চুরিয়াতে মোতায়েন জাপ বাহিনীর উপদেষ্টা নিযুক্ত হইল। এই সমস্ত নব-নিযুক্ত উপদেষ্টার পদাধিকার বলে চীনের সৰ্ব্বত্র অবাধ গমনাগমনের অধিকার ছিল। ইহারা এই সুযোগে সামরিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া জাপ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে লাগিল। এই গুপ্তচরের দল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বদেশের উপকার না করিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাহার গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে। চীন-জাপান বিরোধ না মিটিবার জন্য ইহারাই মুখ্যতঃ দায়ী। ইহারা নানা প্রকারে জাপানকে চীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। ইহাদেরই প্রদত্ত ভ্রান্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া জাপান আশা করিয়াছিল যে খুব সহজেই চীনকে পর্য্যুদস্ত এবং পদানত করা যাইবে।

১। "* * * Prostitutes, criminals, bandits, tramps, and general good-for-nothings, scum that the great Japanese Empire cast up from its stores, poured into China to make their fortunes."
—*A Short History of Chinese Civilisation* by Tsui Chi, P. 279.

মহাচীনের অভিনব জাতীয় জাগরণ এই গোয়েন্দাদলের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল।

চীন আক্রমণ করিয়া জাপান যে একটি অতিশয় মারাত্মক ভুল করিয়াছিল, পরবর্ত্তী ঘটনাবলী তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে সুযোগ-সন্ধানী জাপান অত্যন্ত সু-নির্ব্বাচিত সময়ে চীনেব বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিল। আমাদিগকে ১৯৩১ সালে চীনের অবস্থার কথা মনে রাখিতে হইবে। ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনী তখন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া মধ্যচীনে কম্যুনিষ্ট দলনে ব্যাপৃত। অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার মত ক্ষমতা, প্রবৃত্তি বা অবসর নান্‌কিং জাতীয় সরকারের তখন নাই। ঠিক এই সময়ই পীতনদী এবং ইয়াংসিকিয়াং-এর বন্যায় চীনের বিশাল একটি জনবহুল অঞ্চল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। লিখিত ইতিহাসে এই তুইটি নদীর এই প্রকার প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের কথা আর পাওযা যায় না। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ পরিবার জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইযাছিল। তদপেক্ষাও অনেক অধিকসংখ্যক পরিবারকে পববর্ত্তী শীতকালে প্লাবনের ফলে অজন্মার জন্য অনশনে কাল কাটাইতে হইয়াছিল। এই বৎসবই শরৎকালে জাপানের চীন-অভিযান আরম্ভ হয।

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টার সময লিয়াওনিং-এর রাজধানী মুক্‌ডেনের ঠিক বহির্দ্দেশেই দক্ষিণ-মাঞ্চুবিযা রেলপথেব একটি সেতু বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জাপানের পক্ষ হইতে বলা হইল যে জেনারেল চ্যাং সুয়ে-লিয়াং-এর অধীন সৈন্যদল ইহার জন্য দায়ী। জাপ সৈন্যগণ চীন সৈন্যের ছাউনি আক্রমণ করিয়া নিদ্রামগ্ন সৈন্যদলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। সুপ্তিমগ্ন হতভাগ্যগণ আত্মরক্ষার অবসবও পাইল না। জাপ সৈন্য অতঃপর মুক্‌ডেন অধিকার করিল।

ইটালীয় লেখক এ্যামিলেটো ভেস্পা (Ameleto Vespa)-র মতে মুক্‌ডেনের এই ঘটনাবলী পূর্ব্ব-পরিকল্পিত। তিনি বলেন যে লিয়াওইয়াং,

ইংকো এবং ফেংহুয়াংচেং-এ অবস্থিত জাপ বাহিনীকে দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেলপথে উল্লিখিত বিস্ফোরণের পূর্ব্বের দিন অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় মুক্‌ডেন অভিমুখে যাত্রা করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই আদেশ অনুসারে তিনটি জাপ বাহিনীই বিস্ফোরণের সাত ঘণ্টা পূর্ব্বে মুক্‌ডেন অভিমুখে যাত্রারম্ভ করিয়াছিল। বিস্ফোরণের মাত্র ছয় ঘণ্টা অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর (ইংরেজী হিসাবে ১৯শে) রাত্রি ৪টার মধ্যেই মুক্‌ডেনের নগর প্রাচীরে এই মর্ম্মে হাজার হাজার বিজ্ঞপ্তি আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে মাঞ্চুরিয়া সরকার জাপানের কর্ত্তৃত্বাধীন রেলপথের উপর আক্রমণের আদেশ দিয়া স্বীয় মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন।[১]

মুক্‌ডেনের উপকণ্ঠে অবস্থিত চীনের বিমানঘাঁটিগুলিও জাপান সঙ্গে সঙ্গেই অধিকার করিয়া লইল। এই সময় নান্‌কিং সরকারের প্রায় ৫০০ বিমান জাপানের হস্তগত হয়। বিনাদোষে আক্রান্ত চীন কোন প্রকার বাধা দেওয়ার সুযোগ পর্য্যন্ত পাইল না। পরদিন অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়ার ১০টি শহর জাপ সৈন্যদলের হস্তগত হয়। এক পক্ষ কালেরও কম সময়ের মধ্যে লিয়াওনিং ও চিলিনের অর্দ্ধেকের বেশী শহরে জাপানের অধিকার স্থাপিত হইল।

সুদূরপ্রাচ্যে এই অভিনব সঙ্কট যে যে জাতির সেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক (Strategic) স্বার্থ ছিল, তাহাদের মধ্যে একটা সংশয় এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিল। প্রত্যেকেই বুঝিল যে একটা

১। "The Japanese troops stationed at Liaoyang, Yingkow, and Fenghuancheng had, the day before the incident received their orders to advance on Mukden at 3 P M. on September 18th. Seven hours before the alleged explosion they had already started towards their destination. By 4 A. M. of the 19th, only six hours after the alleged explosion, thousands of printed posters had already been posted on the walls of Mukden and in these it was said that the Manchurian Government was discredited, since it had ordered an attack on the Japanese railway."

—*Secret Agent of Japan* by Ameleto Vespa, Ch. II.

প্রতিবিধান করা দরকার। কিন্তু প্রতিবিধানের পথ যে কি তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে স্বীয় সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা চীনের নাই। প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি চীনের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করে, তাহারা চীনদেশে কি করে এবং চীন সম্পর্কে কি নীতি অনুসরণ করে তাহাই ছিল ইহাদিগের মতে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। চীন নিজে কি করে না করে তাহা গৌণ এবং অবান্তর। এই মনোভাবের ফলেই চীন সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। প্রধান প্রধান বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি মনে করিত যে জাপানের জুলুম হইতে চীনকে রক্ষা করিবার প্রয়াস একটি ব্যয়বহুল নিছক পরোপকার-প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন রুশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানকে সমর্থন করা যায়, জাপানের বিরুদ্ধে যে আবার চীনকে সেই প্রকার সমর্থন করা চলে একথা কেহই বিশ্বাস করিত না।

জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে কোন প্রকার সাহায্য না করার সমর্থনে দুইটি যুক্তির অবতারণা করা হইল। প্রথমতঃ, সর্ব্বতোভাবে বৈদেশিক কর্তৃত্ব-মুক্ত চীনে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু থাকিবে না ("would be an unruly country") এবং তাহার ফলে বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই জাপান যদি চীনে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহাতে আপত্তি করা বা শঙ্কিত হওয়া অনুচিত এবং নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, চীন এবং জাপানের পারস্পরিক সম্পর্ক আসল সমস্যা নহে। রুশ-জাপান সম্পর্কই প্রকৃত সমস্যা ("the real issue was not between Japan and China at all, but between Japan and Russia")। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া জাপান নিঃসন্দেহে রুশিয়াব

বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং নিশ্চয়ই মাঞ্চুরিয়াকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিবে। জাপান সহজে জয়লাভ করিলেও পূর্ব্ব-সাইবেরিযার অনুন্নত অঞ্চলগুলির পরিপূর্ণ শোষণের ব্যবস্থা করিতেই তাহার বহু বৎসর কাটিয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজন মূলধনের জন্য তাহাকে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের নিকট হাত পাতিতে হইবে। সুতরাং জাপানকে ইহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতেই হইবে। অনায়াসে বা অল্পায়াসে সাইবেরিয়াবিজয় নিষ্পন্ন না হইলেও ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের কোন ক্ষতি নাই। রুশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানকে সাহায্য করিবাব অজুহাতে জাপ আক্রমণের ফলে সুদূর প্রাচ্যে তাহাদের যে প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়াছে তাহারা পুনরায় তাহা লাভ করিবার সুযোগ পাইবে।

এক দিকে জাপানের মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প, অপর দিকে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার ঔদাসীন্যের ফলে নান্‌কিং সরকার এবং জন-সাধারণ দ্বিধাগ্রস্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মহাচীনের জনসাধারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে জাপানের এবারকার আক্রমণ ঊনবিংশ শতাব্দীর জাপ সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্ত্তিত রূপ মাত্র নহে। নূতন সন্ধি-বন্দর, নূতন কোন প্রদেশের ইজারা বা অধিকতর অর্থ নৈতিক সুযোগ প্রদান করিয়া এইবার জাপানকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইবে না। মহাচীনের বিশাল এবং সমৃদ্ধিশালী উত্তরাঞ্চল ও পূর্ব্বাঞ্চল গ্রাস করাই এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। স্পষ্ট বোঝা গেল যে এইবার যে সংগ্রামের সূচনা হইল তাহাতে জয় পরাজয়ের উপর চীনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যদি জাপানের হাতে চীনের পরাজয় ঘটে তাহার স্বাধীনতা এবং জাতীয় সত্তা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

নান্‌কিং সরকার মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থানকারী প্রাদেশিক ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে আদেশ দিলেন। তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে জাপানের সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়াইয়া চলিবার নির্দ্দেশ

প্রদান করা হইল। এই সময় জেনেভাতে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশন চলিতেছিল। চীনের পক্ষ হইতে জাতি-সঙ্ঘের নিকট জাপানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল। চীন এবং জাপান উভয়েই তখন সঙ্ঘের সদস্যশ্রেণীভুক্ত ছিল। জাপান বলিল যে তাহার মাঞ্চুরিয়া আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা নাই। অথচ জাপ বাহিনী তখনও মাঞ্চুরিয়ায় অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছিল। আর চীন জাতি-সঙ্ঘের মুখের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়াছিল।

জাতি-সঙ্ঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নেতৃস্থানীয় অনেকেরই জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার ঘোরতর অনিচ্ছা দেখা গেল। যুক্তরাষ্ট্র কোন দিনই জাতি-সঙ্ঘের সদস্য ছিল না। তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ ষ্টিমসন (Mr. Stimson) জাপানকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধজাহাজ পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে ইংল্যাণ্ডকেও জাহাজ পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড সম্মত না হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। ইংল্যাণ্ডে তখন মিঃ বল্‌ড্‌ইনের নেতৃত্বে রক্ষণশীল সরকার গঠিত হইয়াছে। এই সরকার জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া গ্রাসকে অবিমিশ্র অমঙ্গলের কারণ বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে জাপান ইংরেজ-প্রভাবাধীন ইয়াংসি উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতেছে না। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে জাপ আক্রমণের ফলে রুশিয়ারই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল। এদিকে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ চীনে বৈদেশিকগণের বিশেষ অধিকারসমূহ লোপ করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। ইংল্যাণ্ড জাপান অপেক্ষা এই আন্দোলনকেই বেশী ভয় করিত। ইংল্যাণ্ডের অনেকে মনে করিলেন যে মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিবার বিনিময়ে চীনে ইংরেজ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য জাপানের সাহায্য দাবী করিবার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। জাপানের বিরুদ্ধে বৈদেশিক সাহায্যের প্রত্যাশী নান্‌কিং সরকার

যে চীনে বৈদেশিক অধিকার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে পারিবেন না তাহাও ইঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না।

ইংল্যাণ্ডের অন্যতম সচিব এ্যামেরি সাহেব (Mr. Amery) ত মাঞ্চুরিয়াতে অনুসৃত জাপ নীতি খোলাখুলি সমর্থনই করিলেন। তিনি বলিলেন যে এই নীতির জন্য যদি জাপানের উপর দোষারোপ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ এবং মিশরে অনুসৃত ইংল্যাণ্ডের নীতিও সমর্থন করা চলেনা।[১] ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব স্যর জন সাইমন (Sir John Simon) জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে চীনের প্রতি সহানুভূতিসূচক অনেক কথা বলিবার পর জাপানের সমর্থনে এত যুক্তির অবতারণা করিলেন যে জাপ প্রতিনিধি মিঃ মাট্স্যুওকা (Mr. Matsuoka) বলিয়াছেন যে তিনি নিজেও অধিকতর দক্ষতার সহিত জাপানের পক্ষে ওকালতি করিতে পারিতেন না।[২]

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের সংবাদ পাইবামাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র অতি তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দা করিল। তদানীন্তন সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মঃ লিট্ভিনফ্ (M. Litvinoff) সরকারী ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে চীন-জাপান সংঘর্ষ বন্ধ করিবার জন্য রুশিয়া আন্তরিক চেষ্টা করিতে আগ্রহান্বিত হইলেও জাতি-সঙ্ঘের সদস্য-রাষ্ট্রদিগের পক্ষ হইতে এই উদ্দেশ্যে সমবেত চেষ্টা করিবার কোন প্রকার আগ্রহ দেখা যায় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকারী মুখপত্র 'ইজ্ভেষ্টিয়া' (Izvestia) চিয়াং কাই-শেকের নিষ্ক্রিয়তার অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিয়া বলিল

১। "Who is there among us to say that Japan ought not to have acted with the object of......defending herself against......a vigorous Chinese nationalism? Our whole policy in India, our whole policy in Egypt, stands condemned if we condemn Japan."
—*Mr. L. S. Amery.*

২। *The Unfinished Revolution in China* by I. Epstein, p. 53.

যে ক্যুওমিন্‌টাং সরকার চীনকে কত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন জনসাধারণ এইবার তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে।[১]

জাপান বলিল যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিস্তার এবং সাম্যবাদের প্রচার ও প্রসার বন্ধ করা ব্যতীত তাহার মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আজ ১৯৪৮ সালের ন্যায় ১৯৩১ সালেও প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি বল্‌শেভিক রুশিয়ার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিত। সুতরাং মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের অগ্রগতি বন্ধ করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। একবার রেলপথ-সন্নিহিত অঞ্চল হইতে জাপ সৈন্য অপসারণ এবং একটি আন্তর্জ্জাতিক এলাকা (International zone) স্থাপন করিবার কথা শোনা গেলেও শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইল না। অবশেষে সরেজমিন তদন্ত করিবাব জন্য লর্ড লিটন (Lord Lytton)-এর নেতৃত্বে মাঞ্চুরিয়াতে একটি কমিশন প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই কমিশন 'লিটন কমিশন' (Lytton Commission) নামে পরিচিত।

১৯৩২ সালের মে মাসে কমিশনের সদস্যগণ হারবিন্ (Harbin) পৌছিলেন। তাহার পূর্ব্বেই জাপান প্রকৃতপ্রস্তাবে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া পদানত করিয়া হেইলুংকিযাং, লিযাওনিং এবং কিরিনে তাঁবেদার সরকার গঠন কবিবার উদ্যোগ করিতেছিল। কমিশন যাহাতে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে না পারে তাহার জন্য জাপ কর্ত্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইলেন। যে সমস্ত হোটেলে কমিশনের সদস্যগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল সেগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত হইল। এই সমস্ত হোটেলের জন্য বাছিয়া বাছিয়া এমন সমস্ত চাকর-চাকরাণী নিযুক্ত করা হইল যাহারা প্রাণান্তেও উৎকোচ গ্রহণ করিবেনা বা সত্য ঘটনা প্রকাশ করিবেনা।

১। "* * * * this new and unheard of degradation will doubtless reveal to the Chinese people the degree of weakness to which the country has been brought by Kuomintang feudal-bourgeois reaction, the shameful agent of Imperialism." —*The Izvestia.*

কমিশনের সদস্যগণের সহিত পত্রালাপ করিয়াছেন এই সন্দেহে বহু চৈনিক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। জাপ কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন যে কমিশনের সহিত কোন প্রকার 'বে-আইনী' অর্থাৎ জাপ কর্ত্তৃপক্ষের অননুমোদিত পত্রালাপ প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এই অবস্থায় 'লিটন কমিশনের' রিপোর্ট যে পক্ষপাত-দুষ্ট হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিছুদিন পরে জাপান জাতি-সঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে জাতি-সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা পরিষ্কার ধরা পড়িল।

এদিকে চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয় নীতির ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, জাপান তাহার জন্য শঙ্কিত হইয়া পড়িল। অনেক দিন হইতেই চীনে জাপানী পণ্য বর্জ্জনের আন্দোলন চলিতেছিল। এইবার ইহার উপর আরও জোর দেওয়া হইল। দোকানদারগণ জাপানী ক্রেতার নিকট সওদা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিল। ব্যাঙ্কগুলি জাপানী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত আর্থিক আদানপ্রদান করিতে অস্বীকার করিল। ছাত্রসমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল এবং কোন কোন স্থানে ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলেন। চীনে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক প্রভাবের প্রধান কেন্দ্র সাংহাইতেই এই সময় জাপ-বিরোধী মনোভাব সর্ব্বাপেক্ষা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে সাংহাই'র রাজপথে চীনের এবং জাপানের কয়েকজন অধিবাসীর মধ্যে একটি ছোট-খাট সঙ্ঘর্ষের পর উত্তেজিত একটি জাপানী জনতা 'থ্রি ফ্রেণ্ড্‌স্ ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাসোসিয়েশন' (Three Friends Industry Association) নামক সাংহাই'র একটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। ইহার পর চীন এবং জাপানের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। এই সময় সাংহাই বন্দরের অনতিদূরে

অবস্থিত জাপ বহর হইতে গোলাবর্ষণের ফলে 'কমার্শিয়াল প্রেস' (Commercial Press) এবং 'ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী' (Eastern Library) নামক দুইটি প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 'কমার্শিয়াল লাইব্রেরী' চীনের সর্ব্বপ্রধান পুস্তকবিক্রয়-প্রতিষ্ঠান ছিল। 'ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী'তে চীন ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন পুস্তকের সর্ব্ববৃহৎ সংগ্রহটি রক্ষিত ছিল। এতদ্ব্যতীত নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বহু মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপিও এখানে সংরক্ষিত হইযাছিল।

বন্দবের সন্নিকটে অবস্থিত জাপ বহরের একাংশ গোলমালের সংবাদ পাইয়াই বন্দরের ভিতর ঢুকিযা পড়িয়াছিল। বহরের অধ্যক্ষ প্রবাসী জাপানীদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে বক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। সাংহাই'র ইংরেজ এবং মার্কিণ দূতাবাসকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে চার ঘণ্টার মধ্যে সাংহাই শহর অধিকার করা হইবে। এই আস্ফালন অবশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

নান্‌কিং সবকার তখনও আশা কবিতেছিলেন যে জাতি-সঙ্ঘ চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া জাপানকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। কিন্তু সাংহাইতে অবস্থিত নান্‌কিং সরকারের 'ঊনবিংশ বাহিনী' (The Nineteenth Army) নামে অভিহিত সৈন্যদল শত্রুর সম্মুখে পশ্চাদপসরণ করিতে সম্মত হইল না। জনমতও সৈন্যবাহিনীর অনুকূল ছিল। 'ঊনবিংশ বাহিনী'ব প্রবল বাধার বিরুদ্ধে আক্রমণকারী জাপ সৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। ফলে যুদ্ধজয়ের আশায় পব পর তিন বার নূতন জাপ সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। জাপান এবং উত্তরচীন হইতে সাংহাইতে নূতন নূতন সৈন্য আমদানি করা হইল। নান্‌কিং-সাংহাই রেলপথের উত্তরে অবস্থিত চাপেই (Chapei) জেলাতে ভীষণ যুদ্ধের পর 'ঊনবিংশ বাহিনী' পিছনে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। টোকিও বা নান্‌কিং কাহারও সাংহাইতে বড রকমের যুদ্ধে লিপ্ত হওযার ইচ্ছা

ছিল না। অতঃপর ইংল্যাণ্ডের মধ্যস্থতায় চীন-জাপান শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। একটি নিরপেক্ষ কমিশনের পর্য্যবেক্ষণাধীনে সাংহাই এবং সাংহাই'র উপকণ্ঠ হইতে জাপ সৈন্য সরাইয়া নেওয়া হইল।

সাংহাইতে যখন চীন-জাপান সঙ্ঘর্ষ চলিতেছিল জাপান তখন মহাপ্রাকারের ঠিক বহির্ভাগে এবং মাঞ্চুরিয়ার লিয়াওনিং প্রদেশের অব্যবহিত পশ্চিমে উত্তর-পূর্ব্ব চীনের জিহল (Jehol) অধিকার করে। ইহার পর জিহল, হেইলুংকিয়াং, লিয়াওনিং এবং কিরিণ এই চারিটি প্রদেশ লইয়া জাপান মাঞ্চুক্যুও (Manchukuo) নামে একটি নূতন রাষ্ট্র গঠন করে। সিংহাসনত্যাগী মাঞ্চু সম্রাট স্থুয়ান্ টুং-কে এই নব-প্রতিষ্ঠিত জাপ-তাঁবেদার রাষ্ট্রের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তাঁহার বেনামিতে জাপানই প্রকৃতপ্রস্তাবে মাঞ্চুক্যুও শাসন করিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে চীনের সিংহাসন ত্যাগ করিবার পর স্থুয়ান্ টুং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হেনরী পু ই (Henry Pu Yi) নাম গ্রহণ করিয়াছেন। নান্‌কিং জাতীয় সরকার কোন দিনই মাঞ্চুক্যুওকে স্বাধীন রাষ্ট্র বা হেনরী পু ই-কে তাহার সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে হোপেই (Hopei) আক্রমণ করিতে যাইয়া জাপান চীনের 'ঊনত্রিংশ বাহিনী' (The Twentyninth Army) প্রদত্ত তীব্র বাধার সম্মুখীন হয়। নান্‌কিং সরকার তখনও জাপানের সহিত আপোষে বিরোধ মিটাইবার আশা ছাড়েন নাই। এই বৎসর ৩০শে মে চীন-জাপ যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পর জাপান পিকিং-এর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করে।

ক্যুওমিন্‌টাং সরকারের এই জাপ-তোষণ নীতির সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রকার যুক্তির অবতারণা করা হয়। জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত

হওয়া পর্য্যন্ত নান্‌কিং সরকারের সর্ব্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-শেক বিশ্বাস করিতেন যে দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির উপর সবল রাষ্ট্রসমূহের জুলুমবাজি বন্ধ করিবার ক্ষমতা এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা জাতি-সঙ্ঘের আছে। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে সঙ্ঘের দুর্ব্বলতা, কপটতা এবং অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় পাওয়ার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ক্যুওমিন্‌টাং সরকার এবং চিয়াং কাই-শেক আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জ্জাতিক নীতি নির্দ্ধারণে অনেক সময়ই দেশদ্রোহী ওয়াং চিং-ওয়াই'র পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই ওয়াং চিং-ওয়াই জাপ-তোষণ নীতির একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। এই সময়েই আবার মধ্যচীনে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং সংগ্রাম এমন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে মধ্যচীন রণাঙ্গন হইতে উত্তরচীনে সৈন্য প্রেরণ করা চিয়াং কাই-শেকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইলে যেমন করিয়াই হউক্ প্রথমে চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে[১] একথা তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত। তাঁহার এই মত অবশ্য সকলে সমর্থন করে নাই। চিয়াং কাই-শেকের এই মতটি যুক্তি-সহ বা অভ্রান্ত নহে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সকলের সহযোগিতা লাভ করিতেন। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের যুগে চীনের ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

নান্‌কিং সরকারের অনুসৃত জাপ-তোষণ নীতিতে বিরক্ত হইয়া দলে দলে তীক্ষ্ণধী তরুণ-তরুণী সাম্যবাদী দলে যোগদান করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই জাপান কর্ত্তৃক পিকিং-এর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত অঞ্চল অধিকৃত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও তাহার রাজ্য-লিপ্সা প্রশমিত হইল না। জাপান এখন উত্তরচীনের হোপেই, সান্টুং, সান্‌সি, চাহার এবং সুইয়ুয়ান্ এই পাঁচটি প্রদেশ লইয়া 'উত্তরচীন স্বায়ত্তশাসনভোগী রাষ্ট্র' (North China Autonomous State)

১। "To resist foreign aggression, China must first be united."

নামক মাঞ্চুকুয়োও'র ন্যায় আর একটি জাপ-তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। বিনা রক্তপাতে মতলব হাসিল করিবার আশায় জাপান সুং চে-ইউয়ান্ (Sung Che-yuan) নামক উত্তরচীনের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট প্রস্তাব করিল যে নান্‌কিং-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে সম্মত হইলে তাঁহাকেই প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের কর্ণধার করা হইবে এবং জাপানের সৈন্যদল তাঁহার 'সিংহাসন' রক্ষা করিবে। সুং এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। জাপানের সঙ্কল্প আপাতত ব্যর্থ হইয়া গেল।

১৯৩৫ সালে জাপানের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার চমৎকার সুযোগ জুটিয়া গেল। এই বৎসর পীতনদী এবং ইয়াংসির সর্ব্বধ্বংসী প্লাবন চীনের জনসাধারণকে চরম দুর্দ্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করে। অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের সন্ধানেই প্রত্যেকের সমগ্র শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হইল। বৈদেশিক শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিবার মত সামর্থ্য বা মানসিক অবস্থা কাহারও রহিল না। এদিকে ইটালি-আবিসিনীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট হইল। সুযোগ-সন্ধানী জাপান এই সুযোগ হাতছাড়া করিল না। প্রায় বিনা বাধায় পিকিং-এর পূর্ব্বদিকে 'পূর্ব্বহোপেই' (East Hopei) নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ইন্ জু-কেং (Yin Ju-keng) নামক চীনের জনৈক দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের উপর জাপান ইহার শাসনভার অর্পণ করিল।

ইন্ জু-কেং তৎশাসিত ভূখণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করিতে থাকেন। ফলে জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, ঔষধ এবং মাদক দ্রব্য পূর্ব্বহোপেইতে আমদানি হইতে লাগিল। জাপ-তাঁবেদার হোপেই এবং নান্‌কিং-এর কর্ত্তৃত্বাধীন হোপেই'র মধ্যে কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমান্ত না থাকার ফলে জাপান হইতে আমদানি করা এই সমস্ত দ্রব্য চীনের অভ্যন্তরে বহুস্থানে বিনাশুল্কে নীত এবং বিক্রীত হইত। ফলে নান্‌কিং সরকারের গুরুতর

আর্থিক ক্ষতি হইতে লাগিল। আমদানি-শুল্ক হইতে নান্‌কিং সরকারের আয় একমাত্র ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পূর্ব্বাপেক্ষা ১৫,০০০,০০০ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল। জাপানী পণ্যের অবাধ আমদানির ফলে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান বণিক্‌গণও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। চীনের গণ-মানসে বহুবর্ষ পূর্ব্বেই জাপ-বিদ্বেষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। জাপানের ঔদ্ধত্য এবং অবিবেচনা এই বীজকে এখন মহামহীরুহে পরিণত করিল।

১৯৩৬ সালে জাপান তাহার সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিবার এবং 'কম্যুনিষ্ট দস্যুদিগকে' ধ্বংস করিবার জন্য তাহার সহায়তা গ্রহণের বিনিময়ে বার বার নান্‌কিং সরকারের সহিত শান্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আপোষের সমস্ত চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হইয়া গেল তখন জাপান দাবী করিয়া বসিল যে চিয়াং কাই-শেককে পদত্যাগ করিতে হইবে। ফলে চিয়াং কাই-শেকের জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হইল।

এই বৎসরই জুন মাসে কোয়ান্‌টুং-এর প্রাদেশিক সৈন্যাধ্যক্ষ চেন্ চি-টাং (Chen Chi-tang) এবং কোয়াংসি'র প্রাদেশিক সৈন্যাধ্যক্ষ লি সুং-জেন্ (Li Tsung-jen) জাপানের প্ররোচনা এবং তাহারই সহায়তায় নান্‌কিং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। নান্‌কিং সরকারকে জাপানের বিরুদ্ধে সক্রিয় করিয়া তুলিতে চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই লি সুং-জেন্ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার খুব সহজেই অবশ্য এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

জাপান ইহার পর চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি তাঁবেদার মঙ্গোল সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। তাহার আশা ছিল যে এই চেষ্টা ফলবতী হইলে আরও দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া চীন সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত সিন্‌কিয়াং (Sinkiang), চিংহাই (Chinghai) এবং কান্‌সু এই তিনটি প্রদেশ লইয়া একটি জাপ-তাঁবেদার মুসলমান

সাম্রাজ্য স্থাপন করা অসম্ভব হইবে না। এই ভাবে পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং উত্তর দিক্ হইতে মধ্যচীনকে পবিবেষ্টিত করিয়া জাপান অনায়াসেই এশিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে।

স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জাপান প্রিন্স্ টে (Prince Teh) নামক জনৈক মঙ্গোল অভিজাতের সাহায্য গ্রহণ করিল। নান্‌কিং জাতীয় সরকারেব প্রতি ইনি ব্যক্তিগত কাবণে বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। সুতরাং জাপান যখন তাঁহাকে স্বীয পরিকল্পিত মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করিবার প্রস্তাব করিল, তিনি সানন্দে সেই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ১৯৩৬ সালেব মে মাসেই তাহার অধীনস্থ অতি ক্ষুদ্র সৈন্যদল জাপানের প্ররোচনায উত্তব চাহারে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রেরিত সৈন্যগণের মধ্যে টে'র নিজস্ব সৈন্য ব্যতীত বহু দেশদ্রোহী চৈনিক দস্যুও ছিল। বলা বাহুল্য জাপানই ইহাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সমবোপকবণ জোগাইয়াছিল। এইভাবে উত্তর চাহারে একটি 'মঙ্গোল সামরিক রাষ্ট্র' (Mongol Military State) প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাকে ঘাঁটি কবিযা জাপান পার্শ্ববর্ত্তী সুইয়ুয়ান্ এবং নিংসিয়া প্রদেশ দুইটি গ্রাস কবিতে উদ্যত হইল।

এদিকে জাপ বাহিনী যখন সুইযুয়ান্ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল, নান্‌কিং-এ অবস্থিত জাপ রাজদূত তখন টোকিও'র নির্দ্দেশে ক্যুওমিন্‌টাং সবকাবের সহিত আপোষেব আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন। পাছে আপোষের চেষ্টায় কোন বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় নান্‌কিং সরকার উত্তর-চীনে নিয়োজিত সাধারণতন্ত্রের সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন যে জাপান আক্রমণ করিলে তাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্র করিবে এবং কোন ক্রমেই পাল্টা আক্রমণ করিবে না। জাপানও তাহাই চাহিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই চাতুরী টিকিল না। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে সুইয়ুয়ানে মোতায়েন ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া

পরাজিত জাপ সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দুইটি সামরিক ঘাঁটি শত্রুর নিকট হইতে ছিনাইয়া লয়। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান আর সুইয়ুয়ান্ অধিকার করিবার চেষ্টা করে নাই।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্টাং এই দুই দলের মধ্যে একটা আপোষ হয়। এতদিনে অন্তর্ব্বিরোধের অবসান হওয়ায় চীনের সামরিক শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। এইবার জাপান ভয় পাইল।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে জাপান অভিযোগ করে যে চীন গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ বাধাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে যুদ্ধারম্ভের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রায়ই চীন-প্রবাসী কোন না কোন জাপ নাগরিকের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কথা শোনা যাইত। উভয় রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মধ্যে ছোট-খাট সঙ্ঘর্ষ ইত্যাদিও একেবারে কম হইত না। ইহাদের যে কোনও একটিকে উপলক্ষ্য করিয়া জাপান যুদ্ধঘোষণা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু প্রবাসী জাপ নাগরিকদিগের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কথা যে আসলে জাপানের একটা চাল মাত্র নিম্নে প্রদত্ত ঘটনাটি হইতে তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৯৩৫ সালে নান্‌কিং-স্থিত সহকারী জাপ রাজদূত (Vice-Consul) মুরামোটো (Muramoto) হঠাৎ নিখোঁজ হইয়া গেলেন। টোকিও হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল যে মুরামোটোকে হত্যা করা হইয়াছে এবং এই হত্যার প্রতিশোধ লওয়া হইবে। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে অবশেষে মুরামোটোকে নান্‌কিং-এর উপকণ্ঠে 'পার্প্‌ল্ এ্যাণ্ড গোল্ডেন হিল্‌স্' (Purple and Golden Hills)-এ পাওয়া গেল। তিনি কেন গা ঢাকা দিয়াছিলেন পুলিশের এই প্রশ্নের উত্তরে মুরামোটো জানাইলেন যে জাপান সরকার তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে 'পার্প্‌ল্ এ্যাণ্ড গোল্ডেন হিল্‌স্' শ্বাপদসঙ্কুল। হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার জন্যই তিনি সেখানে গিয়াছিলেন।

পিপিং-এর নিকট ওয়ান্‌পিং (Wanping) সহরের বাহিরে মার্কো-পলো সেতু (Marco Polo Bridge)-র উপর যে সঙ্ঘর্ষ চীন-জাপান যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়াছিল তাহার জন্যও জাপানই সম্পূর্ণ দায়ী।

চীন-জাপান যুদ্ধ

উত্তরচীনের হোপেই প্রদেশে জাপান বে-আইনীভাবে জোর করিয়া সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছিল। চীনের 'উনত্রিংশ বাহিনী'র শিবির জাপ শিবিরের খুব নিকটেই অবস্থিত ছিল। ১৯৩৩ সালে জেনারেল সুং চে ইউয়ান্ (General Sung Cheh-yuan)-এর পরিচালনাধীনে এই 'উনত্রিংশ বাহিনী'ই জাপান কর্ত্তৃক পূর্ব্বহোপেই অধিকারকালে প্রবল বিক্রমে শত্রুকে বাধা প্রদান করিয়াছিল। শত্রুর সান্নিধ্য এই স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধৃবৃন্দের পক্ষে একান্তই অপ্রীতিকর এবং বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে হোপেইতে মোতায়েন জাপ সৈন্যদল স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রতি বিজিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া চীন-জাপান সম্পর্ককে দিনের পর দিন তিক্ত হইতে তিক্ততর করিয়া তুলিতেছিল। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত জাপ-তোষণ নীতির জন্য জাপান-কৃত অপমান মুখ বুজিয়া সহ্য করা ব্যতীত স্থানীয় অধিবাসিগণের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু বাহিরে কোন প্রকাশ না থাকিলেও হোপেইবাসীর মনে জাপান-বিদ্বেষের অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত না হইয়া লোকলোচনের অন্তরালে ক্রমশঃই বর্দ্ধিততেজে হইয়া উঠিতেছিল।

১৯৩৭ সালের ৬ই জুলাই হোপেইতে অবস্থিত জাপ বাহিনী কর্ত্তৃক পিপিং-এর নিকটবর্ত্তী ওয়ান্ পিং (Wan Ping) সহরে কৃত্রিম যুদ্ধকৌশল প্রদর্শিত হয়। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় জাপ সৈন্যদল শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নাম ডাকিবার সময় দেখা গেল যে একজন সৈন্য ফিরিয়া আসে নাই।

জাপানের পক্ষ হইতে বলা হইল যে চৈনিক সৈন্যগণ কর্ত্তৃক এই নিরুদ্দিষ্ট সৈনিকটি অপহৃত হইয়াছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই সে ফিরিয়া আসিলেও হোপেই'র জাপ কর্ত্তৃপক্ষ দাবী করিলেন যে হোপেইতে অবস্থিত চীন এবং জাপ বাহিনীর মধ্যে স্থায়ী বিরোধের সমাধানের জন্য ("to settle the permanent disturbances between the two armies") উভয় পক্ষের প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। তদনুসারে একটি কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটির জাপ সদস্যগণ অতঃপর দাবী করিলেন যে চীনকে ওয়ান্‌পিং হইতে সৈন্য সরাইয়া নিতে হইবে। চীন কর্ত্তৃপক্ষ এই দাবীতে কর্ণপাত করিলেন না। জাপ সৈন্য ইহার পর পিপিং হইতে ওয়ান্‌পিং-এর পথে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মার্কো পলো সেতু (The Marco Polo Bridge)-র উপর গুলিবর্ষণ করে। চৈনিক সৈন্য এই অগ্নিবৃষ্টির পাল্টা জবাব দেয়। এইবার সত্য সত্যই দীর্ঘ-আশঙ্কিত চীন-জাপান যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এই সংবাদ পাইয়া নান্‌কিং-এর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ পিপিং-এর সৈন্যাধ্যক্ষ সুং চে-ইউয়ান্‌কে রেলপথের দক্ষিণে পাওটিং (Paoting)-এ সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এই আদেশ প্রতিপালিত হইল। জাপ বাহিনী অক্লেশে পিপিং অধিকার করিল। পিপিং-এর পতনের পর জাপ সৈন্য যুগপৎ পিকিং-সুইয়ুয়ান্ রেলপথ ধরিয়া পশ্চিমদিকে চাহার, সুইয়ুয়ান্ এবং সান্‌সি অভিমুখে, পিকিং-হ্যাঙ্কো রেলপথ ধরিয়া দক্ষিণদিকে সান্‌সি এবং হোনান অভিমুখে এবং টিয়েন্‌ট্সিন্-পুকো রেলপথ ধরিয়া পূর্ব্বদিকে সান্‌টুং এবং কিযাংসু অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। সিয়ান্, হ্যাঙ্কো এবং নান্‌কিং অধিকার করিবার উদ্দেশ্যেই এই অভিযান তিনটি পরিচালিত হইয়াছিল।

চাহারের দিকে জাপ অভিযান ক্রমাগত অগ্রসর হইয়াই চলিল। চাহার প্রাদেশিক সরকারের কর্ণধার জেনারেল লিউ জু-মিং (General Liu Ju-ming) হোপেই হইতে চাহারের পথে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

গিরিসঙ্কট জাপানীদিগকে ছাড়িয়া দেওযার ফলে তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চাহারের অন্তর্গত কালাগান (Kalagan) এবং অন্যান্য কয়েকটি শহর অধিকার করিয়া ফেলিল। অতঃপর জাপ বাহিনী রেলপথ ধরিয়া চাহারের দক্ষিণে অবস্থিত সান্‌সি প্রদেশে প্রবেশ করিল। সান্‌সির প্রসিদ্ধ শহর টাটুং (Tatung) প্রায় বিনাবাধায় তাহাদের হস্তগত হইল। প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের নিদর্শনরাজির জন্য এই টাটুং বিশ্ববিখ্যাত। এদিকে জাপ বাহিনীর যে অংশ পিপিং হইতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা চেংটিং (Chengting) হইতে পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া সান্‌সিতে প্রবেশ করিল। এই সাঁড়াশি আক্রমণের ফলে সান্‌সির রাজধানী টাইয়ুয়ান্ জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

পিপিং হইতে জাপ বাহিনীর পূর্ব্বাভিমুখে যে অভিযান আরম্ভ হইযাছিল প্রথম প্রথম তাহাও বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইযাছিল। সান্‌টুং-এর সৈন্যাধ্যক্ষ বিশ্বাসঘাতক হান্ ফু-চু (Han Fu-chu) ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিয়া শত্রু বাহিনীকে অনাযাসে উত্তরসান্‌টুং অধিকার করিবার সুযোগ দিলেন। হানের বিশ্বাসঘাতকতা শীঘ্রই ধরা পড়িয়া গেল। হ্যাঙ্কোর সামরিক আদালতের বিচারে তাঁহার দোষ প্রমাণিত হইবার পর তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। হান্ ফু-চু'র রক্তলেখায় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রণ-নাযক সম্প্রদায় এবং জাপানের সহিত তাঁহাদিগের ষড়যন্ত্রের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লিখিত হইল।

আগষ্ট মাসে জাপান একসঙ্গে জল এবং স্থল পথে সাংহাই আক্রমণ করিয়া বসিল। বন্দরে অবস্থিত জাপ নৌ-বহর হইতে সাংহাই'র উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হইল। চীনসৈন্য দুইমাস পর্য্যন্ত নগর রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল। কিন্তু আক্রমণকারী বাহিনীর সংখ্যাধিক্য এবং বিশেষ করিয়া জাপ বিমান-বহর ও যান্ত্রিক বাহিনীর উৎকর্ষের জন্য শেষ পর্য্যন্ত চীন পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। সাংহাই'র পতনের

পর জাপ বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে নান্‌কিং অভিমুখে অগ্রসর হইযা চলিল। এই অগ্রগতির বেগ এত তীব্র ছিল যে সাংহাই হইতে নানকিং-এর পথে কোন জায়গাতেই চীন অভিযানকারী বাহিনীকে কোন প্রকার বাধা দিবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পায় নাই। এই সময় জাতীয় সরকাবের রাজধানী চুংকিং-এ স্থানান্তরিত হয। ডিসেম্বর মাসে জাপান নান্‌কিং অধিকার করিল। নান্‌কিং-এর পতনের অব্যবহিত পরের কাহিনী সভ্য মানুষের ইতিহাসের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক-মলিন অধ্যায়। বিজয়ী সৈন্যদল প্রথমতঃ নগরের বিভিন্ন অংশে অগ্নিসংযোগ করিযা এক প্রলয়ঙ্কব লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইল। বণ-বিধ্বস্ত, অগ্নি-দগ্ধ নান্‌কিং-এব বুকের উপর দিনের পর দিন বীভৎস নারী-ধর্ষণ, নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং নির্ম্মম লুণ্ঠনের তাণ্ডব চলিতে লাগিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদলকে সংযত কবা দূরের কথা, নিজেরাই এই নির্লজ্জ ব্যাপারে সক্রিয অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নান্‌কিং-এ অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে মানুষেব সভ্যতা এবং সংস্কৃতি একটা লঘুভাব মুখোস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুযোগ পাইলেই মানুসের মধ্যে আদিম যুগের যে বর্ব্বর প্রাণীটি রহিয়াছে সে সমস্ত সংযম এবং শালীনতাব বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজমূর্ত্তি ধাবণ করে।

নান্‌কিং-এর পতনে জাপানের যে সুবিধা হইয়াছিল তাহা কাজে লাগাইলে চীনের সৈন্যদলের সর্ব্বোত্তম অংশকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন এবং একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলা তাহার পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যপ্রকার। হেলায় যে সুযোগ জাপান নষ্ট করিল, আর কোন দিনই সে সুযোগ ফিরিয়া আসে নাই। নান্‌কিং-এর পতনের পব জাপান যে সুযোগ পাইয়াছিল তাহাব যথাযোগ্য ব্যবহার করিলে দ্বিতীয় চীন-জাপান তথা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধেব অন্য প্রকার পরিণতি ঘটিত কিনা জোর করিয়া বলা শক্ত।

চীনের এই সঙ্কটের দিনে চীন এবং জাপান সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের নীতি বিশ্লেষণের চেষ্টা অবাস্তব হইবে না। ইহাদের অনেকে মনে করিল যে সোভিয়েট রাষ্ট্রই হইবে জাপানের পরবর্ত্তী শিকার। এই সোভিয়েট রাষ্ট্র যে প্রথম হইতেই চীনের জাপ-প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার সহায়তা করিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে অর্থ এবং সমরোপকরণ দ্বারা চীনকে সাহায্য করিয়াছে তাহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রধান প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, যেমন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র, চীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেও এবং চীনের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও চীনের জাপ-প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা যে পরিণামে জয়যুক্ত হইবে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে বা স্বীকার করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আর একটি ভয় ছিল যে যদি তাহারা জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইলে যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া পড়িবে এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাহারা নিজেরাও যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িবে। ইহাদিগের কাহারও যুদ্ধে যোগদান করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত শিল্প এবং ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তাহাদের মোটা লাভকেও ইহারা উপেক্ষা করিতে পারিতেছিল না। এই স্ব-বিরোধী মনোভাবের জন্যই ইহারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া জাপানের নিকট কাঁচামাল বিক্রয় করিতে লাগিল। ইংরেজ, মার্কিণ এবং ফরাসী পুঁজিপতিগণ জাপানের সামরিক শিল্পোৎপাদন ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং ফরাসী প্রভৃতি দেশ হইতে চীন এতদিন যে সমরোপকরণের যোগান পাইয়া আসিতেছিল তাহার পরিমাণ কমিয়া গেল। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি চীনকে যে টাকা ধার দিল তাহার জন্য তাহাকে অনেকগুলি সর্ত্ত মানিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল।

নান্‌কিং অধিকার করিয়া জাপ বাহিনী আবার সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। চীনের যে দুইটি রেলপথ ইয়াংসি এবং পীতনদী-বিধৌত অঞ্চলগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে তাহা অধিকার করিয়া যে বিশাল ভূখণ্ডের ভিতর দিয়া এই রেলপথ চলিয়া গিয়াছে তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করাই জাপানের উদ্দেশ্য ছিল। এই রেলপথ দুইটির মধ্যে একটি সমুদ্রোপকূলের প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত। ইহা নান্‌কিং ও সাংহাই এবং পিকিং ও টিয়েন্‌ট্‌সিনের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে। অপরটি পিকিং-হ্যাঙ্কো রেলপথ। লুংহাই (Lunghai) রেলপথ আবার এই রেলপথ দুইটিকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

জাপানের প্রবল আক্রমণের মুখে চীনের সৈন্যদল কোন প্রকার প্রতিরোধের চেষ্টা না করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। যুদ্ধের এই পর্য্যায়ে চৈনিক সৈন্যদল সুযোগ পাইলেই জাপ বাহিনীর পার্শ্বদেশ এবং সংযোগ ও সরবরাহ-পথ আক্রমণ করিত। এই রণনীতি এবং কৌশলকেই চিয়াং কাই-শেক "trading space for time" অর্থাৎ "স্থানের বিনিময়ে সময় লওয়া" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই কৌশল অবলম্বন করায় শত্রুকে অনেক জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে সত্য ; কিন্তু ইহারই ফলে আবার যুদ্ধের স্থায়িত্ব-কালও বাড়িয়া গিয়াছে। সেই জন্যই এই রণ-কৌশলকে "Retreat in space and time"-ও বলা হয়। সান্‌টুং-কিয়াংসু সীমান্তে টাইয়েরচুয়াং (Taierchuang) যুদ্ধে জাপানের পরাজয় চীনের পক্ষে এই নীতি এবং কৌশলের কার্য্যকারিতা ও উপযোগিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। একটি জাপ যান্ত্রিক বাহিনী লুংহাই রেলপথ ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত উপকূলের সমান্তরালে অবস্থিত রেলপথটির দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। চীন-সৈন্য এই যান্ত্রিক বাহিনীকে জাপ বাহিনীর প্রধান অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া প্রায় সমূলে বিনষ্ট করে।

জাপানের নৌ-বহর তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। ইয়াংসি নদী বাহিয়া জাপ বহর চীনের অভ্যন্তরে অবস্থিত হ্যাঙ্কো পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। চীনের কোন নৌ-বহর ছিল না বলিয়া সমুদ্র অথবা নদীবক্ষে জাপানকে বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। শত্রু চীনের এই অক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। জাপ নৌ-বহর যদি পূর্ব্বাহ্নেই হ্যাঙ্কো পৌছিতে না পারিত তাহা হইলে জাপ সৈন্যদল কোনদিনই হ্যাঙ্কো পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। পৌছিতে পারিলেও ১৯৩৮ সালের শেষভাগে কিছুতেই তাহা সম্ভব হইত না। জাপ নৌ-বহরের জন্যই প্রতিরোধকারী চৈনিক বাহিনীকে বার বার ইয়াংসি তীর হইতে সরিয়া যাইতে হইযাছে। নৌ-বহরের সাহায্যেই জাপান হ্যাঙ্কো এবং ক্যাণ্টন দখল করে। ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কো রেলপথের উভয় প্রান্ত চীনের হাতছাড়া হইয়া গেল। মধ্যবর্ত্তী অংশ অবশ্য চীনের অধিকারেই রহিল।

১৯৩৮ সালে হ্যাঙ্কো এবং ক্যাণ্টনের পতনের পর চীন-জাপান যুদ্ধের যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়, ১৯৪১ সালের শেষের দিকে পার্ল হার্ব্বার (Pearl Harbour)-এর পতনের পর তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। সমুদ্রোপকূলে এবং ইয়াংসি-বক্ষে জাপানের কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাহির হইতে জাহাজ বা রেলযোগে চীনের তখন আর কোন সরবরাহ পাইবার উপায় ছিল না। একমাত্র ফরাসী ইন্দো-চীনের (French Indo-China) পথে যে সামান্য সাহায্য পাওয়া যাইত প্রয়োজনেব তুলনায় তাহা একান্তই অপ্রচুর। এই সাহায্যের পরিমাণ কম হওয়ার কারণ এই যে ফরাসীদের মনে আশঙ্কা ছিল যে পাছে কেহ মনে কবে যে তাহারা নিরপেক্ষ থাকিবার নীতি বর্জ্জন করিয়া চীনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে। ১৯৪০ সালে ইন্দো-চীন জাপানের হস্তগত হওয়ায সরবরাহের এই পথও বন্ধ হইয়া গেল। মোটর ট্রাক যোগে ব্রহ্মদেশের পথে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে ২,০০০ মাইল দীর্ঘ মোটরেব পথে ব্যতীত কোন দিক্ হইতেই

এখন আর চীনের সরবরাহ পাইবার উপায় রহিল না। যুক্তরাষ্ট্র হইতে চীনের জন্য যে সমরোপকরণ, ঔষধপত্র ইত্যাদি প্রেরিত হইত তাহা ব্রহ্মের পথে পাঠাইতে হইত। ১৯৪০ সালের বসন্তকালে জার্ম্মানীর নিকট ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর ইংল্যাণ্ড এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইল। জাপানের চাপে পড়িয়া এই সময় তাহাকে কয়েক মাসের জন্য চীন-ব্রহ্ম রাস্তা বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল।

শত্রুর অগ্রগতি বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত তিন-চার বৎসর কাল চীন এক অভিনব রণ-কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম হইতেই চীনের সৈন্যাধ্যক্ষমণ্ডলী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জাপানকে পর্য্যুদস্ত করিতে হইলে যুদ্ধের মেয়াদ যতটা সম্ভব দীর্ঘ করিতে হইবে। আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীর সম্মুখে ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করিয়া তাহাকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং তাহার পর গেরিলা যুদ্ধ-কৌশলের সাহায্যে তাহার মনোবল নষ্ট করিয়া অবশেষে তাহার ধ্বংস সাধন করিতে হইবে। এই রণ-কৌশলই "trading space for time" অথবা "retreat in space and time" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। এই কৌশল অনুযায়ী চীন-সৈন্যগণ উন্মুক্ত প্রান্তর বা নদীর উপত্যকায় শত্রুর সহিত সম্মুখযুদ্ধ বা সংঘর্ষের সম্ভাবনা যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছে। জাপ সৈন্য অপেক্ষা চীন-সৈন্য সংখ্যায় অধিক এবং দৃঢ়তর মনোবল সম্পন্ন হইলেও আধুনিক যুগে সম্মুখযুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য্য ট্যাঙ্ক এবং গুরুভার কামান তাহাদিগের ছিল না। জাপ রণতরী হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া নদীর কূলে অবস্থিত অনেকগুলি শহর বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই গুলি রক্ষার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র হইত। সেইজন্য স্বীয় অনুসৃত রণ-নীতির প্রয়োজনেই যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে চীন একটির পর একটি শহর শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

চিয়াং কাই শেক বলিতেন যে চীন-জাপান যুদ্ধ তিনটি পর্ব্বে বিভক্ত হইবে। এই তিন পর্ব্বে তিন প্রকার রণ-কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম পর্ব্বে আত্মরক্ষামূলক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্ব্বে আরম্ভ হইবে গেরিলা যুদ্ধ। যুদ্ধের এই পর্ব্বে শত্রুর সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া অতর্কিত আক্রমণে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে এবং তাহার মনোবল নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। তৃতীয় বা শেষ পর্ব্বে আক্রমণের পর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে-টুং-ও অনুরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে চীন-জাপান যুদ্ধের তিনটি অধ্যায় থাকিবে। যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে জাপানীরা যখন চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে তখন চীনের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিলেও শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হইবে। ইহার পর দ্বিতীয় পর্ব্বে একটা দীর্ঘকালস্থায়ী অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এই অচল অবস্থার যুগেই চীনের প্রতিরোধ-শক্তি জাপানকে নিজ্জিত করিবে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রত্যাক্রমণের পালা আরম্ভ হইবে। চীন হইতে সর্ব্বশেষ জাপানী সৈনিকটির বিতাড়ণের পর এই পর্ব্ব তথা চীন-জাপান যুদ্ধের উপর সমাপ্তির যবনিকা নামিয়া আসিবে।

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে হ্যাঙ্কোর পতন চিয়াং-কথিত দ্বিতীয় অধ্যাযের সূচনা করিল। চীন-জাপান যুদ্ধের এই অধ্যাযকে 'গেরিলা যুগ' আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। আধুনিক সমরোপকরণের অপ্রাচুর্য্যই চীনকে গেরিলা যুদ্ধের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য করিয়াছিল। জনসাধারণের দেশের ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং সহনশীলতার জন্য গেরিলা রণ-নীতি চীনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। যুদ্ধের এই পর্ব্বেই চীনের কম্যুনিষ্ট বাহিনী নূতন করিয়া গঠিত হয় এবং 'এইট্থ্ রুট্ আর্মি' (Eighth Route

Army) এবং 'নিউ ফোর্থ আর্ম্মি' (New Fourth Army) আখ্যা লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে পরিচালিত এই বাহিনী দুইটি মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। 'এইট্থ্ রুট্ আর্ম্মি' উত্তর-পূর্ব্ব চীন হইতে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে সান্সি প্রদেশে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি বড় বড় যুদ্ধে তত্রত্য জাপ বাহিনীকে পরাস্ত করে। উপর্য্যুপরি এই প্রকার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ফলে জাপানের পশ্চিমদিকে অগ্রগতি স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহা না হইলে চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিং-এর উত্তরদিক্ হইতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সান্সি হইতে 'এইট্থ্ রুট্ আর্ম্মি' পূর্ব্বদিকে পীতসাগর ও মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তরে বহির্মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিল। ইহার ফলে যে উত্তরচীন পূর্ব্বে প্রায় বিনাবাধায় জাপানের হস্তগত হইয়াছিল সেই উত্তরচীনে জাপানের আধিপত্য বিপন্ন হইয়া পড়িল। 'নিউ ফোর্থ আর্ম্মি'-ও গেরিলা রণ-কৌশলের সাহায্যে মধ্যচীনে হ্যাঙ্কো হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডে জাপানকে ব্যতিব্যস্ত, প্রায় অতিষ্ঠ, করিয়া তুলিয়াছিল।

ক্রমে মহাচীনের বিরাট কৃষক-সমাজও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সৈন্যবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। জাপানের পরাজয় ঘটাইতে মহাচীনের কৃষক সম্প্রদায় যে সাহায্য করিয়াছে তাহাকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। মাও সে-টুংত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ মূলতঃ কৃষক-বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।[১] জাপানের নির্ম্মম অত্যাচার এবং অমানুষিক উৎপীড়নেই চীনের নিরীহ, শান্তিপ্রিয় কৃষক সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।[২]

১। "* * * * that the present resistance against Japan is in its essence a peasant war against Japan. * * * * The anti-Japanese war is in essence a Peasant Revolution."

China's "New Democracy" by Mao Tse-tung, P. 29.

২। "The Japanese, indeed, have mainly themselves to thank for this new and sharp thorn in their side. To have stirred a phleg-

কৃষকগণের চোখের উপর দিনের পর দিন তাহাদিগের কুটির অগ্নি-দগ্ধ শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত, শস্যভাণ্ডার লুণ্ঠিত এবং গৃহপালিত পশুকুল নিহত হইতে লাগিল। তাহাদেরই সম্মুখে তাহাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যা এবং ভগ্নীর নারী-মর্য্যাদা বিনষ্ট হইল। প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে উত্তরচীনে লিয়াও রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক চিন্ (Chin) নারীদিগের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের জন্যই চিন্ যুবকগণ বিদ্রোহী হইয়া লিয়াও সাম্রাজ্যের পতন ঘটাইয়াছিল। শতাব্দীর ব্যবধানে এই একই পাপে চিন্ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। নারীর উপর বীভৎস অত্যাচার মহাচীনের গণ-মানসে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে তাহাই পরিণামে জাপানের বিরুদ্ধে দেশের গণ-শক্তিকে সংহত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। চীনের চির-সহিষ্ণু এবং নির্ব্বিরোধ কৃষক সম্প্রদায়কে রাজনীতির দিক্ হইতে সচেতন এবং সক্রিয় করিয়া তুলিতে কম্যুনিষ্টগণের কৃতিত্বের পরিমাণও মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। এই কৃতিত্বকে উপেক্ষা করিলে আধুনিক চীন-ইতিহাসের একটি প্রধান সত্যকেই অস্বীকার করা হইবে।

যুদ্ধকালে চীনে যে বিরাট গেরিলা বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার এক অংশ প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীন না হইলেও পরোক্ষভাবে ঐ সরকার কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হইত। জাপ-অধিকৃত চীনে যুধ্যমান গেরিলাদের মধ্যে অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত ছিল এবং নিয়মিত ভাবে চুংকিং সরকারকে রাজস্ব দিত। গেরিলা বাহিনীর একটি অংশ কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত ছিল। অপর একটি অংশ আবার

matic easy-going and largely illiterate section of the people into furious opposition, points to brutality, venalism, and inhuman conduct on the part of the Japanese soldiery. The Chinese peasants are a peace-loving people. In their hearts they hated the war; they dreaded the over-running of their fields by the opposing armies and the added hardships of a war-time existence. They loved their homes; they loved their small plots of land – the 'good earth' which their forefathers had tilled before them."

—*A Short History of Chinese Civilisation* by Tsui Chi, P. 293.

মার্কামারা কম্যুনিষ্ট না হইলেও কম্যুনিষ্টদিগের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে বদ্ধ ছিল এবং সাম্যবাদী উপদেষ্টাগণের নিকট হইতে সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই উপদেশ অনুসারে চলিত।

চীনের গেরিলা বাহিনী যুদ্ধকালে জাতীয় সরকার অথবা কম্যুনিষ্ট দল কাহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিত অথবা কাহার আনুগত্য স্বীকার করিত তাহা বড় কথা নহে। ইহাদের সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ইহারা সকলে একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়াছে। অমঙ্গলের মধ্যেই ভাবী মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে। জাপানের অত্যাচারের ফলে চীন যেমন ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল তেমন আর কোন দিনই হয় নাই। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে এই ঐক্যবন্ধন আজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের গৌরবময় স্মৃতি একদিন না একদিন আত্মঘাতী ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া মহাচীনের মুক্তিসাধনাকে সফল করিবে।

চীনের গেরিলাদিগের আত্মোৎসর্গের কাহিনী চীন-ইতিহাসের একটি অতীব করুণ এবং গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পিকিং-এর উত্তর-পশ্চিমে নান্‌কো গিরিসঙ্কট (Nankow Pass) রক্ষা করিতে ১০,০০০ গেরিলা সৈন্য যন্ত্রারূঢ় জাপ বাহিনীর সম্মুখে পশ্চাদপসরণ না করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। এই প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন জাপান বার বার চীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই সন্ধির প্রস্তাবে এমন সমস্ত সর্ত্ত থাকিত যে চীনের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় নাই। জাপানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবার অবশ্য আর একটি কারণও ছিল। চীন খুব ভাল করিয়াই জানিত যে যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে তাহার জয়ের সম্ভাবনা ততই নিশ্চিত হইবে এবং জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করা হইবে চীনের জয়লাভের প্রথম সোপান।

এদিকে জাপান যখন বুঝিল যে চীন কিছুতেই সন্ধি করিবে না তখন সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বযুগের সাম্রাজ্যবাদীদিগের অনুসৃত ভেদনীতি প্রয়োগ করিল। আজ পর্য্যন্ত কোন দেশেই বিভীষণের অভাব হয় নাই। ১৯৩৭ সালে জাপান ওয়াং কে-মিন্ (Wang Ke-min)-এর অধীনে পিপিং-এ একটি এবং ক্যাণ্টনে লিয়াং সি-ই (Liang Shih-i)-র অধীনে অপর একটি জাপ-তাঁবেদার সরকার গঠন করিয়াছিল। কিছুদিন পর জাপান পিপিং এবং ক্যাণ্টনে দুইটি স্বতন্ত্র সরকারের পরিবর্ত্তে জাপ-কবলিত সমগ্র চীনের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিল এবং চিয়াং কাই-শেকের ভূতপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বী, উত্তরচীন ও ইয়াংসি উপত্যকার প্রাক্তন শাসনকর্ত্তা জেনারেল উ পে-ফু-কে পবিকল্পিত তাঁবেদাব সবকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল। বৃদ্ধ উ পে-ফু কিন্তু এই প্রলোভনে টলিলেন না। জাপানের উৎকোচ এবং ভীতিপ্রদর্শন দুই-ই তিনি উপেক্ষা করিলেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করেন যে জাপানীরাই বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। স্বদেশলক্ষ্মীর কল্যাণের জন্য এই আত্মদান উ পে-ফু-কে চীনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

উ পে-ফু যে প্রলোভন জয় করিলেন, চীনের বিপ্লবী দলের অন্যতম বিশিষ্ট প্রাক্তন নেতা, অতীত দিনের তরুণ বিপ্লবীদিগের প্রধান ভরসা ওয়াং চিং-ওয়াই সেই প্রলোভনের বশীভূত হইলেন। লক্ষ লক্ষ দেশ প্রেমিক চৈনিক বীরের বুকের রক্তে মহাচীনের গিরি-নদী-প্রান্তর লালে লাল হইয়া যাইবার পর এই ওয়াং চিং-ওয়াই চুংকিং হইতে আনামে পলায়ন করেন। সেখান হইতে তিনি হংকং এবং পরে সাংহাইতে আসেন। তিনি ক্যুওমিন্টাং জাতীয় সরকারের পরিত্যক্ত রাজধানী নান্কিং-এ একটি জাপ-তাঁবেদার সরকার গঠন করিতে সম্মত হইলেন। এই সময় ওয়াং চিং-ওয়াই এবং জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি হইল। কথা থাকিল যে চীন,

জাপান এবং মাঞ্চুক্যুও'র অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান এবং চীন হইতে বলশেভিক প্রভাব দূর করিবার জন্য জাপান চীনের যাবতীয় সম্পদ ব্যবহার করিতে পারিবে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান অতর্কিত আক্রমণে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত পার্ল হার্ব্বার হস্তগত করিল। এই সংবাদ চীনের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিল। চীন বরাবরই বলিয়া আসিয়াছে যে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার সহিত জাপানের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। পার্ল হার্ব্বার আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের অনেকেই বিশ্বাস করিতেন যে দ্রুত বর্দ্ধনশীল জন-সমষ্টির মাথা গুঁজিবার স্থান সংগ্রহ করাই জাপানের চীন আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং অনন্যোপায় হইয়াই জাপানকে চীন আক্রমণ করিতে হইয়াছে। চীনের জনসাধারণের মধ্যে যাঁহাদিগের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা কিন্তু বহুপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জাপানের রণ-নায়ক এবং পুঁজিপতি সম্প্রদায় চীনের যে সমস্ত অঞ্চলে কাঁচা মাল উৎপন্ন হয় সে সমস্ত অঞ্চলে জাপ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর। স্বদেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিসাধন কোন দিনই এই কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল না। পররাজ্য গ্রাস করিবার জন্য সমরোপকরণ উৎপাদনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশে উৎপন্ন শ্রম-শিল্পজ পণ্য বিক্রয়ের বাজারের জন্য শিল্প-প্রধান জাপানের পক্ষে পররাজ্য গ্রাস করা ব্যতীত বাঁচিবার অন্য পথ ছিল না। এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতিই একদা নাৎসী শাসিত জার্ম্মানী এবং ফ্যাসিষ্ট শাসনাধীন ইটালীকে পররাজ্যলোলুপ করিয়া তুলিয়াছিল। যদি দ্রুত বর্দ্ধমান জন-সংখ্যাই জাপানের সমস্যা হইত, তবে সে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিত। কিন্তু এই চেষ্টা করা দূরের কথা, ইটালী এবং জার্ম্মানীর ন্যায় জাপান সর্ব্বপ্রযত্নে দেশের লোকসংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টাই

করিয়াছে। যুদ্ধকালে যমের খাদ্য জোগাইবার প্রয়োজনেই এই চেষ্টা করিতে হইয়াছে। স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করার গরজে ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের ক্রমাগত যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্য্যয ঘটিলেই স্বদেশে এই সাম্রাজ্যবাদকে বিক্ষোভ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ এবং পরিণামে ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে হইবে।

চীনেব জনসাধারণের উপরে উল্লিখিত অংশ খুব ভাল করিয়াই জানিত যে চীন-রণাঙ্গনে জাপানের অগ্রগতি স্তব্ধ করিয়া দিতে পারিলেই জাপ সরকারকে জনসাধারণের উদ্যত রোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অন্য কোন রণাঙ্গনে জয়লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টার সফলতার পথে যত প্রতিবন্ধকই থাকুক্ না কেন, পরিণামে জয়লাভ যতই অসম্ভব হউক্ না কেন, সে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না।

পার্ল হার্ব্বারের পতনের পর চীন আশা করিয়াছিল যে সম্মিলিত ইংরেজ, মার্কিণ এবং ওলন্দাজ নৌ-বাহিনী এবং বিমান-বহর অত্যল্পকালের মধ্যে জাপানের শক্তি চূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু চীনের এই আশা সফল হয নাই। একে একে হংকং, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, নেথারল্যাণ্ড্স্ ইণ্ডিয়া এবং ব্রহ্মদেশ জাপানের পদানত হইল। চীনের আশাদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। ব্রহ্মদেশ জাপানের কবলিত হওয়ার পর স্থলপথে একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যতীত আর কোন দেশ হইতে চীনের সরবরাহ পাওয়াব উপায় রহিল না। বিপদের উপর বিপদ এই যে, জাপান যখন রেঙ্গুন অধিকার করে তখন 'লেণ্ড-লিজ চুক্তি' (Lend-lease Agreement) অনুযাযী যুক্তরাষ্ট্র হইতে চীনের জন্য প্রেরিত প্রচুর সমরোপকরণ ইত্যাদি রেঙ্গুনে জমা ছিল। রেঙ্গুন হইতে ঐ উপকরণ অল্প অল্প করিয়া চীনে প্রেরণ কবা হইতেছিল। রেঙ্গুনের পতনের পর ইহার সমস্তটাই জাপানের হাতে পডিল। এদিকে হিমালয়ের উপর দিয়া বিমানযোগে ভারতবর্ষ হইতে যে

সাহায্য পাঠানো হইত তাহা চীনের তখনকার প্রয়োজনের পক্ষে একান্তই অপ্রচুর ছিল।

পরে অবশ্য এই সাহায্যের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। পার্ল হার্ব্বার আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত, তখনও রাষ্ট্রপতি রুজ্‌ভেল্ট (President Roosevelt) চীনকে সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শ এবং উৎসাহে চীনে মার্কিণ বৈমানিকের একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইয়াছিল। পার্ল হার্ব্বারের পতনকালে এই বৈমানিক দলের শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। ব্রহ্ম রণাঙ্গণে এই বৈমানিক দল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। এই দলই পরে কর্ণেল চিনল্টের অধীনে নূতন করিয়া গঠিত হইয়া "ফোর্টিন্‌থ্ এয়ার ফোর্স্" (Fourteenth Air Force) নামে অভিহিত হয়। এই বাহিনীতে জঙ্গী (Fighter) এবং বোমাবর্ষী (Bomber) উভয় প্রকার বিমানই ছিল। উন্নততর শিক্ষার জন্য এই সময় বহু চৈনিক বৈমানিককে আমেরিকায় প্রেরণ করা হইয়াছিল।

চীনের এবং চীন-মার্কিণ বিমান-বহরের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে যুদ্ধের গতি চীনের অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ১৯৪৩ সালে এই পরিবর্ত্তন স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। জাপ বাহিনীর ইচাং (Ichang) হইতে জেচোয়াং প্রদেশে প্রবেশ কবিবার বিফল প্রযাস এই পরিবর্ত্তনের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মার্কিণ বিমান হইতে আণবিক বোমাবর্ষণে হিরোসিমা (Hiroshima) এবং নাগাসাকি (Nagasaki) বিধ্বস্ত হইবার পর জাপান মিত্রশক্তির নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে (আগষ্ট ১৯৪৫)। সুদীর্ঘ আট বৎসর পর দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের উপর সমাপ্তির যবনিকা নামিয়া আসিল।

যুদ্ধান্তে

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর তিন বৎসর শেষ হইতে চলিল। এই প্রলয়ঙ্কর মারণ-যজ্ঞ মানবের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন করিয়া জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে কি না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। এদিকে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঘটনা-প্রবাহের গতি কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল নর-নারীকেই শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়াছে। অনেকেই বলিতেছেন যে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ অনিবার্য্য এবং আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর নবজন্ম হইয়াছে। আগতপ্রায় যুগে পৃথিবী কি রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহার প্রতি বিশ্বের মনীষীবৃন্দ অনবহিত নহেন। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে যে সমস্যাগুলি বিদ্যমান ছিল, যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধান্তে প্রত্যেক দেশে তাহা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে।

যে মারণ-যজ্ঞের প্রাণঘাতী বিষাক্ত ধূমে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস আজও কলুষিত হইয়া রহিয়াছে মহাচীন তাহার অন্যতম প্রধান হোতা। এই সেদিন পর্য্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপঞ্চকের অন্যতম জাপানের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে অনুন্নত চীনের সংগ্রাম ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। বিজয়লক্ষ্মী মহাচীনের কণ্ঠলগ্না হইয়াছেন। কিন্তু 'ততঃ কিম্'? ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল চীন যেমন এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তিরক্ষার সহায়ক হইবে, অন্তর্ব্বিরোধে বিচ্ছিন্ন, দুর্ব্বল চীন তেমনই বিশ্ব-শান্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার নিজের জাতীয় সত্তাও নিরাপদ থাকিবে না। অন্তর্ব্বিরোধ তাহার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের বিপদ ডাকিয়া আনিবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে চীনে কোন দিনই শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বীয় মতের পোষকতায় বর্ত্তমানে যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিনটাং যুদ্ধ চলিতেছে তাঁহারা তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে

জীবন-মরণ যুদ্ধের মধ্যেও এই দুই রাজনৈতিক দলের বিরোধ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রচ্ছন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান প্রায় অসম্ভব, চীনের প্রতিটি প্রদেশই বিশালায়তন এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যও বড় বেশী।

উপরি-উক্ত মতসমূহের কোনটিই অসত্য নহে। কিন্তু ১৯১১ সালের রাষ্ট্র-বিপ্লব এবং তাহার ফলে মাঞ্চু রাজবংশের পতনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত চীনের বিস্ময়কর অগ্রগতির কথা বিস্মৃত হইলে আধুনিক ইতিহাসের একটি প্রধান তথ্যকেই অস্বীকার করা হইবে। ১৯১১ সালে মাঞ্চু-সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িল। যে বিপ্লবীগণ এই পতন ঘটাইলেন, বিপ্লবোত্তর যুগে কোন্ পথে, কি প্রণালীতে রাষ্ট্র-তরণী পরিচালনা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা, সুস্পষ্ট ধারণা বা সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। আর পরিকল্পনা থাকিলেও তাহাকে রূপায়িত করিবার কোন উপায় ছিল না। এই কথা মনে রাখিলেই বিপ্লবোত্তর চীনে ক্ষমতালোলুপ ইউয়ান্ সি-কাই-এর স্বৈরাচারী একনায়কত্ব, 'টুকুন' (Tuchun) বা 'ওয়ার-লর্ড' অর্থাৎ রণ-নায়কগণেব আবির্ভাব এবং দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণটি ধবা যাইবে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ১৯২১ সালে ওয়াশিংটন সম্মেলন হইতে ১৯৩১ সালে জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া গ্রাস পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে মহাচীনে নবজীবনের সুস্পষ্ট স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। জাপ আক্রমণের ফলে বহুধা বিভক্ত এবং অন্তর্ব্বিরোধে মৃতকল্প মহাচীনের দুর্দ্দমনীয় জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে। এই পরিণতি সর্ব্বত্র প্রগতিপন্থীদিগের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সংস্কারকগণ, যেমন কাং ইউ-ওয়েই, লিয়াং চি চাও, ডাঃ হু সি, জেমস ইয়েন প্রভৃতির রচনাবলী এবং সহস্র সহস্র আমেরিকা ও ইউরোপ-প্রত্যাগত ছাত্রের প্রচেষ্টা এই পরিণতি ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের চেষ্টা এবং বহিঃশত্রুর

আক্রমণের ফলেই চীনে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত জনমত গঠিত হইয়াছে। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে নান্‌কিং জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপে এই জনমত পরিপূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ প্রতিফলিত হইয়াছিল। জাপ যুদ্ধের ফলে এই জনমত স্পষ্ট এবং দৃঢ়তর হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক চীনকে বুঝিতে হইলে ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেনের 'জনগণের তিনটি মূলনীতি' (Three Principles of the People) অথবা 'সান্ মিন্ চু-ই' এবং মহাচীনের জাতি-মানসের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই 'সান্ মিন্ চু-ই' আধুনিক চীনের প্রতিটি সংস্কারমূলক কার্য্যের মাপকাঠি—অন্ততঃ চীনাদের দৃষ্টিতে। কোন প্রস্তাবিত সংস্কার 'সান্ মিন্ চু-ই'-র বিরোধী না হইলে তবেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন কি যে কম্যুনিষ্ট দলের সহিত ক্যুওমিন্‌টাং দলের অহি-নকুল সম্পর্ক, সেই কম্যুনিষ্ট দলও প্রথম হইতেই ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেনের নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া আসিতেছে। ডাঃ সুনের আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে মতভেদের আর অন্ত নাই।[১] কিন্তু তথাপি একথা মনে করা অযৌক্তিক নহে যে দূর বা অদূর ভবিষ্যতে যখন মহাচীনের সমস্ত রাজনৈতিক দল মতামত প্রকাশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করিবে তখন দেশের রাজনৈতিক এবং অন্যবিধ সমস্যাগুলির সর্ব্বজনগ্রাহ্য একটা সমাধান মিলিতেও পারে।

ডাঃ সুনের নীতি তিনটির উদ্দেশ্য ছিল চীনের জাতীয় সার্ব্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সৌকর্য্য সাধন।

১৯৪২ সালে ইংল্যাণ্ড এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনে তাহাদের রাষ্ট্র সীমার বহির্ভূত অঞ্চলের কর্ত্তৃত্বাধিকার (Extra-territoriality) অর্থাৎ কোন

১। *China's "New Democracy"* by Mao Tse-tung, p. 25 দ্রষ্টব্য।

ইংরেজ বা মার্কিণ নাগরিক চীনদেশে কোন অপরাধ করিলে ইংরেজ বা আমেরিকান আদালতে অপরাধীর নিজের দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার বিচার করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে। কিছুদিন পরে ফ্রান্সও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ফলে বিশ্বের দরবারে চীনের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইল। অর্দ্ধ-উপনিবেশ চীন নামে স্বাধীন হইল। কিন্তু বহু কঠিন এবং জটিল সমস্যার সমাধান এখনও বাকী রহিয়াছে।

তারপর গণতন্ত্রের কথা। চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ জয়যুক্ত হইয়াছে বলিলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে জাপ যুদ্ধ কালে চীন শনৈঃ শনৈঃ গণ-তান্ত্রিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই প্রগতি ১৯১২ হইতে ১৯৩৭ সাল এই পাদ শতাব্দীর অগ্রগতি অপেক্ষা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট এবং দ্রুততর। যুদ্ধকালে গঠিত জনগণের রাজনৈতিক পরিষদ্ আইনতঃ সরকারের নীতি এবং কার্য্যের সমালোচনার অধিকারী ছিল। ইহার সহিত পরামর্শ করিতে সরকার আইনতঃ বাধ্য ছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদ্ এবং শহর ও গ্রামের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি আজ আর নিজেদের দায়িত্ব অথবা সমালোচনা করিবার এবং মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারের প্রতি অনবহিত নহে।

১৯৩৬ সালে নান্‌কিং সরকার-রচিত যে রাষ্ট্র-বিধি কিছুদিন পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে একটি জাতীয় মহাপরিষদের হস্তে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। এই পরিষদের ১২০০ প্রতিনিধির মধ্যে ৬৬৫ জন বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্ব্বাচনকেন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। ৩৮০ জন থাকিবেন ভূম্যধিকারী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অবশিষ্ট ১৫৫ জন তিব্বতীয়, মঙ্গোলীয়, মাঞ্চু এবং প্রবাসী চৈনিকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। ছয় বৎসর পর পর এই মহাপরিষদের নূতন নির্ব্বাচন হইবে এবং তিন বৎসর অন্তর অন্তর ইহার অধিবেশন হইবে। দুই অধিবেশনের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে 'লেজিস্‌লেটিভ ইউয়ান্' বা ব্যবস্থা-পরিষদ্ মহাপরিষদের স্থান

গ্রহণ করিবে। পরিষদের আইন প্রণয়ন করিবার এবং আয় ও ব্যয়ের বরাদ্দ (Budget) মঞ্জুর করিবার অধিকার থাকিবে। রাষ্ট্র-বিধিতে রাষ্ট্রপতিকে অত্যন্ত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র রাষ্ট্রপতিই যুদ্ধঘোষণা, যুদ্ধবিরতি এবং এই সম্পর্কে যাবতীয় আদেশ দিবার ও বিধি-ব্যবস্থা করিবার অধিকারী। জাতীয় বাহিনীর তিনিই সর্ব্বাধিনায়ক। পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই মহাচীনের একমাত্র মুখপাত্র। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রপতি আবশ্যক আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। বাবস্থা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের পুনর্ব্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবার অথবা জাতীয় মহাপরিষদের নিকট পেশ করিবার অধিকার তাঁহার থাকিবে। রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীগণ রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কর্ম্মচারী নিয়োগে কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নহে। 'এক্‌জামিনেশন ইউয়ান্' বা 'পরীক্ষা-পরিষদ্' প্রথমতঃ কাহারা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাহা স্থির করিবে এবং রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন এই অনুমোদিত প্রার্থীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা অপেক্ষাও বড কথা এই যে রাষ্ট্রপতি যাবতীয় বিষয়ে জাতীয় মহাপরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবেন। আপত্তি উঠিবে যে মহা-পবিষদ্ তিন বৎসর পর পর আহূত হইবে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে উক্ত পবিষদ্‌কে উপেক্ষা করা মোটেই কঠিন হইবে না। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে রাষ্ট্র-বিধিতে যে পল্লী-পরিষদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রায়ই তাহাদের অধিবেশন হইবে এবং প্রাদেশিক পরিষদ্‌গুলির মধ্যস্থতায় তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জনমতের সহিত পরিচিত করিবার সুযোগ পাইবে। এইভাবে জনমতের সহিত সরকারের সংযোগ রক্ষিত হইবে। সুতরাং জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে চীনের নূতন রাষ্ট্র-বিধি খুঁটিনাটি ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক না হইলেও আদর্শের দিক্ হইতে ইহার ভিত্তি গণতান্ত্রিক।

কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং বিরোধ এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে চীনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। জাতির অদৃষ্টাকাশে যেদিন দুর্যোগের কৃষ্ণ মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, জাতির স্বাধীনতা এমন কি তাহার সত্তা পর্য্যন্ত যেদিন বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, সেই দারুণ দুর্দ্দিনে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রত্যেকেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। কম্যুনিষ্টগণ ত স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের কাহিনী অমর হইয়া থাকিবে। চীনের অন্যতম প্রধান কম্যুনিষ্ট নেতা জেনারেল চু-টে'র কথায়—

"Communist troops had engaged 69 per cent of Japanese troops in China and 95 per cent of puppet troops fighting for Japan" অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরাই চীনের বিরুদ্ধে অভিযানকারী জাপ বাহিনীর শতকরা ৬৯ ভাগ এবং জাপানের আজ্ঞাবহ চৈনিক সৈন্যের শতকরা ৯৫ ভাগের সহিত লড়াই করিয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক ষ্টুয়ার্ট গেল্ডার (Stuart Gelder)-এর মতে কম্যুনিষ্টগণ চীনের ৩২০,০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান শত্রুকবলমুক্ত করিয়া চীনের জাপ-অধিকৃত অঞ্চল সমূহের মোট ২০০,০০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৯০,০০০,০০০ অধিবাসীর মুক্তিসাধন করিয়াছেন। টোকিও-র বিখ্যাত দৈনিক "আসাহি সিম্বুন্" (Asahi Shimbun)-এর সামরিক ভাষ্যকার যুদ্ধকালে লিখিয়াছিলেন—

"Our major enemy is now the Communist forces. Seventy per cent of our engagements in North China are fought against them. The Chunking army has lost the will to combat. The main task of our North China garrisons is to deal with the Communists who instigate

জেনারেল চু তে

কমিউনিষ্ট বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
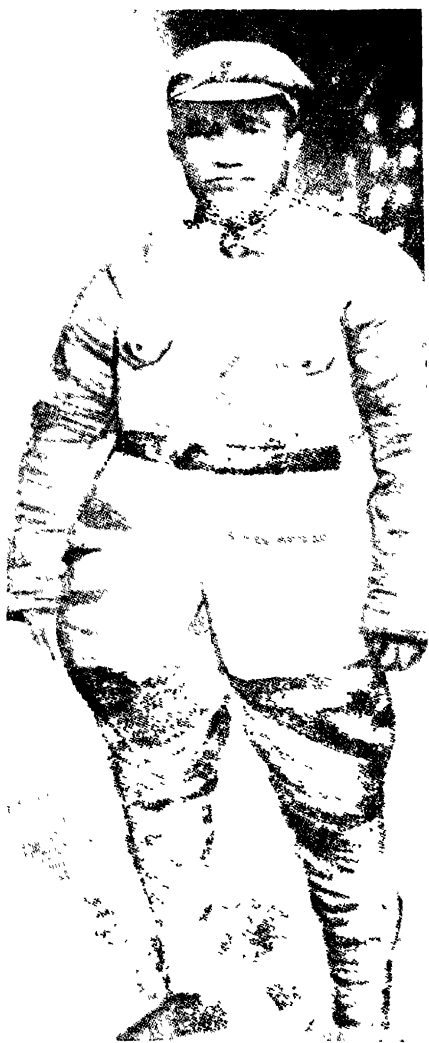
national consciousness and seek decisive battles” অর্থাৎ এখন কম্যুনিষ্ট বাহিনীই আমাদের প্রধান শত্রু। উত্তরচীনে আমাদিগকে যত যুদ্ধ করিতে হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৭০টিই কম্যুনিষ্টদিগের বিরুদ্ধে করিতে হয়। চুংকিং বাহিনীর আদৌ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। উত্তরচীনে নিয়োজিত আমাদের সৈন্যগণকে প্রধানতঃ কম্যুনিষ্টদিগের সহিতই যুদ্ধ করিতে হয়। ইহারা জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিতে এবং চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে চাহেন। এই যুদ্ধকালেই আবার মধ্যে মধ্যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধ এবং সঙ্ঘর্ষের কথাও শোনা গিয়াছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে এই বিরোধের জন্য প্রধানতঃ চিয়াং কাই-শেকের সর্ব্বাধিনায়কত্বে পরিচালিত ক্যুওমিন্‌টাং সরকারকেই দোষী মনে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে ‘এক কাঠি বাজে না’।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে উত্তরচীন হইতে লণ্ডনের ‘টাইমস্‌’ পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছিলেন যে চুংকিং জাতীয় সরকার কম্যুনিষ্ট-অধিকৃত স্থানগুলির পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে ‘দি ওয়ার য়্যাণ্ড্‌ দি ওয়ার্কিং ক্লাস’ (The War and the Working Class) নামক পত্রিকায় মিঃ এ, আভারিন (Mr. A. Avarin) চুংকিং সরকারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত পাঁচ দফা অভিযোগ করেন—

১। প্রতিক্রিয়াপন্থী, যুদ্ধপিপাসু এবং জয় সম্বন্ধে হতাশ নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক চুংকিং সরকারের নীতি প্রভাবিত হয়। মিঃ আভারিন এই নেতৃবৃন্দকে যুগোশ্লাভিয়ার মিহাইলোভিচ্‌ (Mihailovitch)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

২। ৮০০,০০০ জাপ-তাঁবেদার চীন সৈন্যের শতকরা ৯০ জনই পূর্ব্বে জাতীয় সরকারের সৈন্যদলভুক্ত ছিল। এই সমস্ত সৈন্যের অধিনায়কগণ দেশদ্রোহী মীরজাফরের ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন।

৩। চীনের আভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহের উন্নতি সাধন বা তাহার যথাযোগ্য ব্যবহারে জনসাধারণ কোন সরকারী সাহায্য পায় না। পক্ষান্তরে সরকার নিরঙ্কুশ ফট্‌কাবাজির প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

৪। চিয়াং কাই-শেকের অন্তরঙ্গ এবং পরম বিশ্বাসভাজন সুহৃদ্ হো ইং-চিন্ (Ho Ing-chin) প্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষগণ ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিত এবং দুর্দ্ধর্ষ অংশকে জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত না করিয়া তাহার সাহায্যে স্বদেশভক্ত কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে উত্তরচীনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন।

৫। সম্মিলিত কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং সরকার গঠনের প্রতিবন্ধকতা করিয়া ক্যুওমিন্‌টাং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ জাতীয় ঐক্য স্থাপনের পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিয়াছেন। ফলে চীনের সমর-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে।

জাপ যুদ্ধের আগুন নিভিতে না নিভিতেই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া অবশেষে সর্ব্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কোন কোনটি ক্যুওমিন্‌টাং এবং কোনটি বা আবার কম্যুনিষ্ট দলের প্রতি সহানু-ভূতিসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি প্রধান শক্তির চুংকিং-এ প্রেরিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে অভিযোগ শোনা গিয়াছিল যে তিনি কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং সমস্যা সমাধানের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছেন।

অনেকে আশঙ্কা করেন যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধের অবসান না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত মিঃ জিন্না এবং তাঁহার সাধের পাকিস্থানের চৈনিক সংস্করণের কথা শোনা যাইবে।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে যে সমস্ত কারণে ভারতবর্ষে পাকিস্থান সম্ভবপর হইয়াছে সে সমস্ত কারণ—অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক একটি রাজনৈতিক দলের সহিত সম্পূর্ণভাবে প্রতি-

ক্রিয়াপন্থী অপর একটি দলের মতানৈক্য, ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য তৃতীয় পক্ষ কর্ত্তৃক শেষোক্ত দলকে প্রশ্রয়দান—চীনেও আছে।

কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধের অবসান ঘটাইবার দুইটি মাত্র পথ আছে। হয় কম্যুনিষ্টগণকে তাঁহাদের যাবতীয় সৈন্যসামন্ত এবং সমরোপকরণ ইত্যাদি ক্যুওমিন্‌টাং দলের হাতে তুলিয়া দিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব লাভের প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে অর্থাৎ রাজনৈতিক আত্মহত্যা করিতে হইবে আর না হয় ত ক্যুওমিন্‌টাং দলকে সর্ব্বময় রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণের ভোটের অধিকার স্বীকার করিতে এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেনের পুত্র, জাতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ (Legislative Yuan)-এর সভাপতি ডাঃ সুন্ ফো (Dr. Sun Fo) কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে কম্যুনিষ্টগণ যদি অস্ত্রত্যাগ না করেন অথবা দেশ শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তবে তাঁহাদিগকে একেবারে উৎসাদিত করা ব্যতীত কম্যুনিষ্ট সমস্যা সমাধানের অন্য কোন পথ থাকিবে না।

কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধের একটি প্রধান কারণ এই যে সমাজের মেরুদণ্ড কৃষক সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রাজনৈতিক ছোঁয়াচ হইতে দূরে রাখিয়া দলীয় ক্ষমতা বজায় রাখা ক্যুওমিন্‌টাং দলের উদ্দেশ্য। এই জন্যই এই দল সেদিন পর্য্যন্ত একটিও সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে নাই। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্টগণ কৃষক সম্প্রদায়কে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। জনগণের সহায়তায় স্ব-দলের শক্তির সংরক্ষণ, সংবর্দ্ধন এবং পরিণামে রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বলাভ তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

জাপ যুদ্ধকালে কম্যুনিষ্টগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দিবার দাবী জানাইয়াছিলেন। ক্যুওমিন্‌টাং সরকার এই দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই। যুদ্ধের প্রথমাবধি

পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত চীনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সর্ব্ববিধ সমরোপকরণের একান্তই অপ্রাচুর্য্য ছিল। চীনের মিত্রবর্গ তাহাকে যে পরিমাণ সাহায্য করিতে পারিতেন তাহার একাংশও করেন নাই। কম্যুনিষ্টগণ বলেন যে প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অপ্রচুর যে অস্ত্রশস্ত্র এবং সমরসম্ভার চীনের ছিল তাহারও ন্যায্য অংশ হইতে কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল।

যতদিন যুদ্ধ চলিতেছিল, কম্যুনিষ্টগণ বার বার ক্যুওমিন্টাং বাহিনী কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট-শাসিত অঞ্চলসমূহের অবরোধ প্রত্যাহার করিবার, 'লেণ্ড-লিজ' চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত সমরোপকরণ কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্টাং-বাহিনীকে সমান ভাবে দেওয়ার এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটাইয়া সর্ব্বদলীয় সরকার গঠন করিবার দাবী জানাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত দাবীগুলির কোনটিই পূর্ণ করা হয় নাই। স্বীয় কার্য্যের সমর্থনে ক্যুওমিন্টাং সরকার বলিয়াছেন যে কম্যুনিষ্টগণ অবৈধ ভাবে তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যা বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন এবং বরাবর শত্রুর সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান করিয়াছেন।

ক্যুওমিন্টাং দলের কম্যুনিষ্ট-ভীতি কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং ঐক্যের একটি প্রধান অন্তরায়। প্রথমোক্ত দল মনে করেন যে কম্যুনিষ্টগণ সুযোগ পাইলেই স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলে এমন একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত করিবেন যে তাহাকে বশে রাখা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। তাঁহাদের ধারণা যে একবার কম্যুনিষ্ট দলের বৈধতা স্বীকার করিলে কোনক্রমে আর তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা যাইবে না।

আগতপ্রায় যুগে অন্যান্য দেশের মত চীনেও প্রগতিপন্থীদিগের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। কম্যুনিষ্ট ব্যতীত প্রগতিপন্থী আরও রাজনৈতিক দল

চীনে রহিয়াছে। একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের একনায়কত্বের অবসান আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে ক্যুওমিন্‌টাং দলের একাধিপত্য চলিয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহা অসম্ভব। অন্যান্য দলের মতামত উপেক্ষা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তাহার প্রত্যেকটিকেই যথাযোগ্য গুরুত্ব এবং মর্য্যাদা দান গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির গোড়ার কথা। জাপ যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ চীনের সর্ব্বত্র গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসার লাভ করিয়াছে।[১]

জীবনযাত্রা সহজ এবং জীবিকানির্ব্বাহ স্বল্পায়াসসাধ্য না হইলে কোন সংস্কার-প্রচেষ্টাই ফলবতী হইতে পারে না। চীন সরকার হয়ত এই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করেন। কিন্তু তাহা হইলেও যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর চীনে সাধারণ জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হওয়া দূরের কথা তাহার ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় চীনের মস্ত একটা সুবিধা আছে। স্বাবলম্বন চীনের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। গৃহনির্ম্মাণের প্রয়োজন অনুভব করিলে চৈনিক কৃষক অযথা কালক্ষেপ না করিয়া এবং সরকার বা অপর কাহারও ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া নিজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে গৃহ-সমস্যা উপস্থিত হইলে কোথায় এবং কি ধরণের গৃহ নির্ম্মিত হইবে আর কাহারাই বা গৃহনির্ম্মাণের অধিকারী হইবে প্রথমতঃ তাহা লইয়া বিভাগীয় কর্ত্তাদেব মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী তুমুল বাদ-বিতণ্ডার পর কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত হয়।

১। "It is the inescapable outcome of the war, and of the widely enlivening effect it has had on the minds of all Chinese even in the lowest strata."

---*The Story of China's Revolution* by O. M. Green, p. 115.

আঘাত যত গুরুতরই হউক না কেন, তাল সামলাইয়া উঠিবার ক্ষমতা চীনের অসাধারণ, অমানুষিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হ্যাঙ্কোর কথা ধরা যাক্‌। টাইপিং বিদ্রোহকালে এই নগর তিন বার অগ্নিদগ্ধ এবং তিন বার পুনর্নির্ম্মিত হয়। ১৯১১ সালে রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় হ্যাঙ্কো পুনরায় অগ্নিদগ্ধ হয়। কিন্তু দুই বৎসর পরে ১৯১৩ সালে হ্যাঙ্কোতে এই বিপর্য্যয়ের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং জাপ যুদ্ধের ফলে চীনের অপরিসীম ক্ষতি হইলেও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এই চীনই সর্ব্বপ্রথম গা ঝাড়া দিয়া উঠিবে আশা করা হয়ত অযৌক্তিক হইবে না।

মহাচীনের বিরাট জন-সমষ্টির শতকরা ৮০ জন কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে। জীবনধারণের জন্য ইহারা একান্তভাবেই মাতা বসুন্ধরার করুণার মুখাপেক্ষী। কিন্তু কৃষির উপর অনন্যনির্ভর হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বর্ত্তমান যুগে সম্ভব নহে। এই জন্যই চীন সরকার শিল্পোন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতোমধ্যেই একটি দশবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। রাস্তা, রেলপথ এবং জলপথে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, দেশের কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি যাবতীয় খনিজ সম্পদের অপচয় নিবারণ ও যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং কলকারখানার সংখ্যা বাড়াইয়া জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা কালেও—অবশ্য প্রধানতঃ এই যুদ্ধ এবং তজ্জাত সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রয়োজনেই—শিল্প-প্রগতি সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় নাই। তিব্বত এবং জেচোয়াং-এর মধ্যবর্ত্তী যে সিকং (Sikang) প্রদেশের নামও পূর্ব্বে প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল সেই সিকংই আজ চীনের অন্যতম প্রধান শ্রম-শিল্পকেন্দ্র। উত্তরচীনেও শিল্পের বহুল প্রসার হইয়াছে। পশ্চিমচীনে সর্ব্বপ্রকার অনাচার এবং সামন্ত-প্রথার কুফল বিশেষভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এই অঞ্চলেও যুদ্ধ-পূর্ব্ব

অবস্থা কোন দিনই আর ফিরিয়া আসিবে না। ব্রহ্মদেশের সহিত আবার চীনের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। চীন এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে চীনের পশ্চিম এবং দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ্‌রাজির কাট্‌তি হইবার পথে কোন অসুবিধাই আর থাকিবে না। ইহার ফলে একদিকে যেমন দেশের সমৃদ্ধি বাড়িবে অপর দিকে তেমনই আবার রাজনৈতিক ভার-সাম্য স্থাপিত হইবার পথও সুগম হইবে।

চীনের সর্ব্বত্র শ্রম-সমবায় সমিতি (Industrial Co-operatives) স্থাপিত হওয়ার ফলে কৃষককে বৎসরের কোন সময়েই এখন আর বেকার বসিয়া থাকিতে হয় না। সমবায় আন্দোলন বিদ্যুদ্বেগে প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু এখনও বহু শ্রম-শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং যত শীঘ্র তাহা হয় ততই মঙ্গল। সমবায় আন্দোলন চীনে যতই বিস্তার লাভ করুক্ না কেন, এই আন্দোলন কোন দিনই সমগ্র দেশের মোট চাহিদা মিটাইতে পারিবে না। এই জন্যই শিল্পোন্নতি চীনের পক্ষে একান্তভাবেই আবশ্যক। কিন্তু শিল্পের উন্নতি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের কুফলগুলি যাহাতে আত্মপ্রকাশ না করে তাহার প্রতি অবহিত হইতে হইবে। অন্যথা বর্ত্তমানে যে সমস্যাগুলি আছে তাহাদের সমাধান হইলেও নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্টির ফলে জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে এবং শিল্পোন্নতির প্রধান উদ্দেশ্য মানব-কল্যাণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

দেশে নূতন নূতন পণ্যোৎপাদন প্রয়োজন। পূর্ব্বেকার মত চা, রেশম এবং অন্যান্য দুই-তিনটি শিল্পের উপর অনন্যনিভর হইয়া থাকিলে চলিবে না। মাটির উপর এবং নীচেকার প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্ভারের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। পণ্যোৎপাদনের ক্ষমতা এবং উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীদিগের পারিশ্রমিকের হার বাড়াইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাইতে হইবে।

শ্রম-শিল্পজ পণ্য রপ্তানিকারী দেশগুলি চীনের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া উঠিতে পারে। কারণ শ্রম-শিল্পে উন্নত চীন কেবল যে নিজের চাহিদা মিটাইতেই সমর্থ হইবে তাহা নহে, বিদেশের বাজারেও সে প্রথমোক্ত দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে অদূর ভবিষ্যতে নিজের প্রয়োজনীয় সস্তা ও খেলো কাপড়চোপড় এবং সাধারণ ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলেও চীনকে এখনও দীর্ঘ কালের জন্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি, কলকব্জা এবং সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য প্রধানতঃ বাহির হইতে যোগানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। চীনের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত জিনিষের চাহিদাও তাহার বাড়িয়া যাইবে। কাজেই চীনের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে রপ্তানিকারী দেশগুলির আপাততঃ আর্থিক অবনতির কোন আশঙ্কাই নাই। পক্ষান্তরে চীনের সমৃদ্ধি এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিবে।

ডাঃ স্থনের আদর্শকে রূপায়িত করিবার পথে বহু অন্তরায় আছে সত্য; কিন্তু ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৫ সাল এই আট বৎসরব্যাপী দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চীনের নবজন্ম হইয়াছে। নির্ম্মম শত্রুর নিষ্করুণ আঘাত জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী মহাচীনকে স্ব-শক্তিতে আস্থাবান্ করিয়া তুলিয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের আক্রমণের ফলে এই ভাবেই স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সর্ব্বগ্রাসী রাজ্যলিপ্সার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোধের সূচনা এবং বিকাশ ত সেদিনের কথা। আর সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ বাহিরের আঘাতের ফলেই ত অখণ্ড ভারতীয় জাতি-গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। পরে অবশ্য সমস্তই ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। কেন, কাহার দোষে, সে আলোচনা এখানে অনাবশ্যক এবং অবান্তর।

জাপ যুদ্ধের ফলে চীনের গণ-মানসের বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ব্যক্তির উপর পরিবারের প্রভাব হ্রাস একটি উল্লেখযোগ্য

পরিবর্ত্তন। যুদ্ধের ফলে চীনের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং দৃষ্টি-কোণ প্রসারিত হইয়াছে। চীন নাগরিক আজ নূতনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। সে আজ চিন্তা করে সমগ্র জাতির কথা। জাতি-মানসের এই রূপান্তরই চীনের সাধনার উত্তরসাধক হইবে।

নারী-প্রগতি

বিংশ শতাব্দীতে চীনে যে সমস্ত বিস্ময়কর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে নারীর অবস্থার পরিবর্ত্তন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। অতি প্রাচীন কাল হইতেই মহাচীনের সমাজ-জীবনে নারীর মর্য্যাদা এবং গৌরবের আসন স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগের ইউরোপের ন্যায় মধ্যযুগীয় চীনেও স্বল্পসংখ্যক নারী রণনৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য এবং কবি-প্রতিভার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু অন্তঃপুরের অবরোধে লক্ষ লক্ষ নারী যে কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতেন তাহারই প্রভাব সমাজ-দেহের সর্ব্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পরোক্ষভাবে সমগ্র সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করিত। চীনেব রাষ্ট্রিক এবং জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে নারীর যোগদান এবং তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ খুব বেশী দিনের কথা নহে।

চীনের সমাজ-সংগঠন পরিবার-কেন্দ্রিক। গৃহিণীই পরিবারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। চীন ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম গ্রন্থে সদর এবং অন্দর যথাক্রমে পুরুষ এবং নারীর যোগ্য স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[১] অপর একখানি প্রাচীন গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে পুরুষ ঘরের কথা এবং নারী বাহিরের কথা আলোচনা করে না।[২] সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় না যে চীনের

১। "Woman occupies her rightful place inside and man outside the house." —*Yi-Ching.*

২। "Men discuss not of internal matters and women not of external matters." —*Li-Chang.*

পারিবারিক জীবনে নারীর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব কোন দিনই ইউরোপীয় নারী অপেক্ষা কম ছিল না। এখনও কম নহে। অধ্যাপক তান্ ইউন্-সাং (Tan Yun-shang)-এর কথায় বলিতে গেলে চৈনিক স্বামী মাত্রই স্বীয় স্ত্রীর আঁচল-ধরা ("are all henpecked husbands.")।

প্রাচীন কাহিনী, সাহিত্য এবং ভাষা হইতে অনুমিত হয় যে চীনের সমাজ-জীবন একদা নারীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নারীর তুলনায় সে যুগের পুরুষ একান্তই ক্ষমতাহীন ছিল। তাহার পর—ঠিক কোন্ সময় বলা যায় না—অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং নারীর প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

চীনের প্রাচীন সরকারী বিধিতে বলা হইয়াছে যে নারীকে পতি-পরায়ণা, ধার্ম্মিকস্বভাবা, মার্জ্জিত এবং সংযতভাষিণী, মধুর আলাপ-কারিণী, শিষ্টাচারিণী এবং গৃহকর্ম্মনিপুণা হইতে হইবে। এই বিধিতে আরও বলা হইয়াছে যে কুমারী কন্যা পিতার, স্ত্রী স্বামীর এবং ভর্ত্তৃহীনা নারী পুত্রের বশে থাকিবে। এই বিধানদাতা স্বতঃই মনুসংহিতা প্রণেতার কথা মনে করাইয়া দেন্।[১]

এই সমস্ত বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও পারিবারিক জীবনে চীন নারী আজ পর্য্যন্ত একটি বিশেষ মর্য্যাদার স্থান অধিকার করিয়া আছে। সামাজিক জীবনও নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে নহে।

সুগৃহিণী এবং সুজননী হওয়া চীনদেশের নারীত্বের আদর্শ। মধুরপ্রকৃতি এবং উন্নতস্বভাবা রমণী চীন সমাজে মোটেই বিরল নহে। অবরোধ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক শালীনতার বিধি-নিষেধের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। সাধারণতন্ত্রের যুগে আইনের দৃষ্টিতে নারী এবং পুরুষের সমানাধিকারের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। এই যুগেই চীনে সর্ব্বপ্রথম বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সহ-শিক্ষা প্রচলিত হইলেও

১। "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
"রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"—মনুসংহিতা

ইহা বেশী প্রসার লাভ করে নাই বা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে নাই। সাধারণ-তন্ত্রের যুগে চীন দেশের মেয়েদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বৰ্দ্ধিত হয়। শিক্ষিতা নারীগণ ক্রমশঃ পাশ্চাত্য লেখক-দিগের রচনাবলী এবং আমেরিকায় প্রস্তুত নির্ব্বাক্ চিত্রের—তখনও সবাক্ চিত্রের দিন আসে নাই—প্রতি অনুরাগিণী হইয়া উঠিলেন। ফলে প্রাচীন জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে ভাঙ্গন ধরিল। এই ভাঙ্গনের বেগ ক্রমশঃ দ্রুততর এবং ইহার লক্ষণ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগরসমূহেই এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চোখে পড়িত। কিন্তু আজ দেশের অতি দূর এবং দুর্গম অংশেও এই পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও বিবাহ-ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী অপেক্ষা তাহাদের মাতা-পিতার মতামত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন পিতামাতার সম্মতি ব্যতীত বা তাঁহাদের অমতেও অনেকে জীবন-সঙ্গী এবং সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিতে দ্বিধা করে না।

চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে নারী আজ পুরুষের সহকর্ম্মিণী। পুরুষের ন্যায় নারীও সরকারী কর্ম্মলাভের অধিকারিণী। প্রথম প্রথম যে সমস্ত নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই শিক্ষাদান এবং জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধায়ক কার্য্যে আত্মনিয়োগ অথবা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বহু নারী আজ জাতীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন।

চীন নারী যে আজ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরুষের “দিবসের কর্ম্ম-সহচরী,” তাহার “যামিনীর নর্ম্ম-সহচরী” মাত্র নহেন জাপানের সহিত জীবন-মরণ যুদ্ধের সময় তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মৃত্যুবর্ষী আগ্নেয়াস্ত্রের বিভীষিকা উপেক্ষা করিয়া নারী যেমন অকুতোভয়ে শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছেন তেমনই আবার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে নারীদিগকে

বিভিন্ন কুটিরশিল্প গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন। সংগ্রামরত সৈনিক-বৃন্দের পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের কার্য্য তাঁহারা অতি সুচারু রূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে চীনের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে নারীর দানের পরিমাণ মোটেই উপেক্ষা করিবার মত নহে ৮

মাদাম্ চিয়াং কাই-শেক চীনের যাবতীয় সরকারী নারী-প্রচেষ্টার সর্ব্বাধিনায়িকা। 'নবজীবন আন্দোলন সমিতি' (New Life Movement Association)-র নেত্রীরূপে তিনি সরকারী আনুকূল্যে পরিচালিত যাবতীয় নারী-প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধকালে মাদাম্ চিয়াং স্বয়ং আশ্রয়প্রার্থী অনাথ শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে মাদাম্ চিয়াং ব্যতাত অন্যান্য বহু নারীও দেশের রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সুষ্ঠুভাবে স্ব-স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে 'পিপ্‌ল্‌স্ পলিটিক্যাল কাউন্সিল' (People's Political Council)-এর ২৪০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৫ জন মহিলা ছিলেন সত্য, কিন্তু পাঁচ জন সদস্যে গঠিত ইহার সভাপতিমণ্ডলী (Presidium)-তে একজন মহিলা ছিলেন। তিনি ডাঃ উ ই-ফ্যাং (Dr. Wu Yi-fang)। মফঃস্বল শহর এবং সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও নারীগণ রাজনৈতিক এবং শাসনকার্য্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত বিপদ-আপদ উপেক্ষা করিয়াও যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিতে নারীগণ ইতস্ততঃ করেন নাই। যুদ্ধ যখন দেশের অভ্যন্তরভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং বহু আহত সৈন্য আসিয়া কিয়াংসি'র রাজধানী নান্‌চাং-এ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তথাকার নারীসমাজ যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য্যে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে নান্‌চাং বল্‌ডুইন্ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী-

মাদাম চিয়াং কাই-শেক

গণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাপ বাহিনী যখন কিয়াংসি-আনহুই সীমান্তে আঘাতের পর আঘাত হানিতেছিল, নারী কর্ম্মিগণ পরিত্যক্ত গ্রাম এবং দুর্গম অঞ্চল হইতে অন্ততঃ ২০০টি অনাথ শিশুব উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। বিপদের আশঙ্কা তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ১৯৪০ সালে জাপান কর্ত্তৃক চেকিয়াং আক্রমণ-কালে 'চেকিয়াং নারী-আন্দোলন সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির সদস্য-সংখ্যা এক সময়ে ১০,০০০-এরও অধিক হইয়াছিল। রাজধানী হ্যাংচো যখন বিপন্ন হইয়া পড়িল তখন এই সমিতি যে সমস্ত অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছিল সে সমস্ত অঞ্চল হইতে ৫০০ নারী এবং শিশুকে উদ্ধার করিয়াছিল।

কোয়াংসি'র নারীগণ অসাধ্যসাধন করিয়াছেন।[১] যুদ্ধকালে গঠিত কোয়াংসি'ব নারী-কর্ম্মীবাহিনী 'কোয়াংসি এ্যামাজন্‌স্' (Kwangsi Amazons) নামে অভিহিত হইত। এই বাহিনী জনসাধারণকে গেরিলা যুদ্ধ চালাইতে অর্থাৎ অতর্কিত আক্রমণে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের শেষার্দ্ধে শত্রু যখন কোয়াংসি আক্রমণ করে তখন এই 'এ্যামাজন্' বাহিনী বিপন্ন অঞ্চলে যাইয়া নারী এবং শিশুদিগকে স্থানান্তবিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণের পর তাহার পিছনের পথঘাট ধ্বংস করিয়া শত্রুর অগ্রগতিতে বাধা উৎপাদনেও 'এ্যামাজন্'গণ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কোয়াংসি শত্রু-কবলমুক্ত হইবার পর নারী-কর্ম্মিগণ যাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে পরিত্যক্ত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উৎসাহিত

১। "Dressed in khaki uniform, wearing a steel helmet and carrying two hand grenades, Kwangsi's girl students, who received military training, were pioneers in women's front line war work. Short of seeing action in the battle-field, they have followed Kwangsi troops everywhere." —*China After Five Years of War*, P. 210.

করিয়াছেন এবং বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার নিয়মকানুন (A. R. P. measures) শিক্ষা দিয়াছেন। ছাত্রীদিগের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পল্লী-অঞ্চলের নারীগণও সৈন্যদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ শেলাই এবং পরিষ্কার করিবার কার্য্যে নিজেদের সময় এবং সামর্থ্য নিয়োজিত করিযাছিলেন। সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য ছাত্রীগণ বহুবার বহুস্থানে নাট্যাভিনয় এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের আযোজন করিয়াছে।

চীনের নারীদিগের মধ্যে কোয়ানটুং-এর ছাত্রীগণই সর্ব্বপ্রথম হাতবোমা ব্যবহার করে। ১৯৪১ সালে শত্রু যখন সাওকোয়াং-এব দিকে অগ্রসব হয় সেই সময় কোয়ানটুং-হোনান সীমান্তের সন্নিহিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে ১০০ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার = ৩২৮০'৮৯ ফুট) দীর্ঘ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তার রক্ষাব ভার ছাত্রীগণের উপব অর্পিত হয। তাহারাও অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিযাছিল। অন্যান্য নারী-কর্ম্মীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া অনাথ এবং নিরাশ্রযদিগের উদ্ধারসাধন, সৈন্যগণেব উৎসাহবর্দ্ধন ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান এবং আহত সৈনিকগণকে প্রাথমিক সাহায্য দান করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বর্ণজ্ঞানহীনা নারীদিগকে লিখিতে এবং পড়িতে, সূতা কাটিতে, কাপড় বুনিতে এবং শেলাই করিতে শিখাইযাছেন। 'গেরিলা যুদ্ধে'ও চীন নারী একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রেও নারীর দান উপেক্ষা করিবার মত নহে। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের সময চীনের বিভিন্ন সেবা এবং চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান, সামরিক চিকিৎসা বিভাগ, 'রেড ক্রস মেডিক্যাল রিলিফ কোর' (Red Cross Medical Relief Corps), 'ন্যাশনাল হেল্‌থ্‌ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন' (National Health Administration) ইত্যাদিতে নারীকর্ম্মীর সংখ্যা ২,০০০-এরও অধিক ছিল।

যাবতীয় যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টার ন্যায় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্যেও চীন নারী পুরুষের যোগ্য সহযোগিনী এবং সহকর্ম্মিণীর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারী নিজের হাতে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহাচীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিং-এ এবং দেশের অন্যত্র যুদ্ধের সময় যত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে দেশের নারীশক্তি প্রয়োজনীয় সহাযতা দান করিয়াছে। এই সমস্ত রাস্তার মধ্যে যে রাস্তাটি কান্‌সু এবং জেচোয়াং-এর মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে তাহার কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।[১]

'উইমেন্‌স্‌ এ্যাডভাইসরি কাউন্সিল' (Women's Advisory Council)-এর সহায়তায় যে সমস্ত নারী-শ্রমিককে যুদ্ধকালে হ্যাঙ্কোর বিভিন্ন শ্রম-শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে সেন্‌সি এবং জেচোয়াং-এ স্থানান্তরিত করা হইযাছে তাহারা চীনের শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থাকে সচল এবং সক্রিয রাখিয়াছে। 'নবজীবন আন্দোলন সমিতি'-র অন্তর্গত এই কাউন্সিল যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর যুগের যাবতীয় নারী-প্রচেষ্টার মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং সামঞ্জস্য বিধান করিযা থাকে। নয়টি শাখায় বিভক্ত এই কাউন্সিলের 'সাধারণ বিভাগ' (General Affairs Department) ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪০ সালের বসন্তকালের মধ্যে ১,০০০ উৎসাহী কিশোরীকে রাজনৈতিক এবং সামরিক শিক্ষাদান করিযা তাহাদিগকে বিভিন্ন হাতের কাজ এবং কুটিরশিল্পে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে একদল যে সমস্ত অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছিল সে সমস্ত জায়গায় এবং পল্লী-অঞ্চলে আশ্রয়-প্রার্থী শিশুদিগের মঙ্গলজনক বিবিধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। অপরাপর দলগুলি স্ব-স্ব প্রদেশে নারী-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে কৃতযত্ন হইয়াছে।

১। "The 240-mile Kansu-Szechwan highway stands as an immortal monument to the women of Kansu, thousands of whom have worked on it."
—*China After Five Years of War.*

উত্তাল সমরতরঙ্গ যখন হ্যাঙ্কোকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল তখন এই কাউন্সিলের অধীন 'জীবিকা-সংস্থান বিভাগ' (Livelihood Department) বিপন্ন অঞ্চল হইতে স্থানান্তরিতা ৩,০০০ নারী-শ্রমিকের কর্ম্মসংস্থান করিয়া দিয়াছিল। ১৯৪০ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত এই বিভাগ বড় বড় শ্রম-শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করিবাব জন্য ছয়টি কর্ম্মীদল গঠন করিয়াছে, ১০৭৬ জন নারী-শ্রমিককে সমাজসেবা কার্য্যে সুশিক্ষিতা করিয়াছে এবং ৬,৬৮৮ জন নিরক্ষর নারীকে লিখিতে এবং পড়িতে শিখাইযাছে। এতদ্ব্যতীত প্রভূত অর্থও এই বিভাগ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইযাছে। 'এ্যাড্‌ভাইসরি কাউন্সিলে'র অধীন 'উৎপাদন বিভাগ' (Porduction Department) কর্ত্তৃক কয়েকটি রেশম শিল্প-কেন্দ্র এবং কতকগুলি বয়ন ও সূতা কাটিবার কেন্দ্র পরিচালিত হইযা থাকে। এইগুলি ব্যতীত এই বিভাগের অধীনে একটি কাপড়ের কল এবং কয়েকটি হাতের কাজের কেন্দ্রও রহিয়াছে। জেচোয়াং প্রদেশের পল্লী-অঞ্চলে এই বিভাগ কর্ত্তৃক রেশম উৎপাদনের উন্নত ধরণেব আধুনিক প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং নারী-কর্ম্মীগণ ইহার তত্ত্বাবধানে সূতা কাটিতে, কাপড বুনিতে এবং কাপড়ের উপর ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদির নক্সা তুলিতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে এই বিভাগের চেষ্টা এবং যত্নে প্রায ৩,৫০০ নারী বিবিধ শিল্পকার্য্যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত নারী আবার নিজেদের অর্জ্জিত বিদ্যা অপর নারীদিগকে শিখাইয়াছেন। ১৯৪২-৪৩ সালে এই বিভাগ কর্ত্তৃক ৩৫টি সমবায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইত। ঐ বৎসরই এই বিভাগ উন্নত ধরণের কর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষাদান করিবার জন্য ৪৬টি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। জাপ যুদ্ধের প্রথম সাত বৎসরের মধ্যে (১৯৩৭-৪৩) 'উইমেন্‌স্ রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন' (Women's Relief Association)-এর সহযোগিতায় 'ওয়ার রিলিফ ডিপার্টমেণ্ট' (War Relief Department) নগদ পাঁচ কোটি ডলার চাঁদা, বহু ঔষধপত্র এবং

চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়াছিল। কাউন্সিলের অধীনস্থ 'আশ্রয়প্রার্থী শিশু-বিভাগ' (Refugee Children's Department) কর্তৃক যুদ্ধকালে ৫০টি শিশুশালা পরিচালিত হইত। এই বিভাগ ২৫,০০০-এরও অধিক অনাথ শিশুর উদ্ধারসাধন করিয়াছে। 'এ্যাড্ভাইসরি কাউন্সিল' (Advisory Council)-এর অন্তর্গত 'পল্লীসেবা বিভাগ' (Rural Service Department) জনসাধারণকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং 'সংস্কৃতি বিভাগে'র সহায়তায় সংস্কৃতির মান ও 'উৎপাদন বিভাগে'র সহায়তায় জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাইয়াছে। যুদ্ধের সময় 'পল্লীসেবা বিভাগে'র অধীনে অনেকগুলি পল্লীসেবাদল গঠিত হইয়াছিল এবং ইহারই যত্নে ১০০,০০০ নিরক্ষর ব্যক্তি অক্ষরজ্ঞান লাভ করিয়াছে।

'এ্যাড্ভাইসরি কাউন্সিলে'র অধীন 'কো-অর্ডিনেশন বিভাগ' (Co-ordination Department) জাপ যুদ্ধের সময় দেশের যাবতীয় নারী-প্রচেষ্টাকে নিযন্ত্রিত এবং সুসংহত করিয়া মহাচীনের ৩৫১টিরও অধিক নারী-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়াছে এবং অনেকগুলি প্রাদেশিক এবং মিউনিসিপ্যাল নারী-সমিতি গঠন করিয়াছে। এই বিভাগই আবার বিভিন্ন দেশে কতিপয় নারী-প্রতিষ্ঠান এবং চীনের সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিতে বহু 'নিউ লাইফ উইমেন্স্ সার্ভিস কোর' (New Life Women's Service Corps)-ও গঠন করিয়াছে। 'এ্যাড্ভাইসরি কাউন্সিলে'র 'সংস্কৃতি বিভাগ' কর্তৃক কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। যুদ্ধকালে জাপান চীনের বিরাট একটা অংশ গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। অগণন নর-নারী শত্রুর হস্তে হতাহত হইয়াছে। প্রবল শত্রুর নির্মম আক্রমণ জাতীয় জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। বিশ্বের নির্য্যাতিত মানবতা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে প্রায় নিরস্ত্র এবং একক চীনের সর্ব্ব-

প্রকাবে বলবত্তর এবং আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত জাপ বাহিনীর সহিত শক্তি পরীক্ষা লক্ষ্য করিয়াছে। শত্রুর আক্রমণে জনপদের পর জনপদ, এমন কি রাজধানী নান্‌কিং পর্য্যন্ত, জাতীয় সরকারের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। চীন কিন্তু নতি স্বীকার করে নাই বা হাল ছাড়ে নাই। শত্রু আঘাতেব আঘাত হানিয়াছে। চীন সহ্য করিয়াছে এবং সুযোগ পাইলেই প্রত্যাঘাত হানিয়াছে। কখনও কখনও এই প্রত্যাঘাত সাফল্য লাভও কবিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত বিজযলক্ষ্মী মহাচীনের কণ্ঠ-লগ্না হইয়াছেন। চীনের জয় লাভের একাধিক কারণ থাকিলেও জাতীয় ঐক্য, জনসাধারণের দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় জীবনের নিদারুণ দুর্য্যোগের দিনে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের পরিপূর্ণ সহযোগিতাই ইহার মূল কারণ।

চীনেব অন্তহীন দুঃখ-দুর্গতির কারণ এই জাপ যুদ্ধই আবার তাহার নারী-প্রগতির বেগকে ক্ষিপ্রতর করিয়া ইহাকে পরিপূর্ণতা এবং সার্থকতা দান করিরাছে। ১৯৩৭ সালে যখন দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন চীন সমাজে আলোকপ্রাপ্তা নারীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য না হইলেও সাধারণভাবে বলিতে গেলে চীন নারী তখন পর্য্যন্ত গৃহকোণেই বদ্ধ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ৫,০০০০,০০০ কোটি নর-নারী পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদিগকে যে অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় তাহাতে বহু পরিবার ছিন্নভিন্ন এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কখনও কখনও পরিবারের অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণ বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিদিগকে জমিজমা তদারক করিবার জন্য গৃহে রাখিয়া নিজেরা অন্যত্র চলিয়া যাইত। কখনও বা আবার পরিবারের বিবাহিত যুবকগণ জরাজীর্ণ এবং পথ চলিতে অশক্ত বৃদ্ধদিগের পরিচর্য্যার জন্য নিজেদের পত্নীদিগকে গৃহে রাখিয়া নিজেরা অন্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কখনও বা কোন পরিবারের অর্দ্ধেক বা তাহারও অধিক লোক শত্রুর

বোমাবর্ষণে নিহত হইবার পর হতাবশিষ্টগণ যে যে দিকে পারিত পলায়ন করিত। এই ভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিশু মাতা-পিতার এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘ পথ অতিবাহনের পর আশ্রয়-প্রার্থীর দল যখন শত্রুকবলমুক্ত কোন অঞ্চলে পৌছিত তখন তাহাদিগকে আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিতে হইত। নূতন সংসারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই সমান ভাবে পরিশ্রম করিতে হইত।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে জাপ যুদ্ধ চীনের পারিবারিক জীবনে ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটাইয়া পরিবার-প্রথাকে শিথিলমূল করিয়া দিয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধের ফলে বহু পরিবার ভাঙিয়া গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে সমস্ত পরিবার উদ্বাস্তু হয় নাই তাহাদের পক্ষেও আর চিরাচরিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। যুদ্ধের জন্য খাদ্যদ্রব্য, শিল্প-জাত পণ্য, ভৃত্য, শ্রমিক ইত্যাদি সমস্তই দুর্ঘট হইয়াছে। মুদ্রা-স্ফীতি (Inflation)-র ফলে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিং-এর বাজারে কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য নিম্নলিখিত প্রকার ছিল—

একটি ফেল্টের টুপি—	৬৫০	ডলার
একজোড়া জুতা—	২৬০	,, ,,
এক প্রস্থ স্যুট—	২৬০০	,, ,,
এক বোতল হুইস্কি—	২৪০০	,, ,,
এক পাউণ্ড মাখন—	২৩০	,, ,,
একটি লিপষ্টিক—	১৩০	,, ,,

এই অবস্থায় জীবনধারণের জন্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই কঠোর পরিশ্রম করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

আধুনিক চীনের রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীবনের সর্ব্ব বিভাগেই নারীর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। যুদ্ধকালে চীন নারী পুরুষের পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে এবং প্রাণ হাতে করিয়া গোরিলা বাহিনীর সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা করিতে দ্বিধা করেন নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেবলমাত্র নারীদিগের প্রদত্ত মূলধনে এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদেরই পরিচালনায় চীনে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত বহু শ্রম-শিল্পপ্রতিষ্ঠান নারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। নারীর রেলওয়ে ও খনির এঞ্জিনিয়ারের পদে এবং উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগের দৃষ্টান্ত আজ আর মোটেই বিরল নহে।

এক কথায় বলিতে গেলে মহাচীনের নারী আজ অবরোধের শান্তি এবং নিরাপত্তা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা এবং তাহার বিপদের সম্ভাবনাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। প্রাণ-চঞ্চল, বৃহত্তর বহির্জগতের আহ্বানকে উপেক্ষা না করিয়া সে সানন্দে তাহাতে সাড়া দিযাছে।

চীন কোন্ পথে ?

সুদীর্ঘ অষ্টবর্ষব্যাপী রক্তস্নানের জের মিটিতে না মিটিতেই মহাচীনের ভাগ্যাকাশে আবার দুর্য্যোগের মসীকৃষ্ণ মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা মহাচীনের জাতীয সত্তাকে আবার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। চীনেব ভাগ্যাকাশে কবে যে নবারুণরেখার সন্ধান মিলিবে কে জানে !

সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং মহাচীনের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল। আধুনিক চীনের স্রষ্টা ডাঃ সুন্ ইযাট-সেন ক্যুওমিন্‌টাং দলের প্রতিষ্ঠাতা। বর্ত্তমানে এই দলই চীনের ভাগ্যবিধাতা। ১৯২০ সালে চীনে সর্ব্বপ্রথম সাম্যবাদী দল গঠিত হয। প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই অত্যন্ত দ্রুতবেগে এই দলের শক্তি এবং প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৯২৩ সালে সুন্ ইযাট-সেন যখন রুশিয়াব সহিত

মৈত্রী স্থাপন করেন তখন মহাচীনের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সাম্যবাদী দল একটি অনুপেক্ষণীয় শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। তখন পর্য্যন্ত সাম্যবাদী এবং ক্যুওমিন্টাং দলের মধ্যে কোন গুরুতর মতবিরোধ বা মৌলিক পার্থক্য ছিল না। আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে গণতন্ত্র স্থাপন করিতে উভয়েই তখন সমান আগ্রহশীল। ১৯২৪ সালে বরোডিনের পরামর্শে ক্যুওমিনটাং দল রুশীয় আদর্শে নূতন করিয়া গঠিত হয়। তখন হইতে কয়েক বৎসর কাল কম্যুনিষ্টগণ এই দলের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ১৯২৬-২৭ সালের যে বিপ্লব পিকিং-এর অত্যাচারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছিল তাহার সংগঠন এবং পরিচালনায় সাম্যবাদীগণ একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেন এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীন ক্যুওমিন্টাং দল কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট দলের দুইটি প্রধান নীতি—আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ভূস্বামী এবং রণ-নায়ক সম্প্রদায়ের ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে চীনের রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন—গৃহীত হওয়ার ফলেই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং সহযোগিতা সম্ভব হইয়াছিল।

কম্যুনিষ্টগণ মনে করেন যে সাম্যবাদী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব (Bourgeois democratic revolution) অপরিহার্য্য। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদে মহাচীনের সার্ব্বভৌমিকতার পুনরুদ্ধারের জন্য বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাঁহারা আদর্শভ্রষ্ট হ'ন নাই।

মহাচীনের দুর্ভাগ্যক্রমে সুন্ ইয়াট-সেন-পরিকল্পিত বিপ্লব সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই ১৯২৫ সালে তাঁহার দেহাবসান হয়। দুই বৎসর পর ১৯২৭ সালে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। চিয়াং-কাই-শেকের নেতৃত্বে ক্যুওমিন্টাং দলের দক্ষিণ শাখা নান্‌কিং-এ একটি

স্বতন্ত্র সরকার গঠন করিল। কম্যুনিষ্টগণ এবং কুওমিন্‌টাং-এর অধিকাংশ সদস্যই মনে করিলেন যে এই প্রচেষ্টা বিপ্লব-বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ক্যুওমিন্‌টাং দলের অন্তর্বিরোধ মিটিয়া গেল এবং এই দলের যে সমস্ত সদস্য পূর্ব্বে নান্‌কিং সরকারের বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহারা ইহার সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধ কিন্তু মিটিল না। নান্‌কিং সরকার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া চীন হইতে সাম্যবাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইলেন। সরকারী আদেশে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচার করা এবং সাম্যবাদী দলভুক্ত হওয়া চরমদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং গণ-বিপ্লবের আদর্শ প্রকৃতপ্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রণ-নায়কগণের স্থানে অভিনব রণ-নায়ক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিল। গৃহ-যুদ্ধ এবং ক্রমবর্দ্ধমান কৃষক-আন্দোলন দমন করিতে নান্‌কিং সরকার বদ্ধপরিকর হইলেন। সহস্র সহস্র সাম্যবাদী এবং কৃষক ও শ্রমিক-নেতা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। সর্ব্বপ্রকার বিরোধিতার মূলোচ্ছেদ করিয়া একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের একনায়কত্ব (Totalitarian Dictatorship) স্থাপনের আয়োজন করা হইতে লাগিল।

সাম্যবাদিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে চীনের মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাঁহারা মনে করেন যে সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে কৃষক-বিপ্লবও অপরিহার্য্য। চীনের সাম্যবাদীগণ এখনই ধনতন্ত্র উঠাইয়া দিতে চাহেন না। কিন্তু প্রচলিত ধনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে তাঁহারা এক নূতন ধরণের ধনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। চীনের অর্দ্ধ-সামন্ততান্ত্রিক এবং অর্দ্ধ-ঔপনিবেশিক সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইলে ধনতন্ত্রের সাহায্য লইতেই হইবে। কম্যুনিষ্টগণ সেই জন্যই অবাধ উদ্যম এবং পুঁজিবাদী মুনাফালাভের প্রচেষ্টার সমর্থন

করেন এবং এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তাঁহারা একচেটিয়া পুঁজিবাদকে (Monopoly Capitalism) কোন ক্রমেই দানা বাঁধিতে দিতে প্রস্তুত নহেন।

নান্‌কিং সরকার ক্রমশঃই বৈপ্লবিক আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মানের দ্রুত অবনতি ঘটিতে লাগিল। পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসিগণ দিনের পর দিন দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল। পক্ষান্তরে স্বল্পসংখ্যক ভূস্বামী এবং কুসীদজীবী ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি ক্রমশঃই ইহাদিগের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। ফলে আধুনিক চীন সমাজে বিত্তবান্ এবং বিত্তহীন ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব অপরিজ্ঞাত। সমাজ হইতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ সাল এই ১০।১১ বৎসর কাল নান্‌কিং সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়ার ফলেই মহাচীনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিমিত স্থান জাপানের কুক্ষিগত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে। চীনের মোট রেলপথের শতকরা ৪০ ভাগ, জমির শতকরা ৮৫ ভাগ, কয়লা-সম্পদের বিরাট একটা অংশ, লৌহ-খনিসমূহের শতকরা ৮০ ভাগ, উৎকৃষ্ট আরণ্য. অঞ্চলের শতকরা ৮৭ ভাগ এবং রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় ৪০ ভাগ নান্‌কিং সরকারের অনুসৃত নীতির ফলেই জাপানের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে চীনের কার্পাস শিল্পের শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক জাপ কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া জাপ-কবলিত হওয়ার পর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা মালের যোগানদার এবং পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্র প্রায় সম্পূর্ণভাবে চীনের হাতছাড়া হইয়া যায়। জাপ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়া চীনের অন্যান্য প্রদেশে উৎপন্ন পণ্যের শতকরা ২৭ ভাগ ক্রয় করিত। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কর্ত্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৩৯ সালে মাঞ্চুকুয়ো (মাঞ্চুরিয়ার জাপান-প্রদত্ত নাম) চীনে উৎপন্ন মোট পণ্যের শতকরা চার ভাগ মাত্র ক্রয় করিয়াছিল। যুদ্ধকালে মাঞ্চুকুয়ো হইতে চীনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার পক্ষেও জাপানের বিশেষ সুবিধা হইযাছিল।

কিন্তু জাপানের সহিত যুদ্ধ করিলেও কিছু লাভ হইত কিনা বলা শক্ত। নান্‌কিং সরকারের সর্ব্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-শেক একাধিকবার প্রকাশ্যেই বলিযাছেন যে দুর্ব্বল চীনকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া না তোলা পর্য্যন্ত তাহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত করা সমীচীন হইবে না।

কুওমিন্‌টাং দলের দক্ষিণ শাখার বরাবরই কম্যুনিষ্টগণের সহিত সহযোগিতা করিতে আপত্তি ছিল। সুন্ ইয়াট-সেনের অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের গুণেই সাময়িকভাবে হইলেও ইহাদের পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধ আত্মপ্রকাশ করিল। ক্যুওমিন্‌টাংএর দক্ষিণ শাখা বলিতে লাগিল যে কন্‌ফ্যুসিয়াসের জন্মভূমি এবং কর্ম্মক্ষেত্র মহাচীনকে কোনক্রমেই বল্‌শেভিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হইতে দেওয়া চলিবে না।

নান্‌কিং সরকার প্রথম হইতেই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। অভিযানের পর অভিযান পাঠাইয়া কম্যুনিষ্ট দল এবং ইহাব যাবতীয় প্রচেষ্টাকে সমূলে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা হইযাছে। আজ পয্যন্ত এই চেষ্টা সফল হয নাই।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং এই দুই দলেব মধ্যে একটা আপোষ হয। 'কম্যুনিষ্টগণ তাঁহাদের চরম মতবাদ পবিত্যাগ করেন। ভূস্বামী এবং বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের ভূমি এবং বিত্ত বাজেয়াপ্ত করিবার নীতি পরিত্যক্ত হইল। নান্‌কিং সরকারও চীনকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন।

মাও সে তুঙ্

চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা

ইহার পর কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

যুদ্ধকালে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্‌টাং এই দুই রাজনৈতিক দলের বিরোধ সাময়িকভাবে প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে এই বিরোধ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া অবশেষে সর্ব্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়াছে।

জাপানের আক্রমণে যেদিন জাতির সত্তা এবং স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল সেদিন এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল সমস্ত বিরোধ বিস্মৃত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। মাতৃভূমির স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করিবার জন্য উভয়েই—বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্টগণ—সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ-স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই যুদ্ধকালেই বিভিন্ন সূত্রে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধের ধারা বহিয়াই চলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের কথাও মধ্যে মধ্যে শোনা গিয়াছে।

অন্তর্ব্বিরোধে দুর্ব্বল, রণ-বিধ্বস্ত মহাচীন বহুদিন হইতেই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধ মিটিবার পথে প্রধান বাধা। অন্যান্য কারণও যে না আছে এমন নহে।

অবিলম্বে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধ মিটিয়া না গেলে অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত আমাদিগকে পাকিস্থানের চৈনিক সংস্করণের কথা শুনিতে হইবে। যে যে কারণে—অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল, ত্যাগব্রতী এবং স্বদেশের মুক্তিকামী একটি রাজনৈতিক দলের সহিত প্রতিক্রিয়াপন্থী ও ক্ষমতালিপ্সু অপর একটি দলের অনৈক্য ও সংঘর্ষ, স্বীয় স্বার্থের খাতিরে তৃতীয় পক্ষ কর্ত্তৃক এই শেষোক্ত দলকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রশ্রয় দান এবং জাতিব অন্তরে নিহিত ভেদের বীজ—ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সুবর্ণ

দ্বারে উপস্থিত হইয়াও অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতে পারিল না, জাতীয় কংগ্রেসের দীর্ঘ ৬০ বৎসরের সাধনা মাত্র আংশিক ফলপ্রদ হইল, স্বাধীনতা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতির মুখে ভারতবর্ষ দ্বিধা—বহুধা কিনা কে জানে!—বিভক্ত হইয়া গেল চীনেও ঠিক সেই সমস্ত কারণ বিদ্যমান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপ যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বোঝা গিয়াছিল যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং বিরোধের আগুন নিভে নাই। 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স্', 'লণ্ডন টাইম্‌স্', 'দি ওয়ার য়্যাণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস' প্রভৃতি পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদদাতা এবং লেখক নান্‌কিং (পরে চুংকিং) জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। এই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের অবরোধ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক চীনে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপন-প্রচেষ্টার বিরোধিতা এবং সমগ্র চীনের জন্য একটি সম্মিলিত সরকার গঠনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

ক্যুওমিন্‌টাং সরকার কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের বলে কম্যুনিষ্টদলের সদস্য হওয়া জাপ যুদ্ধকালেও চরমদণ্ডযোগ্য অপরাধ ছিল। আজও এই দলের বৈধতা স্বীকৃত হয় নাই। যুদ্ধের ফলে যে জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভারসাম্যের ওলটপালট হইয়াছে সরকার কিছুতেই তাহা

১। "The Chinese Communists have good armies which are now fighting guerilla warfare against the Japanese...the Generalissimo regards these armies (*i. e.* not the Japanese) as the chief threat to his supremacy...For several years he has immobilised 300,000 to 500,000 Central Government troops to blockade the Communists...The Generalissimo is determined to maintain his group of ageing reactionaries in power *until the war is over, when it is commonly believed, he will resume his war against the Chinese Communists without distraction.*"

—*Brooks Atkinson* in the *New York Times, October 31, 1944.*

এট্‌কিন্‌সনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে।

স্বীকার করিতেছেন না। কম্যুনিষ্ট দলের শক্তি এবং ইহার সমর্থকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই দলের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাপ যুদ্ধকালে যখন সর্ব্ব বিষয়েই সরকারী বাহিনীর সুস্পষ্ট অধঃপতন পরিলক্ষিত হইতেছিল সেই দুর্দ্দিনেও কম্যুনিষ্টগণ লক্ষ লক্ষ লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের গণশক্তিকে বহুলাংশে সুসংহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে যে সর্ত্তে কম্যুনিষ্টগণ ক্যুওমিন্‌টাং দলের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যাইতে সম্মত ছিলেন তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না। ইহাদের প্রধান দাবিগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনী কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট-অধিকৃত অঞ্চলের অবরোধ প্রত্যাহার,

২। 'লেণ্ড-লিজ-চুক্তি' অনুযায়ী প্রাপ্ত সমরোপকরণ ক্যুওমিন্‌টাং বাহিনীর সহিত সমান ভাবে পাইবার অধিকার,

৩। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের অবসান এবং

৪। সর্ব্বদলীয় সরকার গঠন।

চীনের কম্যুনিষ্টগণ প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি সর্ত্তে পুঁজিবাদী ও মজুর শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতার কথাই বলেন।

ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথার সংস্কার কম্যুনিষ্ট দলের প্রধান উদ্দেশ্য ("Stand upon a moderate agrarian platform with a Marxist colouration.")। ভূম্যধিকারের সমতা সাধন, গুরুভার পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা এবং ভূমি ব্যতীত যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সামাজিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন, সর্ব্বশ্রেণীর সমান ভোটাধিকার প্রবর্ত্তন এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা এই দলের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে চীনের সাম্যবাদী প্রচেষ্টাকে উনবিংশ শতকের টাইপিং আন্দোলনের একটি পরিণত সংস্করণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশের মধ্যেও ৩০ বৎসরের পূর্ব্বে কোন ক্রমেই এই কর্ম্মসূচীকে রূপায়িত করা সম্ভব নহে।

ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেনের 'সান্ মিন্ চু-ই' বা 'থ্রি প্রিন্সিপল্‌স্ অব দি পিপল্'কে বাস্তবে পরিণত করা ক্যুওমিনটাং দলের লক্ষ্য। ক্যুওমিনটাং দল অন্ততঃ এই কথাই বলে। মহাচীনের জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবন-যাত্রার সৌকর্য্য সাধন 'থ্রি প্রিন্সিপল্‌স্'-এর উদ্দেশ্য। সুতরাং কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিনটাং দলের আপাততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত একসঙ্গে কাজ করিতে না পারিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট দলের মত চীনের কম্যুনিষ্ট দলও নিজেকে 'সর্ব্বহারা শ্রমিক সম্প্রদায়ের অগ্রগামী দল' বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই দল নিজেকে মজুর শ্রেণী ব্যতীত আরও কয়েকটি শ্রেণীর, বিশেষতঃ কৃষক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও নেতা এবং মুখপাত্র বলিয়া মনে করে। পক্ষান্তরে ক্যুওমিনটাং দল গণ-স্বার্থ অপেক্ষা কায়েমী শ্রেণী-স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেছে। এই দল গণতন্ত্রের নামে সামন্ত তান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক স্বার্থকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহে আর এই প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যাধিকারী বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জ এই দলকে অকৃপণ হস্তে সাহায্য করিতেছে।[১]

তাহা ছাড়া কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিনটাং এই উভয় দলই রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কর্ত্তৃত্বপ্রয়াসী। বহুদিন পূর্ব্বে চীনের অন্যতম সাম্যবাদী নেতা পো-কু (Po-ku) মার্কিণ গ্রন্থকার এবং সাংবাদিক এড্‌গার স্নো'র নিকট বলিয়াছিলেন—সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব সময়েই যে আমাদিগকে নেতৃত্বের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে তাহা আমরা অস্বীকার করি না।

(১) "The Seventh Fleet and other untis (of the U S A) cruise constantly in Chinese waters. There are involved over 25,000 of our armed services, a total of 271 naval vessels, and a large quantity of aircraft and other war supplies which have been turned over to Marshal Chiang Kai-shek for the civil war." —*Henry Wallace.*

যে রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব কবিতে পারে না তাহার থাকা এবং না থাকা উভয়ই সমান।

ক্যুওমিন্টাং দলেব কম্যুনিষ্ট-আতঙ্ক এই উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আব একটি প্রধান অন্তরায়। প্রথমোক্ত দলেব ধারণা যে শেষোক্ত দল সুযোগ পাইলেই স্বীয অধিকৃত অঞ্চলে এমন শক্তিশালী সবকাব গঠন কবিবে যে জাতীয সরকাবেব পক্ষে তাহাকে কোনক্রমেই স্বীয বশে বাখা সম্ভব হইবে না। এই দল বিশ্বাস করে যে একবাব কম্যুনিষ্ট দলের বৈধতা স্বীকাব কবিলে ইহাকে দমন কবিবাব সমস্ত সম্ভাবনা লোপ পাইবে।

নীতি এবং মূল আদর্শেব দিক্ হইতেও কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্টাং এই দল-দুইটিব মধ্যে বিবাট পার্থক্য বিদ্যমান। চিয়াং কাই শেক-পরিচালিত ক্যুওমিন্টাং দল কৃষক সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ছোঁয়াচ হইতে দূবে বাখিযা স্বীয ক্ষমতা রক্ষায় যত্নবান্। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্ট দল সমাজের মেরুদণ্ড কৃষক সম্প্রদাযকে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত কবিয়া তাহাব সহায়তায় স্বীয শক্তিবর্দ্ধনে বদ্ধপবিকর।

বর্ত্তমান অবস্থায় কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাং সমস্যার স্থায়ী সমাধানেব জন্য হয় কম্যুনিষ্টগণকে নিজেদেব সৈন্যবাহিনী বিনা সর্ত্তে ক্যুওমিন্টাং কর্ত্তৃপক্ষের হাতে সঁপিযা দিযা চিরদিনেব মত রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্বেব আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক আত্মহত্যা কবিতে হইবে। আর না হয় ত ক্যুওমিন্টাং দলকে একনায়কত্বের মোহ পবিত্যাগ করিয়া এবং জনসাধারণের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লোকাযত্ত সরকারের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

যুদ্ধবত কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্টাং নেতৃবৃন্দ কি ভাবে নিজেদের বিরোধ মিটাইবেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহাদের বিচারে দলীয় স্বার্থকে জাতীয স্বার্থ অপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া হয় কিনা তাহা দেখিয়াই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের স্থান নির্দ্ধারিত হইবে।

মহাচীনের এক শতাব্দী

১৮৩৮—পিকিং দরবার কর্তৃক লিন্ জে-সু কোয়ানটুং এবং কোয়াংসি প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হ'ন।

১৮৩৯—লিন্ ক্যাণ্টনের সমস্ত আফিং আগুনে পোড়াইয়া ফেলেন।

১৮৪০—ইংরেজগণ ক্যাণ্টন অবরোধ এবং নিংপো আক্রমণ করেন।

১৮৪২—ইঙ্গ-চীন সন্ধি।

১৮৪৪—চীন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম সন্ধি।

১৮৫০—টাইপিং বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

১৮৫১—টাইপিং বিদ্রোহের নেতা হুং সুই-চুয়ান্ নিজেকে 'টাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের' রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৮৫৩—বিদ্রোহীগণ নান্কিং-এ রাজধানী স্থাপন করে।

১৮৫৪—চীন সরকারের শুল্কবিভাগের উপর বৈদেশিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

১৮৫৬—ক্যাণ্টন বন্দরে ইংরেজদিগের জাহাজ "এ্যারো" হইতে চীন সরকার কয়েকজন চীনা বোম্বেটেকে গ্রেপ্তার করেন।

১৮৫৭—ক্যাণ্টনে বৈদেশিকদিগের বিরুদ্ধে চৈনিকগণের অভ্যুত্থান। ইংরেজ এবং ফরাসীগণ ক্যাণ্টন অধিকার করেন।

১৮৫৮—টিয়েন্‌ট্‌সিন্ সন্ধি। প্রথম চৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৬০—ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী পিকিং-এ প্রবেশ করে। ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী চীন সম্রাট্‌গণের প্রাচীন গ্রীষ্মাবাস অগ্নি-সংযোগে ধ্বংস করে।

১৮৬১—চীনে প্রথম পররাষ্ট্র দফ্‌তর (Tsungli Yamen) স্থাপিত হয়।

১৮৬৩—টাইপিং বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংল্যাণ্ড কর্তৃক কর্ণেল গর্ডনের নিয়োগ।

১৮৬৬—টাইপিং বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়।

১৮৬৭—ফ্রান্স মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোচিন-চীনের তিনটি প্রদেশ অধিকার করে।

১৮৬৮—উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য সর্ব্বপ্রথমে চীন হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্র প্রেরিত হয়।

১৮৭০—ডাঃ সুন্ ইয়াট-সেনের জন্ম (১২ই নভেম্বর)।

১৮৭২—সাংহাই হইতে চীনের বিখ্যাত সংবাদপত্র সুন্ পাও প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩—বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণকে মাঞ্চু সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি সর্ব্বপ্রথম দেওয়া হয়।

১৮৭৭—মাঞ্চু সরকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ।

১৮৭৮—চীনে প্রথম ডাকটিকেট মুদ্রিত হয়।

১৮৮৪—আনামের অধিকার লইয়া চীন এবং ফ্রান্সের মধ্যে সংঘর্ষ।

১৮৮৫—ফ্রান্স আনামে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা লাভ করে।

১৮৮৭—চিয়াং কাই-শেকের জন্ম।

১৮৯৪—প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয় (১লা আগষ্ট)।

১৮৯৫—সিমোনোসেকিতে চীন-জাপান সন্ধি (১৭ই এপ্রিল)।

১৮৯৬—চীনে প্রথম সরকারী ডাকঘর স্থাপিত হয়।

১৮৯৭—জার্ম্মানী সিংটাও এবং কিয়াওচাও অধিকার করে।

১৮৯৮—জার্ম্মানী ৯৯ বৎসরের জন্য কিয়াওচাও'র ইজারা লাভ করে।

রুশিয়াকে ড্যারিয়েন এবং পোর্টআর্থার সমেত কোয়ানটুং উপদ্বীপ ২৫ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়।

সম্রাট্ কোয়াংসু'র সংস্কার-প্রচেষ্টা।

'নর্থার্ণ ওস্থান আর্ম্মিকে' শিক্ষাদানের জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক ইউয়ান সি-কাই-এর নিয়োগ।

জু-সি ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সম্রাট্ কোয়াংসুকে বন্দী করেন।

সংস্কার-আন্দোলনের অবসান।

১৮৯৯—যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্ মিঃ হে কর্ত্তৃক চীন সম্পর্কে 'মুক্তদ্বার' নীতি ঘোষিত হয়।

১৯০০—জু-সি'র পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত বক্সার বিদ্রোহীগণ পিকিং-এর সমস্ত বৈদেশিক দূতাবাস আক্রমণ করে।

জু-সি কর্ত্তৃক সমস্ত বৈদেশিকের বিরুদ্ধে ("all foreigners in the world") যুদ্ধঘোষণা।

দক্ষিণচীনের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত পৃথক্ পৃথক্ সন্ধি স্থাপন করেন।

পিকিং-এ অষ্টবজ্র সম্মেলন (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, জাপান, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী, ইটালি এবং অষ্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর পিকিং প্রবেশ)।

সপারিষদ্ সম্রাট্ এবং জু-সি'র সান্‌সি এবং সেখান হইতে পরে সেন্‌সিতে পলায়ন।
পিকিং-এ ধ্বংসলীলা।

পিকিং সন্ধি।

১৯০১—চৈনিক পররাষ্ট্র দফ্‌তর পুনর্গঠিত হয়।

১৯০৪—মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অধীন লিয়াওটুং-এ রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

১৯০৫—রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি—পোর্টস্‌মাউথ্ সন্ধি অনুযায়ী মাঞ্চুরিয়াতে রুশিয়া যে সমস্ত অধিকার ভোগ করিত তাহা জাপানের নিকট হস্তান্তরিত করিতে চীনকে বাধ্য করা হয়।

১৯০৬—তিব্বত সম্পর্কে ইঙ্গ-চীন সন্ধি।

নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তুতির জন্য সম্রাট্ এক ফরমান জারি করেন।

১৯০৭—চীনে নির্ব্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের ব্যবস্থা হয়।

১৯০৮—সম্রাট্ কোয়াংস্থ্ পরলোক গমন করেন (নভেম্বর)।

জু-সি'র দেহাবসান (নভেম্বর)।

১৯১১—বিপ্লববাদিগণ ক্যাণ্টন আক্রমণ করেন।

সম্রাটের আদেশে চীনের সমস্ত রেলপথ জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইল।

উচাং-এ জাতীয় বিপ্লব আরম্ভ হয় (১০ই অক্টোবর)।

অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লবের প্রসার।

১৯১২—স্থন্ ইয়াট-সেন চীন সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

শেষ মাঞ্চু সম্রাট্ স্থয়ান্ টুং-এর সিংহাসন ত্যাগ (১২ই ফেব্রুযারী)।

ইউয়ান্ সি-কাই চীন সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১৯১৩—চীনের জাতীয় পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন (এপ্রিল)।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে চীন সাধারণতন্ত্রের বৈধতা স্বীকৃত হয়।

১৯১৪—ইউয়ান্ সি-কাই জাতীয় পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিযা দিলেন (জানুযারী)।

ডাঃ এবং মাদাম স্থন্ ইয়াট-সেনের বিবাহ।

১৯১৫—জাপান ইউয়ান্ সি-কাই-এর নিকট 'একুশ দফা দাবী' পেশ করে।

চীনের নিকট জাপানের চরমপত্র।

'একুশ দফা দাবী' স্বীকৃতির ভিত্তিতে ইউয়ান্ সি-কাই এবং জাপানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

ইউয়ান্ সি-কাই নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।

জেনারেল সাই ও ইউয়ান্ প্রদেশকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া ইউয়ান্ সি-কাই-এর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন।

১৯১৬—ইউয়ান্ সি-কাই সিংহাসন পবিত্যাগ করেন (২২শে মার্চ্চ)।

ইউয়ানের মৃত্যু (৬ই জুন)।

চীন সাধাবণতন্ত্রেব সহকারী সভাপতি লি ইউয়ান্-হাং সাধারণতন্ত্রেব সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন।

১৯১৭—জার্ম্মানীব সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কবিতে চীনেব নিকট মার্কিণ যুক্তবাষ্ট্রের অনুরোধ। চীনের সম্মতি প্রদান।

সান্টুং সম্পর্কে ইঙ্গ-জাপ গোপন চুক্তি।

,, ,, ফবাসী-জাপান ,, ,,

,, ,, রুশ-জাপ ,, ,,

চীন জার্ম্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কবে।

চীনেব সামরিক নেতৃবৃন্দ লি ইউযান্ হাং-কে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য কবেন।

ক্যাণ্টনে আহূত বিশেষ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক ডাঃ সুন্ চীনেব স্থল এবং নৌ-বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হ'ন।

১৯১৮—টুযান্ চি-জুই পিকিং সবকাবের প্রধান মন্ত্রী হ'ন।

সান্টুং সম্পর্কে পিকিং সবকাব এবং জাপানেব মধ্যে গোপন চুক্তি। টুয়ান্ চি-জুই পদত্যাগ কবেন।

সু সি-চাং চীন সাধাবণতন্ত্রের সভাপতি হইলেন।

১৯১৯—শান্তি-বৈঠকে প্রেরিত চীনেব প্রতিনিধিদল ভার্সাই সন্ধি-পত্র স্বাক্ষব কবিতে অসম্মত হয়।

ক্যুওমিন্টাং দল পুনর্গঠিত হয়।

১৯২০—চীন জাতি-সঙ্ঘেব সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়।

জারেব আমলে রুশিয়া কর্ত্তৃক চীনে অর্জ্জিত যাবতীয় বিশেষ অধিকার ত্যাগ করিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ।

চীনে সাম্যবাদী দল গঠিত হয়।

১৯২১—ক্যাণ্টনে আহূত বিশেষ পার্লামেণ্ট এ্যাসেম্‌ব্‌লি ডাঃ স্থন্‌কে চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন আরম্ভ।

১৯২২—চীনের অখণ্ডত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য এবং চীন সম্পর্কে যাহাতে 'মুক্তদ্বার' নীতি অনুসৃত হয় সেই জন্য নব-শক্তি চুক্তি (Nine-Power Treaty) সম্পাদিত হয়।

১৯২২—উ পে-ফু এবং চ্যাং সো-লিন্‌-এর মধ্যে যুদ্ধ—চ্যাং-এর পরাজয়।

১৯২৩—কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যগণের ক্যুওমিন্‌টাং দলে যোগদানের অনুমতি লাভ।

১৯২৪—চীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈধতা স্বীকার করে।

রুশ-চীন সন্ধি।

ক্যাণ্টনেব উপকণ্ঠে হোয়াম্পোয়া সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৫—পিকিং-এ ডাঃ স্থন্‌ ইয়াট-সেনের দেহাবসান (১২ই মার্চ্চ)।

সাংহাই'ব আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশে জাপ এবং ইংবেজগণ কর্ত্তৃক বহু চৈনিক নাগরিক হতাহত হয়।

চীনে জাপানী এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের জন্য প্রবল আন্দোলন।

ওযাং চিং-ওযাই'র নেতৃত্বে ক্যাণ্টনে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয (১লা জুন)।

১৯২৬—চিয়াং কাই-শেক 'নর্দার্ণ এক্সপিডিসনাবি আর্ম্মি'র প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন।

১৯২৭—চিয়াং-পরিচালিত বাহিনী সাংহাই অধিকার করে।

„ „ „ নান্‌কিং „ ।

নান্‌কিং-এ চীন সৈন্য এবং বৈদেশিকগণের মধ্যে সংঘর্ষ।

ইংরেজ এবং মার্কিণ যুদ্ধ জাহাজ হইতে নান্‌কিং-এ গোলা-বর্ষণ।

পিকিং-এর রুশীয় দূতাবাস সংলগ্ন সোভিয়েট ব্যাঙ্কে হানা দিয়া চীন পুলিশ বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল হস্তগত করে।

চিয়াং কাই-শেক-পরিচালিত ক্যুওমিন্‌টাং দল কর্ত্তৃক সাম্য-বাদিগণের উপর উৎপীড়ণ আরম্ভ।

উহান সরকার স্থাপিত হয়।

ক্যাণ্টনে শ্রমিক অভ্যুত্থান।

ক্যুওমিন্‌টাং সরকার চীন কর্ত্তৃক সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈধতা স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেন।

১৯২৮—চ্যাং সো-লিনের পিকিং হইতে মাঞ্চুরিয়ায় প্রস্থান।

জাপানের চক্রান্তে বিস্ফোরণের ফলে তাঁহার মৃত্যু।

১৯৩০—পিকিং-এ ওয়াং চিং-ওয়াই, ইয়েন সি-সান্‌ এবং ফেং ইউ-সিয়াং কর্ত্তৃক নান্‌কিং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপন।

উভয় সরকারের মধ্যে যুদ্ধ (মে-সেপ্টেম্বর)।

কমুনিষ্টগণ কর্ত্তৃক হুনানের রাজধানী চ্যাংসা আক্রমণ।

১৯৩১—কোয়াংসিতে লি স্থং-জেন কর্ত্তৃক নান্‌কিং সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার প্রতিষ্ঠা।

জাপান কর্ত্তৃক মুক্‌ডেন অধিকার (১৮ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্র)।

১৯৩২—জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার সমাপ্ত।

শেষ মাঞ্চু সম্রাট্‌ হেন্‌রী পু-ই-কে জাপ-তাঁবেদার মাঞ্চুরিয়ার (জাপানী নাম মাঞ্চুক্যুও) সম্রাট্‌ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

জাতি-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক লিটন কমিশন নিয়োগ।

১৯৩৫—চীন সোভিয়েট সরকার এবং কম্যুনিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি চীনের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটি ঘোষণা-পত্রে জাপানকে

প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

১৯৩৬—চ্যাং স্যুয়ে-লিয়াং-এর অধীন সৈন্যদল কর্তৃক উত্তরচীনের অন্তর্গত সিয়ান্ হইতে জেনারেল চিয়াং কাই-শেক অপহৃত হ'ন (১৬ই ডিসেম্বর)।

মুক্তিলাভান্তে চিয়াং বিমানযোগে নান্‌কিং পৌঁছেন (২৬ শে ডিসেম্বর)।

১৯৩৭—জাপ সৈন্যদল ওয়ান্‌পিং সহবের উপকণ্ঠে চীন সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ আবম্ভ হয়। (৭ই জুলাই)।

পিংসিং গিরিসঙ্কটে 'এইট্‌থ্ রুট্ আর্ম্মি'ব হস্তে জাপ বাহিনীর পরাজয়।

১৯৩৮—ক্যাণ্টনের পতন। হ্যাঙ্কো হইতে চৈনিক বাহিনীর পশ্চাদপসরণ। যুদ্ধ চলিতে থাকিবে এই মর্ম্মে জেনাবেল চিয়াং কাই-শেকের ঘোষণা।

চুংকিং হইতে ওয়াং চিং-ওয়াই'ব পলায়ন।

১৯৩৯—চ্যাংসা অভিমুখে অগ্রসর জাপ বাহিনীর নিদারুণ পরাজয়।

১৯৪০—আমেরিকা এবং জাপানেব মধ্যে সন্ধি-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

ওয়াং চিং-ওয়াই জাপ-তাঁবেদাব নানকিং সবকারের কর্ণধার মনোনীত হ'ন।

চীন-ব্রহ্ম রাস্তা (Burma Road) সম্পর্কে ইঙ্গ-জাপ চুক্তিব ফলে রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

প্রিন্স্ কোনোই জাপানের প্রধান মন্ত্রী হ'ন।

ব্রিটিশ সরকার চীন-ব্রহ্ম রাস্তা খুলিয়া দেন,—জুলাই মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত এই রাস্তা বন্ধ ছিল।

১৯৪১—নান্‌কিং সরকারের আদেশে 'নিউ ফোর্থ আর্ম্মি' ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

রুশ-জাপ চুক্তি। বার্লিন এবং টোকিও হইতে চীনের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন।

জার্ম্মানী এবং ইটালি কর্ত্তৃক জাপ-তাঁবেদার নান্‌কিং সরকারেব বৈধতা স্বীকৃত হয়।

চীন কর্ত্তৃক 'আট্‌লান্টিক সনদ' (Atlantic Charter)-এর অনুমোদন।

জার্ম্মানী এবং ইটালির সহিত চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

চ্যাংসাতে জাপানের ঘোরতর পরাজয়।

ইচাং অঞ্চলে চীনের জয়লাভ।

কোনোই মন্ত্রীমণ্ডলীব পতনের পর লেঃ জেনারেল তোজোর নেতৃত্বে জাপানে নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়।

জাপান যুক্তরাষ্ট্রেব প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘাঁটিসমূহ আক্রমণ কবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যাণ্ড জাপানেব বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে।

জাপান, জার্ম্মানী এবং ইটালির বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ ঘোষণা (৯ই ডিসেম্বব)।

১৯৪৫—আণবিক বোমা বর্ষণে নাগাসাকি এবং হিরোসিমা বিধ্বস্ত হয়।

জাপানের বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ (১৪ই আগষ্ট)।

১৯৪৬—চীন-গণ-পরিষদের বৈঠক—চীনের নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়।

১৯৪৭—কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্‌টাং গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

১৯৪৮—১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারীর ১ম সপ্তাহ (পরিশিষ্ট)

পরিশিষ্ট

বর্ত্তমানে মহাচীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সকল ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রন্থকার এখানে থাকিলে তিনিই উহা কবিতেন। কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশে থাকায় আমরা এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছি। বর্ত্তমানে সমগ্র উত্তর চীন চীয়াংয়ের কুমিনটাং শাসন-মুক্ত হইয়াছে; কম্যুনিস্টবাহিনী ইয়াংসির উত্তর তীবে আসিয়া নদী পার হইবাব উদ্দেশ্যে জমায়েৎ হইতেছে। সাংহাই ও রাজধানী নানকিংয়ের মধ্যে তাহারা কযেকটি ঘাটি স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদের একটি অংশ হাংকাউ-পিপিং বেলপথ ধরিয়া হাংকাউযেব উপকণ্ঠে আসিযা পড়িয়াছে। নানকিং হইতে বাজধানী ও সরকারী দপ্তব দক্ষিণে ক্যানটন নগরে স্থানান্তবিত হইয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয, নানকিং ও হাংকাউযের পতন অবশ্যম্ভাবী, সাংহাইও কম্যুনিস্ট বাহিনীব করাযত্ত হইবে। তবে এখানে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইবে ইহা অবধাবিত। কারণ, কযেকদিন ছোটখাটো সংঘর্য ছাড়া বড বকমেব যুদ্ধ বিবতির ফলে উভয পক্ষই কিছু গুছাইযা লইবার সুযোগ পাইযাছে। তাহা ছাড়া, কম্যুনিস্টগণের সাফল্যের দরুন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ চাঞ্চল্যেব সঞ্চার হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের শক্তি সম্পূর্ণ খর্ব হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মহাচীনে সাম্যবাদ কায়েম হইলে এবং তাহার সমাজ ও শাসনব্যবস্থা সেই অনুযায়ী গঠিত হইলে ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাব মহাচীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার হাতছাড়া হইবেই এবং তাহার, কেবল তাহার কেন, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব এই অঞ্চল হইতে দূর হইবে। আব, ইহা মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক

শোষণ ও শাসনমুক্ত হইবে। আমাদের ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিতেও লালচীনের প্রভাব পড়িতে বাধ্য। ইতিমধ্যে তাহার নিদর্শনও পাওয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় মহাচীনের কম্যুনিস্টগণের শক্তি খর্ব্ব করিতে ইহাদের ও ইহাদের সমর্থকগণের তৎপর হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুমিনটাং সরকারকে অস্ত্র-শস্ত্রাদি ও অর্থ দিয়া সাহায্যও করিতেছে। তবুও কুমিনটাং সরকার কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই, সর্ব্বত্রই হারিয়া যাইতেছে।

এই বিপর্য্যয়ের কারণ, প্রধানত চীনা কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণের এক বিরাট অংশের সাম্যবাদিগণকে সমর্থন। অনেক জায়গায় তাঁহারা কম্যুনিস্টবাহিনীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছেন; শ্রমিকগণ কারখানা ও খনিগুলি অক্ষত অবস্থায় বিজয়ী কম্যুনিস্টবাহিনীর হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। সরকার বা মালিক স্থানত্যাগ করিবার সময় এগুলি ধ্বংস করিতে সক্ষম হন নাই, শ্রমিকরা জীবনপণ করিয়া তাহাতে বাধা দিয়াছেন। কুমিনটাং বাহিনীর মধ্যেও সাম্যবাদীদের হাজার হাজার সমর্থক আছে। দুইটি বিখ্যাত বাহিনী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। সম্প্রতি আরও একটী বাহিনী কম্যুনিস্টগণের সহিত যোগ দিয়াছে। কুমিনটাং সরকারের সকল সেনাধ্যক্ষ কুমিনটাং সরকারের প্রতি অনুগত ন'ন। তাঁহারা যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদাদি কম্যুনিস্টগণের নিকট বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। সরকারী আমলাদের মধ্যে দুর্নীতির অন্ত নাই। চোরাবাজার, কালোবাজার, মুনাফাখোরী ও ঘুষ জনসাধারণকে এমন পীড়ন করিতেছে যে, তাঁহারা ইহা হইতে সাম্যবাদের মধ্যে মুক্তি পাইবেন মনে করিয়া সাম্যবাদিগণকে স্বাগত জানাইতেছেন। মহাচীনে এমন অবিশ্বাস্য রকমে মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে যে, সাধারণ মানুষ জীবনধারণের কোন উপায় দেখিতে পাইতেছেন না। সাধারণ একটি ফেলটের টুপির

দাম ৬০০ শত চীনা ডলার! এই একটি উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে মহাচীনের জনসাধারণকে কিরূপ অর্থনৈতিক চাপের পীড়নে জীবন কাটাইতে হইতেছে। এরূপ অবস্থা হইতে জনসাধারণের মুক্তি লাভের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী ও শাসকগণের সকলেই বড় বড় কারখানা, খনি ও প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। তাঁহারা আত্মীয় পোষণ দোষেও দুষ্ট। চীয়াং, সুঙ্, কুঙ্ ও চেন—এই চারিটি পরিবারই বর্ত্তমান চীনের মালিকস্বরূপ। ইঁহারা বিবাহসূত্রে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। এই সকল কারণ বর্ত্তমান চীনা জাতীয় সরকারের শক্তি ধ্বংস করিবার মূলে রহিয়াছে। চীয়াং আর পূর্ব্বের মতো জনপ্রিয় ন'ন। তাঁহার কাজ-কর্ম্ম হইতে লোকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি নিজ স্বার্থে মার্কিনের নিকট দেশ ও আত্ম বিক্রয় করিয়াছেন। কাজেই জনমনে তাঁহার প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। কম্যুনিস্ট বাহিনী যে সকল অঞ্চল অধিকার করিয়াছে সেই সকল অঞ্চলে তাহাদের নীতি হইতেছে, "লাঙল যাহার জমি তাহার," "ঘরে যে থাকে ঘর তাহার।" ইহার ফলে কৃষকেরাই জমির মালিক হইয়াছেন ও প্রয়োজনমতো জমি পাইতেছেন এবং যে-সকল দীন দরিদ্রের কাজ ও গৃহ নাই তাঁহারা কাজ ও বাসের গৃহ পাইতেছেন। বড় বড় অট্টালিকা এইভাবে তাঁহাদের বাসগৃহে পরিণত হইতেছে। ইহার দরুণ লক্ষ লক্ষ লোক সাম্যবাদিগণকে সমর্থন ও তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে।

অন্তর্দ্বন্দ্বে লক্ষ লক্ষ চীনাসাধারণের জীবন নাশ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইতেছে। কুমিনটাং সরকার কতটা সেজন্যও কম্যুনিস্টদের সহিত শান্তির কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে কুমিনটাং সরকারের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হয়। ডাঃ সুন ইয়াৎ সেনের পুত্র ডাঃ সুন ফো প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাহাতেও অবস্থার উন্নতি হয় না, জাতীয় সরকারের প্রতি সাধারণের আস্থা ফিরিয়া আসে না। কম্যুনিস্টবাহিনী যতই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে শান্তির কথাও ততই প্রবল হইয়া উঠে। তিয়েনশিন ও পিপিংয়ের পতনের পর তাহার আশু সম্ভাবনা দেখা দেয়। কম্যুনিস্ট নেতা মাও সে তুংও কুমিনটাং সরকারের সহিত শান্তির কথাবার্ত্তা চালাইতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি সেজন্য আট দফা শর্ত্ত উত্থাপন করেন। এই শর্ত্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যুদ্ধাপরাধীদের

তাঁহাদের হাতে অর্পণ করিতে হইবে ও তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে। কাবণ তাঁহাদের জন্যই চীনের এই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ, রক্তপাত ও দুঃখ-দুর্দ্দশা। কম্যুনিস্টগণ চল্লিশজনকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছেন, সর্ব্বাধিনায়ক চীযাং কাইশেক। কিন্তু বর্ত্তমানে চীযাং কাইশেক আব চীনের রাষ্ট্রপতি নন। তিনি থাকিলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা ঘটিবে, এই কারণে তিনি পদত্যাগ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান কবিতেছেন। তাঁহাব স্থলে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইয়াছেন লি সুং জেন্। চীয়াংয়েব পদত্যাগ অবশ্য সরকারী ভাবে ঘোষিত হয নাই। অস্থাযী সভাপতি লি সুং জেন ও ডাঃ সুন ফোব নামও যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায আছে। তাঁহাব স্থলে হো ইং চীন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাব নিযোগ চীয়াংয়েব সম্মতি সাপেক্ষ।

মহাচীনেব ঘটনাবলী এত দ্রুতগতিতে পবিবর্ত্তিত হইতেছে যে, আগামী কাল কি ঘটিবে তাহা বলা একরূপ কঠিন। কয়েকদিন আগেও যে শান্তির কথাবার্ত্তা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, জাতীয় সবকাবেব পক্ষ হইতে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এখন তাহা একরূপ শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। জাতীয় সবকাব যুদ্ধাপরাধী বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তিগণকে কম্যুনিস্টগণেব হাতে সমর্পণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তবে তাঁহাবা অন্যান্য শর্ত্তে কথাবার্ত্তা চালাইতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু কম্যুনিস্টগণ তাঁহাদেব সহিত শান্তিব আলোচনা চালাইতে আব রাজি ন'ন। তাঁহাদের মতে শান্তির এমন কোন ভিত্তি নাই যাহাব উপর জাতীয সরকাবের সহিত শান্তির আলোচনা চালানো যাইতে পাবে। তবে তাঁহাবা জনসাধারণের সহিত আলোচনা চালাইতে সম্মত। সেজন্য সাংহাই হইতে জনসাধারণের প্রতিনিধিদল পিপিং গিযা সেখানকার কম্যুনিস্ট নেতার সহিত শান্তিব কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। ইহাব পরে সবকারী ভাবে কুমিনটাং সরকাবেব পক্ষ হইতে কথাবার্ত্তা হইবে। পিপিং এখানে লালচীনের রাজধানী। কিন্তু সমাজতন্ত্রেব পথ [illegible] নয, সংগ্রামের। তাই আবাব সংগ্রাম শুরু হইলে [illegible] কিছু নাই।।

সমাপ্ত